শ্রীবাণী দত্ত কর্তৃক ৬৮/১বি পূর্ণদাস রোড হইতে প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ— জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭ বাং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই প্রকাশে যাঁদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম-এ, তত্ত্বরত্নাকর-এর নাম। তিনি সাগ্রহে তাঁর সংরক্ষিত পুস্তক-পত্রিকা থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অসুস্থ শরীর নিয়ে বইটির ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য আমরা তাঁর কাছে সবিশেষ ঋণী।

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানীর স্বত্ত্বাধিকারী দেশপ্রেমিক শ্রীকৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের মধ্যেও বইটি ছাপিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন।

শ্রীরণবীর দাশগুপ্ত তাঁর সংগ্রহ থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য ছবির ব্লক আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি ও অন্য অনেক বিষয়ের সূত্র অনুসন্ধানে প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণার কাছ থেকে সর্বদাই সাহায্য পেয়েছি। শ্রীমতী মনীষা মজুমদার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পাণ্ডুলিপি নকলে প্রচুর সাহায্য করেছেন।

এ'দের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

বাণী দত্ত
লক্ষ্মী দত্ত
বারীন্দ্র চৌধুরী

শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য কর্তৃক শ্রীভূমি মুদ্রণিকা, ৭৭ লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্রকন্যাগণ তাঁহাদের স্বনামধন্য পিতার আত্মস্মৃতিমূলক রচনাটি প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহার মধ্যে এই পিতৃতর্পণের ভাবটি লক্ষ্য করিতেছি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত এই ভূমিকা লেখকের পরিচয় ছিল। তাঁহার শ্রীহট্ট সহরস্থ বাড়ীটি নানা প্রকার সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল। নিজ প্রতিভা ও আন্তরিকতায় তিনি সমাজ রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগের কিছুকাল পরে তাঁহার রচিত একটি স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি পাইয়া তাঁহার পুত্রকন্যাগণ ঐটি প্রকাশ করিবার কথা চিন্তা করিয়া ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের রচিত প্রবন্ধাবলী ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য পুরানো "জনশক্তি" পত্রিকা সন্ধানের চেষ্টা করিয়া যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন তখন শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সম্পাদক ফণীন্দ্র নাথ দত্তর সহিত ব্রজেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পুত্র বারীন্দ্র চৌধুরীর এই বিষয়ে আলাপ হয়। বারীন্দ্রবাবু ফণীবাবু প্রমুখাৎ আমার নিকট জনশক্তির অসম্পূর্ণ, প্রায় ২৫ বৎসরের ফাইল আছে জানিয়া আমার বাড়ীতে আসেন। তাঁহার পরিচয় জানিয়া তাঁহাকে আপনার জন ভাবিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। তাঁহার সহিত তাঁহার তিন ভগিনী শ্রীমতী গৌরী, শ্রীমতী লক্ষ্মী ও শ্রীমতী বাণী দিনের পর দিন আমার বাড়ীতে আসিয়া বিভিন্ন বৎসরের পত্রিকার ফাইল অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের পিতার রচনা এবং তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নকল করিয়া লন। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি বারীন্দ্রবাবুর তিন সহোদরার বহুদিনের পরিশ্রমের ফল।

আলোচ্য "স্মৃতি ও প্রতীতি" গ্রন্থটি মূলতঃ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত জীবনকথা মূলক "বাংলার পূর্বসীমান্তে অর্ধশতাব্দী" পাণ্ডুলিপিরই পরিমার্জিত রূপ। সবশুদ্ধ সাত খণ্ডে সাতখানি খাতায় এই স্মৃতিকথা লেখা হইয়াছে। খাতার আকার ২১×১৭½ সেণ্টিমিটার। ১ম খণ্ডে ৪২টি পৃষ্ঠা আছে। সবশুদ্ধ পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ২৭০। পাণ্ডুলিপিটি এক পৃষ্ঠাতেই লেখা—তবে ব্যতিক্রম আছে, যেমন ৬, ৭, ১১, ১৭, ২০, ২২, ২৬, ২৯ ইত্যাদি কিছু পৃষ্ঠা দুই দিকে লেখা।

পাণ্ডুলিপিটি অতি নিষ্ঠার সহিত লিখিত। খুব অল্প ক্ষেত্রে লেখক নিজের লেখার সামান্য পরিবর্তন করিয়াছেন ঃ দৃষ্টান্ত ৮ম পৃষ্ঠার ১৪শ পংক্তিতে "খুল্লতাত যদিচ ছিলেন গোঁড়া হি—" এই অংশ কাটিয়া তার পরের পংক্তিতে লেখেন, "—ছিলেন আচারনিষ্ঠ।" তবে এই পাণ্ডুলিপির বহু ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য এবং তথ্যনির্ভর করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মন্তব্য সংযোজন করিয়াছেন। মূল পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা শাদা ছিল। পরে লেখক বহু নূতন মন্তব্য, স্থলভেদে দীর্ঘ সংযোজন ঐ অব্যবহৃত শাদা পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নানা রকম সঙ্কেতও ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত ৮ম পৃষ্ঠার ২২ পংক্তির পাশে সঙ্কেত চিহ্ন দিয়ে ঐ পৃষ্ঠার বাম দিকে যে শাদা পৃষ্ঠা ছিল তাহাতে ৩৩ পংক্তির এক দীর্ঘ সংযোজন লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা ঐ পৃষ্ঠায় শেষ না হওয়ায় "(B) পৃষ্ঠা দেখ'—এ রূপ মন্তব্য করিয়া ৮ম পৃষ্ঠার বিপরীত পৃষ্ঠার শীর্ষে (B) লিখিয়া সেখানে ঐ অসমাপ্ত মন্তব্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

মুদ্রিত গ্রন্থে প্রথম বন্ধনী মধ্যে যে শব্দ আছে, তাহা মূল পাণ্ডুলিপিতে নাই। সম্পাদকত্রয়ী প্রয়োজন বোধে শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা নির্দেশ করিতে গিয়া প্রথম বন্ধনীস্থ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পাঠকদের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থে একাধিক পাদটীকা ও পরিশিষ্ট যুক্ত হইয়াছে।

সম্পাদকত্রয়ী কোন কোন ক্ষেত্রে এই পাণ্ডুলিপিতে উহ্য কিছু বিবরণ যোগ করিয়াছেন। আলোচ্য মুদ্রিত গ্রন্থের ২৭।২৮ পৃষ্ঠায় ১৩০৪ বাংলার ভূমিকম্পের উল্লেখ আছে। ইহা পাণ্ডুলিপিতে সূত্রাকারে ছিল। বিস্তারিত বর্ণনা লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত তৎপ্রণীত "পাইলগাঁও ধরবংশাবলী" পুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে।

এই আত্মজীবন কথার অচিহ্নিত প্রথম দুই পৃষ্ঠা "সূচীপত্র" রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সূচীপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা পাশাপাশি দুই স্তম্ভে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠা একই স্তম্ভে লিখিত। লেখক নিজের রচনাকে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায় বা অনুচ্ছেদে ভাগ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির জন্য সংক্ষিপ্ত শিরোনামও দিয়াছিলেন। মুদ্রিত এই গ্রন্থে সম্পাদকত্রয়ী অনুচ্ছেদগুলিকে যথাযথ রাখার চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যায় বিশেষকে ভাগ করিয়া প্রয়োজনবোধে একাধিক অনুচ্ছেদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন শিরোনামও সংযুক্ত করিয়াছেন।

অনুমান করি, লেখকের ৭২ বৎসর বয়সে এই স্মৃতিকথা লিখা আরম্ভ হয়। শেষ কবে হইল তাহার কোন ইঙ্গিত লক্ষ্য করি নাই। দেশবিভাগের ফলে লেখক যখন একাকী শ্রীহট্টে বাস করিতেছিলেন—সেই দীর্ঘ অবসর জীবনেই এই স্মৃতিকথা লিখিত হইয়াছিল বোঝা যায়।

শ্রীভূমি শ্রীহট্টের কৃতী সন্তান ব্রজেন্দ্রনারায়ণের স্মৃতিচারণের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া তাঁহার পূর্ববর্তী সমসাময়িককালের একাধিক শ্রীহট্টীয় রচিত জীবনস্মৃতির কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে। শ্রীহট্টের গত প্রায় এক শতাব্দীকালের সমাজচিত্র আলোচ্য গ্রন্থের অনুরূপ আরও কতিপয় গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে বিধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য—

১। সাংবাদিক শশীন্দ্র সিংহের স্মৃতিকথা, ১৯২১ ইং।
২। 'সত্তর বৎসর'—(আত্মজীবনী) বিপিনচন্দ্র পাল, ১৩৬২ বাং।
৩। "শ্রীভূমির স্মৃতিকথা'—নগেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪। লাখাই দত্তবংশের বংশাবলী—হেমচন্দ্র দত্ত, ১৩৩৪ বাং।
৫। সুন্দরীমোহন দাসের 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা' ও অন্যান্য প্রবন্ধ।
৬। অখণ্ড শ্রীভূমির স্মৃতিকথা—সতীন্দ্রনাথ নন্দী, ১৩৫৭ বাং।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের সুযোগ্য গ্রন্থকার অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত জীবনকথার পাণ্ডুলিপি আমার পারিবারিক 'মোক্ষদাসংগ্রহে' আছে।

মূল পাণ্ডুলিপিটিকে গ্রন্থকার মোট ৭টি খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক অবস্থান, বংশপরিচয়, জন্ম, কলেজে কলিকাতায়, গ্রাম্য জমিদার, রাজনীতিক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ইত্যাদি। বিভিন্ন খণ্ডকে আবার বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছেন।

৭২ বৎসর বয়স্ক গ্রন্থকার এই স্মৃতিচারণে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল এমন মনে করার কারণ নাই। তাঁহার জীবিতাবস্থায় গ্রন্থটি মুদ্রিত হইলে হয় তো কোনো কোনো অংশ তিনি নিজেই সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা মুদ্রিত হওয়ায় সে সম্ভাবনা আজ আর নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে একটি মাত্র উক্তির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় এই ভূমিকা লেখক সম্পর্কে লেখা হইয়াছে —"যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কিছুকাল সেক্রেটারী......ছিলেন।" এই উক্তি নির্ভুল নহে। এই লেখক শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, পরিষৎ-সম্পাদক ছিলেন না। পরিষৎ সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক শশিমোহন চক্রবর্তী মহাশয়। এ জাতীয় কিছু কিছু ভুল তথ্য এই গ্রন্থে থাকা সম্ভব। পরিণত বয়সে আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে বসিয়া লেখা এবং কোনো সন্দেহ নিরসনের ব্যবস্থা না থাকায় এইরূপ হইয়াছে অনুমান করি। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির কথাও স্মরণীয়।

এই গ্রন্থের তথ্যবিশেষ যাচাই করিয়া লওয়া বা উদ্ধৃত অংশ আকরগ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নাই। পাঠকগণ কোনো ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করিলে তাহা জানাইবেন ; সম্পাদকগণ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করিতে ইচ্ছুক।

আলোচ্য স্মৃতিচারণ যেন একটি চিত্রশালা। ইহাতে গ্রন্থকারের জন্মভূমি শ্রীহট্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সহপাঠীবৃন্দ, প্রাচীন অর্থনীতি, প্রজা-জমিদার সম্পর্ক ইত্যাদি এবং সমসাময়িক বহু ঘটনার এবং ব্যক্তিবিশেষের চিত্র রহিয়াছে। এই শতকের শ্রীহট্টকে জানার পক্ষে ইহা এক ঐতিহাসিক দলিল। শুধু শ্রীহট্ট নহে সমগ্র বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথ, লর্ড কার্জন প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, খিলাফত আন্দোলন, পরিণত দৃষ্টিতে তখনকার শিক্ষাজগতের পুনর্মূল্যায়ন প্রভৃতি বহু বিষয় এই স্মৃতিচারণে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারবর্ণিত ঘটনাবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষ, সম্বন্ধে মন্তব্য তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করিয়াছে। এই ঋজুদেহ ঋজুমন ঋজুভাষী মানুষটির ছোটোখাটো মন্তব্য হইতে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত হইল। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকানিতে যেমন অন্ধকারের অংশ মুহূর্তের জন্য আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠে তেমনি গ্রন্থকারের কোনো কোনো তির্যক মন্তব্য তাঁহার অজ্ঞেয় মনকে পাঠকের নিকট উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সম্পর্কে অন্যান্য ব্যক্তির অভিমতও তাঁহাকে চিনিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে।

১। চোরের চরিত্র অপেক্ষা সাহসী ডাকাতের চরিত্র ভাল। (পৃঃ ৮৩)।

২। দীর্ঘসূত্রিতা আমার স্বভাববিরুদ্ধ (পৃঃ ৮১)।

৩। সুভাষবাবুর সাক্ষাতে ডাঃ কিচলুকে বলিয়াছিলাম "I refuse to learn Hindi.।" সুভাষবাবু বলেন "Typical Bengali"। (পৃঃ ৫৮)।

৪। "না গুঁতাইয়া কেবল 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া স্বরাজ মিলিবে না। (পৃঃ ১৩৩)

৫। অহিংসা 'ক্রীড' বলিয়া মানিতাম না। আমার ধাত তাহা নহে। (পৃঃ ১৪৭)

৬। মাকে খাইতে দেয় না অথচ দেশোদ্ধারী। (পৃঃ ৯০)

৭। সুভাষবাবু......ডাঃ কিচলুর সহিত আমাকে পরিচয় করাইয়া বলিয়াছিলেন "The uncrowned king of Surma Valley."। (পৃঃ ১৪৯)

৮। সেনগুপ্ত—সুভাষ বিরোধের সময় সেনগুপ্ত আমাকে খাওয়াইয়া তিন ঘণ্টা ভজাইয়া একটি সহি নিতে পারেন নাই। তাঁহার বন্ধু কিরণশঙ্করবাবুকে বলিয়াছিলেন, আমি "Terrible man."। (পৃঃ ১৬০)

৯। নিজে দুর্বল না হইলে অপরে আমাকে নীচে ফেলিবে কি করিয়া? অভিযোগে ক্ষান্ত দিয়া বাঙালীর আত্মদর্শনের দিন আসিয়াছে। পৃঃ ১৮৩)

১০। বড়দের ত্যাগই আমরা বড় করিয়া দেখি। ইঁহাদের ত্যাগ চোখে পড়ে না। অগণিত সত্যিকার দেশপ্রেমিকগণ অজ্ঞাত, অবহেলিত। (পৃঃ ১৫৯)

১১। শান্তিনিকেতন জাতীয় ভাবধারার হদিস পায় নাই (পৃঃ ১৭৭)

১২। জিজ্ঞাসা করি, সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীর সমাজ ব্যবস্থা চর্চার অধিকার কি? (পৃঃ ১৬৮)

১৩। গান্ধীর মর্কটানুকরণ। (পৃঃ ১৭৬)

১৪। বইয়ের পোকারা ভুলিয়া যান যে মানুষের মধ্যে ভালমন্দ পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির সমাবেশ থাকেই। (পৃঃ ১৮৬)

১৫। অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, ইনডিসিপ্লিন বাঙালীর মজ্জাগত দোষ --সমাজে ও রাজনীতিতে তাহা জাজ্জ্বল্যমান। (পৃঃ ১৯১)

১৬। কলিকাতায় সহস্র কালচারেল ক্লাব সত্ত্বেও বাঙালীর আত্মা মৃত। (পৃঃ ২০২)

এই স্মৃতিচারণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত উপরের মন্তব্য সমূহ শ্রীহট্ট গৌরব ব্রজেন্দ্রনারায়ণকে পাঠক সমাজের নিকট যথাযথ উপস্থাপনে সহায়ক হইবে সন্দেহ নাই। রাজরোষ, লাঞ্ছনা যেমন তাঁহার কপালে রক্ততিলক রূপে শোভা পাইয়াছে, তদ্রূপ দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চন্দনতিলকও তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৬৩ সালে শ্রীহট্ট সম্মিলনী তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ১৯৭৪ সালে মহাজাতিসদনে তাঁহার চিত্র স্থাপন দেশবাসীর প্রীতিরই নিদর্শন।

লেখকের নিজ রচনা অপরিবর্তিত থাকিলে তাঁহার রুচি ও মন সম্বন্ধে পাঠকসমাজ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন। সম্পাদকত্রয়ী রচনার উপর "স্থূল হস্তাবলেপ" করেন নাই এ জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত গ্রুপ ছবিটি সরকারী মুদ্রণালয়ের অধীক্ষক, ভূমিকালেখকের একান্ত স্নেহভাজন শ্রীমান রণবীর দাশগুপ্তের সংগ্রহ হইতে ভূমিকা লেখকের উদ্যোগে সংগৃহীত। শ্রীমান রণবীর এই ছবিখানি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সম্পাদকত্রয়ীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীহট্টের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের যে সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহার এক কালানুক্রমিক তালিকা পরিশিষ্টে বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহার রচনার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। তাঁহার অনেক ইংরাজী প্রবন্ধও আছে। তৎকালীন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় (১৯৩৭—৪০) তিনি ধারাবাহিকভাবে তখনকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইত তাহার বিবরণ লিখিতেন। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় পরিষদের Indian Tea Control Bill সংক্রান্ত Subject Committee-র বেসরকারী সদস্যপদে থাকাকালে ঐ বিলটির যথাযথ রূপদানে

তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সরকারী নথিপত্রে স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় পরিষদ ও আসাম বিধানসভার কার্যবিবরণীতে তাঁহার বহু বক্তৃতা ও আলোচনা লিপিবন্ধ হইয়া আছে। ইংরাজী জনশক্তির সম্পাদকীয়, Sylhet Chronicle-এ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য মনে করি। ঐ গুলি ব্যক্তি ব্রজেন্দ্রনারায়ণকে বুঝিবার পক্ষে অপরিহার্য মনে করি।

ব্রজেন্দ্রবাবুর তিন কন্যা আমার সংগ্রহে রক্ষিত তাঁহার পিতার প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবন্ধ করিয়াছেন। গবেষকগণের সেবা করার ইচ্ছা লইয়া এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমার সংগ্রহটিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছি। ইহা যাঁহারা ব্যবহার করিবেন তাঁহারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত স্মৃতিচারণের পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত বাংলা প্রবন্ধসমূহের নকল আলোচ্য গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীমতী বাণী দত্তের নিকট আছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করিতে পারেন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর এই স্মৃতিচারণ গ্রন্থখানি ভাবী ঐতিহাসিকের নিকট এক আকর গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইবে।

এই ক্ষুদ্র ভূমিকা শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা মনে হইতেছিল। পূর্ব পাকিস্তান-এ (বর্তমান বাংলাদেশ) নির্ভীকভাবে কথা বলিবার মত লোক খুব বেশী ছিল না। গ্রন্থকার সেখানে দীর্ঘকাল ছিলেন। তাঁহার রচনায় সদ্যোজাত পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের বিশেষতঃ হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাইবার আশা ছিল—তাহা পাই নাই। ১৫২ পৃষ্ঠায় লেখক লিখিয়াছেন "দেশবিভাগের পরবর্তী অবস্থা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবে না"—এই সঙ্গে তিনি একটি কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়াছেন—যাহা গভীর অর্থব্যঞ্জক। ইহার পর আমাদের আর বলিবার কিছু থাকে না!

সর্বশেষে এই গ্রন্থের সম্পাদকত্রয়ীকে আমার আন্তরিক শুভকামনা ও অভিনন্দন জানাই। ভাবী ঐতিহাসিকগণ এই গ্রন্থে গত অর্ধশতাব্দীর ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের এক যথার্থ চিত্রের সন্ধান পাইবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীহট্টের মানচিত্র	
প্রাকৃতিক অবস্থান	১
বংশলতিকা	৪
বংশপরিচয়	৫
জন্ম	৮
সামাজিক জীবন	৮
বাল্যশিক্ষা ও পরিবেশ	১০
পিতা, মাতৃগণ ও পরিজনবর্গ	১৪
গ্রামে চিকিৎসা	১৮
বাল্যসঙ্গী	১৮
সহরে স্কুলজীবন	১৯
স্কুলে ও গৃহে পঠিত পুস্তক	২৫
স্কুলে সতীর্থগণ	২৬
ভূমিকম্প	২৭
স্কুলজীবনে সহরের সমাজ	২৯
শ্রীহট্টের ব্রাহ্মসমাজ	২৯
বঙ্গবাসী পত্রিকা	৩০
কলেজে কলিকাতায় (১৯০০—১৯০৭)	৩১
খাদ্যাবিচার	৩১
সুরেন্দ্রনাথ-গোখলে-কার্জন	৪৩
বিডন স্কোয়ারে অধিবেশন	৫২
পুস্তকে পাঠ	৫৭
কলেজে অধ্যাপকগণ	৫৯
কলিকাতায় দাঙ্গা	৬৫
কলিকাতায় যুবরাজ ও বয়কট	৬৬
কলিকাতায় কীর্তনের প্রচার	৬৬
প্রলয়চেতাবনী	৬৭
তখনকার রোগসমস্যা ও ডাক্তার কবিরাজ	৬৭
শতাবধানী ও ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট	৬৮
সহুরে সভ্যতা	৬৯
বাঙ্গালীর তিনটি গৌরব	৭১
১৯০০ সালের কলিকাতা	৭২
পঞ্চাশবৎসর পূর্বে ব্যবহারিক জীবনসামগ্রী	৭৩
কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি	৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রাম্য জমিদার (১৯০৭—১৯২৫)	৭৯
প্রসিদ্ধ জমিদারগণ	৯১
ভ্রমণ	৯৫
আলাপ-পরিচয় প্রসঙ্গে	৯৬
সন্তানদের শিক্ষা	৯৮
বিবাহ-সংস্কার	১০০
ফলিত জ্যোতিষ	১০১
সাধুসংগ	১০২
আহারশুদ্ধি	১০৪
বালাধন ও অপর কয়েকটি খুনের মামলা	১০৫
তুবড়ী অপহরণ মামলা	১০৬
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা	১০৮
শ্রীহট্টে হিন্দু প্রতিষ্ঠান	১০৯
শ্রীহট্টে শাহজলাল	১১১
শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি	১১১
সিলেটে কায়কারবাব	১১২
শ্রীহট্টে ডাক্তারকবিরাজ	১১৪
পরিচিত পণ্ডিতগণ	১১৫
শ্রীহট্টে পরিচিত কতিপয় ব্যক্তি	১১৮
রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে (১৯২৩—১৯৪০)	
রাজনীতি	১৩২
বন্যা-দেশপ্রেম-সমাজসেবা	১৩৫
আইন-অমান্য	১৩৮
কারাজীবন	১৩৯
শ্রীহট্ট আসামের নেতৃবৃন্দ	১৪২
সাংবাদিকতা	১৪৩
কংগ্রেস-কমিটি ও কংগ্রেসী বন্ধুগণ	১৪৭
শিক্ষাক্ষেত্রে	১৫১
শ্রীহট্টে খিলাফৎ আন্দোলন	১৫২
আমার জানা লোক	১৫৫
বিবিধ প্রসঙ্গ	
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী	১৭২
কায়কল্প	১৭৪
জাতীয় শিক্ষা	১৭৫
লোকশিক্ষাপ্রচার	১৭৮
নারীজাগরণ	১৭৯
রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র	১৮১
অহিংসা ও খাদি	১৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
কংগ্রেসের সত্যাবক্কাত—ঝাটাতপন্থা	১৮৪
নেতৃত্ব চিরকালই আভিজাত্যের থাকিবে	১৮৪
নিয়মানুবর্তিতা ও উপরিওয়ালাকে মান্য	১৮৬
স্বদেশী কারবার	১৮৮
বেঙ্গল রেজিমেণ্ট	১৯১
আফিসের সময়	১৯২
মাদক দ্রব্য নিষেধ	১৯৩
ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা	১৯৫
ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী	১৯৭
বিমানযুগের প্রারম্ভ	২০৩
১৯১৪ ইংরাজী ও ১৯৩৯ ইংরাজীর যুদ্ধ	২০৭
এই দেশ একটি বৃহৎ কারাগার	২০৯
দ্রব্যমূল্য	২০৯
অর্ধশতাব্দীতে সভ্যতার উন্নতি	২১২
রঙ্গতামাসা	২১৪

পরিশিষ্ট

অধীত পুস্তক (লেখককৃত তালিকা)	২১৬
স্কুলে ও গৃহে পঠিত পুস্তক (পৃঃ ২৬)	২১৮
কলেজে কলিকাতায় (পৃঃ ৩৪, ৪৩)	২১৮—২১৯
গ্রাম্যজমিদার (পৃঃ ৮৮)	২১৯
ভ্রমণ (পৃঃ ৯৫)	২২০
শ্রীহট্টে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বিহঙ্গল আখড়া (পৃঃ ১০৯)	২২১
সিলেটে কায়কারবার (পৃঃ ১১২)	২২১
বন্যা দেশপ্রেম সমাজসেবা (পৃঃ ১৩৫)	২২২
কারাজীবন (পৃঃ ১৩৯)	২২২
কংগ্রেস-কমিটি ও কংগ্রেসী বন্ধুগণ (পৃঃ ১৫১)	২২৩
শিক্ষাক্ষেত্রে	২২৪
"Byron" (পৃঃ ১৫২)	২২৪
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামী (পৃঃ ১৮৩)	২২৫
ব্রজনাথ হাইস্কুল (পৃঃ ১৬০) শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী প্রদত্ত	২২৮
শ্রীদুর্গাপদ দাস	২২৯
ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী (পৃঃ ২০২)	২২৯
সহকর্মী সহযোগীদের অভিমত—	
জনশক্তি (পৃঃ ১৪৪) শ্রীনিস্তারণ গুপ্ত প্রদত্ত	২৩০
শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য প্রদত্ত	২৩২
শ্রীকালীরমণ ভট্টাচার্য প্রদত্ত	২৩৩
লেখকের প্রকাশিত প্রবন্ধ তালিকা	২৩৫
লেখক সংক্রান্ত রচনা	২৩৮
ব্রজেন্দ্রনারায়ণ-এর সন্তান-সন্ততিগণ	২৪০
নির্দেশিকা	২৪১

সূচনা

আমি ১৯৪০ ইংরাজীতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া যখন রাজনীতির সহিত সম্পর্ক বস্তুতঃ ছেদন করিয়াছিলাম তখন কিরণশঙ্কর রায় শ্রীহট্টের কংগ্রেসকর্মী কেদারনাথ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করেন "ব্রজেন্দ্রবাবু কি করছেন? তিনি কি আত্মজীবনী লিখছেন?"

আমার ধারণা মানুষের জীবন যখন ফুরাইয়া যায় সে ভবিষ্যতের দিকে পিছন ফিরে তখন সে অতীত স্মৃতিচারণরূপ আত্মজীবনী লেখা সুরু করে।

আমি কি ফুরাইয়া গিয়াছি? আমার তাহা মনে হয় না। তবে আমি রাজনীতিতে ফিরিয়া যাইব সে সম্ভাবনা যখন নাই তখন আমি মনে করি আমার দেখা ঘটনাসমূহ লিখিয়া রাখাই ভাল। পরে ঐ গুলি ভুলিয়া যাইতে পারি। সত্তর বছর বয়েস তো হইল। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে দূরে থাকার দরুণ ঐ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করা সহজ। খেলোয়াড় হইতে দর্শক অনেক সময়ই খেলার চাল ভাল বোঝে। আত্মাদর ও আত্মপ্রত্যয় উন্নতির মূল। কিন্তু তাহার সহিত আত্মম্ভরিতা কিছু থাকিবেই। তজ্জন্য এ যাবৎ জীবনী লিখি নাই। জীবনের শেষপ্রান্তে সমাজের সহিত সংযোগ খুবই কম। এখন বাধা নাই।

আষাঢ়—১৩৫৯ বাং

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।



মধ্যনগর
তাহিরপুর
জাফলং
জয়ন্তিয়াপুর
দোয়ারাবাজার
গয়েনঘাট
সুনামগঞ্জ
কানাইর ঘাট
ছাতক
দোহালিয়া
ধরমপাশা
হরিপুর
শ্রীহট্ট
জয়কলস
সুর্মা নং
দিরাই
গোলাপগঞ্জ
বিশ্বনাথ
মোগলবাজার
জগন্নাথপুর
তাজপুর
ফেঞ্চুগঞ্জ
বড়লেখা
কালনী নং
পাইলগাঁও
মানু নং
ইনাতগঞ্জ
বালাগঞ্জ
সল্লা
নবীগঞ্জ
জুরি
কুশিয়ারা নং
রাজনগর
আজমিরিগঞ্জ
বানিয়াচঙ্গ
কুলাউড়া
বিথঙ্গল
মৌলবিবাজার
পৃথিমপাশা
বরাক নং
সমসেরনগর
হবিগঞ্জ
বাহুবল
মাদনা
শ্রীমঙ্গল
কমলগঞ্জ
লাখাই
সায়েস্তাগঞ্জ
ছাতিয়ান
মাধবপুর
আসামপাড়া
ইটাখোলা
হরিশপুর

প্রাকৃতিক অবস্থান

আকবরের আমলের "শিলহট"—বর্তমান নাম জিলা শ্রীহট্ট বাঙলার পূর্ব সীমান্তে। দৈর্ঘ্যে ৭০ মাইল, প্রস্থে ৬৫ মাইল, বিস্তার প্রায় ৫০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২৮ লক্ষ—হিন্দু ১১ লক্ষ, আর মুসলমান ১৭ লক্ষ (১৯৪১ সালের গণনা)। জিলার উত্তরে খাসিয়া পর্বতশ্রেণী—সাধারণ উচ্চতা ৩।৪ হাজার ফুট, সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৬০০০ ফুট। উত্তর-পূর্ব কোণে জয়ন্তীয়া পাহাড় ও উত্তর কাছাড় পাহাড়, দক্ষিণে ত্রিপুরার পাহাড়, সাধারণ উচ্চতা হাজার ফুট মাত্র। জিলাটি উত্তর-পূর্ব কোণ ও দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খুব নিচু, এমন কি স্থানে স্থানে সমুদ্রতল হইতেও কয়েক ফুট নিচু। আমাদের অঞ্চল খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলের অতিবৃষ্টির জলে প্লাবিত থাকে। চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বারিপাত হয়—বৎসরে ৪৫০ ইঞ্চি. শ্রীহট্টে ১২৫ ইঞ্চি, কলিকাতায় তদর্ধেক মাত্র। জিলার দক্ষিণাংশে পাহাড়ের নিকট দিয়া আসাম-বাঙলা (পূর্ববঙ্গ) রেল। দক্ষিণ দিকের উচ্চভূমি উর্বরা, ফসল—ধান, পেঁয়াজ, আলু ও অন্যান্য সব্জী। আমাদের অঞ্চলে বর্ষায় গ্রামান্তরে এমন কি গ্রামের ভিন্ন পাড়ায় নৌকা ভিন্ন যাওয়া যায় না। গরীব লোক কলাগাছের ভেলা ব্যবহার করে। দুইটি পাড়ার মধ্যে ক্ষুদ্র খালগুলিতে বাঁশের সাঁকো দেওয়া হয়। দুই-তিনখানি বাঁশ বৃত্তাংশাকারে খালের উভয় পারে সংলগ্ন মাটিতে পোঁতা এবং জলের মধ্যে সামান্য ব্যবধানে পর পর পোঁতা খুঁটির মত কয়েকটি বাঁশের কাঁচির (X) মধ্যে আটকান। সেতু নির্মাণ কৌশল বা খিলান (arch) সামান্য বাঁশের পুল হইতে বিখ্যাত সিডনী ব্রিজ পর্যন্ত সমতুল্য। অতি সাবধানে ঐ বাঁশের পুলের উপর দিয়া চলিতে হয়। দৈর্ঘ্য বেশী হইলে হাতে ধরিবার উপযুক্ত উচ্চতায় বাঁধা একটি বাঁশ রেলিং-এর কাজ করে। অভ্যস্ত "ভারী" কাঁধের বাঁকে একমণী বোঝাও অক্লেশে লইয়া চলিতে পারে।

কার্তিক মাসে মাঠের জল শুকাইয়া যায়। শীতের ছয় মাস মাঠ শুকনো, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র নালায় বা নিচু স্থানে বিলে বাদায় জল থাকে, কাদা থাকে। মাঠে ফসল আমন ধান্য ও বুরো বা জলি ধান্য। নিম্নভূমিতে অন্য ফসল ফলে না। নদীর ধারে উচ্চতর ভূমিতে পাটের চাষ আমাদের আমলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। মৎস্য নিম্নভূমির একটি প্রধান ফসল—নদী অপেক্ষা বিলে-বাদায়ই উহা বেশী পাওয়া যায়। কুশিয়ারা ও সুর্মা এবং তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় জিলাটি নদীমাতৃক। সুর্মা, চুনাপাথুরী খাসিয়া পাহাড় উদ্ভূত উপ-

নদী-পুষ্ট হওয়ায় সুরমার জল পরিষ্কার, পলিমাটি বিহীন। কুশিয়ারা ও ইহার শাখাগুলি মণিপুর, উত্তর কাছাড় ও ত্রিপুরা হইতে আসায় জলে পলিমাটি আছে। পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ জিলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের পলি অধিক থাকায় ঐ সকল জিলা পলিমাটিতে উচ্চতর হইতেছে। ফলে শ্রীহট্ট জিলা নিম্নতর হইয়া বাটির মত১ হইয়া যাইতেছে। শ্রীহট্টে ঘন ঘন বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ার ইহাই কারণ। ইংরেজ আমলের প্রথম দিককার ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডসে ঘন ঘন বন্যার উল্লেখ আছে। ক্ষুদ্র নদীতে পাটনীরা, গভীর বিলে কৈবর্তরা, বড় নদী ও অগভীর বিলে মুসলমান মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে। নৌকাবাহী পাটনীই পূর্বে বেশী ছিল। আমাদের সময়ে মুসলমান মাঝির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটনী এখন খুব কম। পাটনীরা দরিদ্র। কৈবর্ত ও মুসলমান মৎস্যজীবী ধনী আছেন।

জিলার নিম্নভূমিটি জনবিরল। গ্রামগুলি ২।৩ মাইল এমন কি ৮।১০ মাইল দূরবর্তী। গৃহস্থের সংখ্যা ২০।২৫ ঘর হইতে ৩০০।৪০০ ঘর। বানিয়াচং (যাহা পূর্বে মুসলমান আমলে এক সামন্তের রাজধানী ছিল) পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রাম লোকসংখ্যা ৯৬০০০ (১৯৪১),—শহরের কোন চিহ্ন নাই বৃহৎ গ্রাম মাত্র। আমাদের বাড়ী হইতে ১৫ মাইল দূরে। আমাদের গ্রামের সহিত পার্থক্য শুধু আয়তনে ও লোকসংখ্যায়। আমাদের গ্রামের গৃহস্থ সংখ্যা ৪০০ ঘর। একই চৌকিদারী সার্কেলের ভিতর এক চতুর্থাংশ মাইল দূরবর্তী দুইটি ক্ষুদ্র গ্রামও আছে—প্রথম হইতে ইহারা একই সমাজবন্ধনে ছিল। এই চৌকিদারী সার্কেলে মুসলমান নাই। অন্যান্য প্রায় সব গ্রামেই হিন্দু-মুসলমানের বাস ছিল—যদিও পাড়া বিভিন্ন। প্রাচীন গ্রামগুলিতে হিন্দুরা কেন্দ্রে বাস করে। পরবর্তীকালে মুসলমানেরা ইহাকে ঘিরিয়া নূতন বসতি স্থাপন করিয়াছিল। আধুনিক গ্রামগুলিতে কেবল মুসলমান,—হিন্দুগ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ,২ ধোপা, প্রায় সব জাতিতেই সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, এখনও বহুলাংশে আছে। পুলিশের থানাটির আধিপত্য প্রায় সমগ্র পরগণা বিস্তৃত। লোকসংখ্যা ৬০০০০। থানা আমাদের গ্রাম হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী। কোন কোন গ্রাম থানা হইতে ৮।১০ মাইল দূরে। আমাদের আমলে ঢাকা, মৈমনসিংহ জিলা হইতে বহু ঔপনিবেশিক মুসলমান আসিয়াছে। ১৮৬০ ইংরাজীর জরিপে আমাদের কাছের একটি গ্রামে লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু, এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। ১৯৪১ ইংরাজীর লোক গণনায় মুসলমান তিন চতুর্থাংশ, হিন্দু এক চতুর্থাংশ। এখন আবাদযোগ্য পতিত জমি প্রায় নাই। পাঠান ও মোগল আমলের কয়েকটি প্রাচীন মুসলমান জমিদার পরিবার আছেন। তাহাদের গ্রামে প্রায় সবই মুসলমান।

এই জেলার হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোকের শাদী-সম্বন্ধ পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জেলার পরগণাগুলির সহিত। এই পরগণাগুলির বহু অংশ মুসলমান আমলে শিলহটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শিলেটকে আসামে ঠেলিয়া দেওয়ার পূর্বে উহা ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

১. Sylhet Basin

২. সদগোপ, মালাকার, তেলী, তাঁতী, ময়রা, বারুই, কুম্ভকার, কর্মকার ও নাপিত—এই নয় প্রকার জাতি।

লেখকের বংশলতিকা

আদি পুরুষ—চিত্রগুপ্ত ধর সাং মঙ্গল কোট রাঢ়দেশ বর্তমানে জিলা বর্ধমান

তস্যপুত্র—
কানাইলাল ধর
ভাষ্কর ধর
পুষ্কর ধর
বীরনাথ ধর
গিরীনাথ ধর
কীর্তি ধর
গজেন্দ্র ধর
রাজেন্দ্র ধর
শশীকর ধর
বালকদাস ধর
উমানন্দ ধর
মাধবরাম ধর
|
মোহনরাম ধর

দুর্লভরাম ধর　গোলাবরাম ধর　হুলাশরাম ধর　জগজ্জীবন ধর

জগজ্জীবন ধর →
জয়নারাইন　বিজয়নারাইন　রায়নারাইন ধর

বিজয়নারাইন →
ব্রজনাথ ধর

ব্রজনাথ ধর →
রসময় ধর　সুখময় ধর

রসময় ধর →
ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ধর

বংশ পরিচয়

বংশাবলীতে উল্লেখ আছে যে আমা হইতে ১১ পুরুষ পূর্বে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট হইতে, অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে সম্ভবতঃ রাষ্ট্রীয় গোলযোগে আমাদের পূর্বপুরুষ ধরবংশীয় কানাইলাল পূর্বাঞ্চলে আসেন। পৈল গ্রামে ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পূর্বপুরুষও একই সময়ে কি কিছু পূর্বে মঙ্গলকোট হইতে আসেন। বর্তমানে মঙ্গলকোটে ধর বা পাল উপাধিধারী কেহ নাই। বিপিনবাবু অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন যে সেখানে পালের দীঘি নামে একটি প্রাচীন দীঘি আছে। ছয় শত বৎসর পর রাষ্ট্রীয় গোলযোগে পশ্চিমবাংলা হইতে আগত ঐ পরিবারগুলি আবার পশ্চিমমুখী হইতেছে। "Eastward ho"—further east—প্রগতিমূলক বাণী—কিন্তু পূর্বদিকেই এখন বাধা!

আমার পূর্বপুরুষ পালবংশে বিবাহ করিয়া পা(ই)ল গাঁয়ে বসতি স্থাপন করেন। বানিয়াচঙের মুসলমান এক সামন্ত জমিদার, লাউড়ের রাজা বিজয় সিংহের অন্যতম রাজধানী জগন্নাথপুর আক্রমণ করিয়া লুটপাট ও রাজপরিবারকে হত্যা করার পর অরাজকতার উদ্ভব হইলে পরে ধর বংশের দশম পুরুষ বালক দাস কুবাজপুর মৌজার বন্ধু হরিহর এষচৌধুরীর সহযোগে জগন্নাথপুরের রাজত্বের অধিকাংশ, সম্ভবতঃ তিন চতুর্থাংশ দখল করিয়া লন। বাকী এক চতুর্থাংশ রাজার গুরুবংশ সাচোয়ানী মৌজার ব্রাহ্মণ চৌধুরীদের দখলে গেল। দ্বাদশ পুরুষ শ্রীরাম ও তদীয় ভ্রাতা মাধবরাম ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান বাদশার সুবেদার তদীয় পুত্র শাহসুজার নামাঙ্কিত সনন্দ বলে চারি হাজার কুলবা অর্থাৎ চল্লিশ হাজার বিঘা ভূমি-জমিদারী বাৎসরিক চারি হাজার টাকা খাজনায় প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর পর বানিয়াচঙের জমিদার একই ভূমির আরেক সনন্দ বাদশা আলমগীর হইতে প্রাপ্ত হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে বানিয়াচঙের জমিদার আদম রজা, কোরবান রজা ঐ জমিদারী নিজের বলিয়া দাবী করেন। দেওয়ানী মোকদ্দমায় পাইল গাঁয়ের ধরচৌধুরীদের দখল প্রমাণ হয়। মোকদ্দমায় বিতর্কিত বিষয় ছিল—সুবেদারের দেওয়া পূর্ববর্তী সনন্দ, পশ্চাৎপ্রাপ্ত বাদশাহের স্বাক্ষরিত সনন্দ হইতে প্রবল হইতে পারে কি না। জিলা আদালত এবং ঢাকার ডিভিসনাল আদালতের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। সদর দেওয়ানীতে চূড়ান্ত মীমাংসায় ধরচৌধুরীদের দাবী স্বীকৃত হয়।

শ্রীরাম-মাধবরামের পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া বহু শাখা হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে ১৭৯৪-তে ১৬টি শাখায় বিভক্ত পরিবারের ১৬টি তালুক বন্দোবস্ত হয়। বংশ বৃদ্ধির ফলে প্রায় ৫০টি পৃথগন্ন পরিবার রহিয়াছে। অনেকে কার্য উপলক্ষে বিদেশে আছেন। কিন্তু প্রায় সকল পরিবারেরই জমি বন্দোবস্ত গ্রামে রহিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মোহনরামের পরিবারই বর্ধিষ্ণু ছিলেন। মোহনরাম পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়া পিতা মদনরাম ও নিজের নামের সহিত মিল রাখিয়া মদনমোহন ও তৎসহ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং ভোগপূজার জন্য জমিদারীর সর্ববৃহৎ গ্রামটির ২০ হাজার বিঘা জমি দেবসেবায় উৎসর্গ করেন। দেবোত্তর দলিল সম্পাদন করা হয় নাই এই অজুহাতে কোনো কোনো উত্তরাধিকারী নিজ নিজ অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি অবস্থা অনেকের হীন হইলেও সকলেই দেবসেবার গুরু-ভার এখন পর্যন্ত বহন করিয়া আসিতেছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এখন১ সেবার ব্যয় তিনশত টাকা।

আমরা মোহনরামের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র জগজ্জীবনের বংশধর। পিতার মৃত্যুর পর চারি পুত্র পৃথক হন। জগজ্জীবনের পুত্র জয়নারায়ণ ও বিজয়-নারায়ণ স্ব স্ব প্রতিভাবলে জেলাব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। বিজয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র ব্রজনাথ জিলাবারের ফার্সী জানা প্রথম শ্রেণীর উকীল ছিলেন। তিনি ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পিতা ৺রামচন্দ্র পালের সমসাময়িক। ব্রজনাথ কয়েকটি জমিদারী ক্রয় করেন। তদীয় পুত্র রসময় (মদীয় পিতৃদেব) সাদা-সিদা ও হিসাবী লোক ছিলেন। তিনিও কয়েকটি তালুক ক্রয় করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায়বাহাদুর সুখময় চৌধুরী সি. আই. ই অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—শ্রীহট্ট শহরে বাস করিতেন।

মোহনরামের পরিবার মূল মালিক মাধবরামের উত্তরাধিকার সূত্রে যে পরিমাণ সম্পত্তি প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমিদারী দখল করিয়াছেন দেখা যায়। দুইটি খসড়া কাগজে দেখা যায় যে দুইবার এই জমিদারী বাঁটোয়ারার চেষ্টা হইয়াছে। এই দখলীকৃত জমিদারী জবরদখল জনিত, অথবা প্রতিভাবানের ন্যায্য দাবী তাহা বলা কঠিন। সেকালে জনবিরল নলখাগড়াপূর্ণ জলাভূমিতে দখলাধিকার রক্ষা করা কঠিন ছিল না। প্রতিবেশী জমিদারদের মধ্যে সর্বদাই দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত। রাজ সরকার ইহার খবর হয় তো জানিতেন না।

বর্ষায় প্লাবিত প্রান্তর বা হাওরে (সাগর শব্দের অপভ্রংশ) প্রায়ই ডাকাতি হইত। ডাকাতদের সহিত যোগাযোগের অখ্যাতি অনেক জমিদারের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—ডাকাতির খ্যাতি না থাকিলে বনিয়াদী জমিদার গণ্য যায় না। আজ অহিংস যুগে ডাকাতি ঘৃণ্য মনে হইতে পারে কিন্তু স্মরণ

রাখা কর্তব্য যে সেকেন্দর শাহ ও সামান্য বীর ডাকাতে বিশেষ প্রভেদ নাই। চরিত্র ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে আজ প্রত্যেক দেশেরই রাষ্ট্রপ্রধানের ডাকাতে চরিত্র আবিষ্কার হইতে পারে। বর্ষায়ই দূরদেশ গমনে সুবিধা ছিল। লোকে বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া যাইত জলডাকাতের ভয়ে। বড় বড় ডাকাতরা যেমন ভক্ষক ছিল তেমন রক্ষকও ছিল। গরীবদের ইহারা উত্যক্ত করিত না। দেশ বিভাগের পর অরাজকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার অস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজের কড়া শাসনে এবং বিদেশী বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে পাট ধান ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দরুণ প্রজা তুষ্ট এবং শান্ত ছিল। এখন আবার অশান্তির যুগ চলিতেছে। অহিংসা এ যুগের ধর্ম নহে।

১২৯১ বাংলা, ১৮৮৪ ইংরাজীর হিসাবে দ্রব্যমূল্য এইরূপ দৃষ্ট হয়—

লবণ (সের) ⁄৫ (এক আনা এক পয়সা)
গুড় (সের) ✓০ (দুই আনা)
মুগ ৶১০ (তিন আনা দুই পয়সা)
হলদি ।০ (চার আনা)
তৈল ।✓০ (ছয় আনা)

চাকরের বেতন—

খোরাকী ও নগদ ২৲ টাকা (মাসিক)
সাড়ী (১ জোড়া) ১৷৷✓০ (এক টাকা দশ আনা)
মরিচ (লঙ্কা) (১ সের) ৸০ (বারো আনা)
মার্কিন কাপড়—গজ ৶০ (তিন আনা)
ধান্য (১ মণ) ১৲ টাকা
ঘৃত (১ সের) ১৲ টাকা
দুধ[২] (১ সের) ✓০ (দুই আনা)

১৮৬৯-এ ছেলের বিবাহে মোট খরচ তিন হাজার মধ্যে খাদ্যমূল্য ৮০০ টাকা, সামাজিকতায় ব্যয় ৫০০ টাকা। ঐ বাবতে আয়—শিউলী প্রণামী ৪৫০ টাকা।

(১) ১৯৫৪-৫৫ ইং
(২) আষাঢ় মাসে দুধ দুষ্প্রাপ্য।

জন্ম

[জন্ম--১৮৮১ ইংরাজীর নবেম্বর, ১২৮৮ বাংলার কার্তিক মাসে ক্ষুদ্র গ্রামে—নয় বৎসর গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা—আট বৎসর জিলা শহরে মাধ্যমিক শিক্ষা--কলিকাতায় কলেজে ছয় বৎসর—এক বৎসর জিলা শহরে ওকালতি—কুড়ি বৎসর গ্রামে বাস—জমিদারী পরিদর্শন—পুনরায় জিলা শহরে বাস—আসাম কাউন্সিলে আট বৎসর—আইন অমান্য আন্দোলনে পাঁচ বৎসর---দিল্লী কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে পাঁচ বৎসর।।

এই উত্তরাধিকার ও পরিবেশে আমার জন্ম গ্রামে। মোহনরামের চারিপুত্রের বংশধরদের পাশাপাশি বাড়ী—স্বভাবতঃই আড়াআড়ি, সম্মান ও সম্পত্তি নিয়া খুঁটিনাটি বিবাদ ও দলাদলি প্রায়ই থাকিত; কয়েক মাস পরে মীমাংসাও হইয়া যাইত। সামাজিক বিষয়, বিশেষভাবে, দুশ্চরিত্রকে একঘরে করা নিয়া দলাদলি হইত। হিন্দু কৃষ্টি, সভ্যতা বা কালচার জীবনযাত্রার আচরণসম্মত—স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ভাষায় "Way of Life"। আচারভ্রষ্ট লোক ঘোর অপরাধী গণ্য হয়। "ণ"—বিহীন 'আচার' শব্দ ইংরাজী শিক্ষিতকে বিভ্রান্ত করে।১ গ্রামে হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার্থ আমার সময় পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ দরকারে আতুয়াজান পরগণায় একটি সামাজিক পার্লামেন্ট বসিত। বিকাল তিনটা হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত সভা চলিত। সভাশেষে আহ্বানকারী সভ্যদের খাওয়াইতেন। সভায় আসিতেন ইশাখপুর মৌজার আঠার পরগণার বাদশাহী সনন্দপ্রাপ্ত রাজপণ্ডিত ব্যবস্থাপকগণ, সাধারণ ব্রাহ্মণশ্রেণী বা ভূ-দেবতাগণ ও শ্রীকর্ণী অর্থাৎ ছোট বড় মিরাসদার শ্রেণী। রাজপণ্ডিত শাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতেন। সকলে তখন কর্তব্য স্থির করিতেন। প্রস্তাব কার্যকর করার দায়িত্ব শ্রীকর্ণীর। আমার অভিমত, এই সভা বিদ্বেষ বৃদ্ধি অপেক্ষা সামাজিক একতাই বেশী বৃদ্ধি করিত। বিগত বিশ বৎসর কোনো সভা ডাকা হয় নাই। ব্যক্তি স্বাধীনতার দিনে ইহা অচল।

পিতামহ ব্রজনাথ ওকালতি ছাড়িয়া গ্রামে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। প্রথম পৌত্র, আমি খুবই আদরের ছিলাম শুনিয়াছি। আমার পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শৈশবে জীবনযাত্রার প্রণালী অতি সাদাসিদা ছিল। মুদ্রার মূল্য হ্রাসের হিসাব ধরিলে এখন অপেক্ষা তখন আর্থিক অবস্থা অধিক সচ্ছল ছিল, তথাপি বিলাসিতা তো ছিলই না এমন কি আরামও বিশেষ ছিল না। এখন জন্মিবামাত্র নাতিকে আমার লেপতোষক দিতে হয়। আর

আমরা শুইয়াছি মেজেতে নলের চাটাইয়ের উপর কাঁথা পাতিয়া। রাত্রে তক্তা-পোষের ওপর পাতলা তোষকের বিছানা, খাট বা গদি ছিল না। বাড়ী যদিও পাকা, ঘরগুলি মাত্র ৯×১২ ফুটের বেশী নয়। ঘরে দুইটি মাত্র দরজা, জানালা নাই। ৯ ফুট উঁচু খিলান (অর্ধবৃত্তাকৃতি) বীমবরগা ছিল না। প্রসূতির পথ্য সাবু, দুধ, ঘি, খুদের ভাত ও পেঁয়াজভাজা—পোর্টওয়াইন, ওভালটিন ইত্যাদি এখনকার অবশ্য ব্যবহার্য ঔষধ পথ্যের নামই জানিতাম না। নয় বৎসর বয়সের পূর্বে জামা গায়ে দেই নাই। শীতকালে দোলাই বা ডবল জুটের চাদর, বৃদ্ধেরা যুগীর প্রস্তুত গেলাপ। শহরে আসার পূর্বে জুতা পায়ে দেই নাই। বাবা২ বাড়ীতে কখনও জুতা পায়ে দিতেন না। বাহিরে যাইতে কাঁধে আট আনা (এখনকার ৫০ পয়সা) মূল্যের চাদর নিতেন। পরিতেন কাফির চাদর ও থান ধুতি। নেটের মশারি ছিল না। নয়ানসুক৩ অথবা সিলেটের মণিপুরী-দের তৈরী পাতলা মশারি। আহার, প্রাতে বিধবা ঠাকুরমার প্রস্তুত ভাত মাখন খেঁসারির ডাল, বড়দের জন্য শুকনা মাছের ঝোল (শুঁটকি) খেসারির ডালের বড়া—স্বাদ লাগিত যেন অমৃত। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের প্রসাদ। রাত্রে মা মাছ রান্না করিতেন। দুই তরকারীর বেশী নয়। অবশ্য তিনবারই একবাটি দুধ খাইতাম। বাটি এত বড় ছিল যে খাইতে পারিতাম না। চিনি বাতাসা 'ডেলি-কেসি' গণ্য হইত। গুড়ের ব্যবহারই ছিল বেশী। চিনি বাতাসা বিদেশী ভদ্র-লোক আসিলে দেওয়া হইত। উৎসবে নারিকেল গুড়, তিলগুড়, ক্ষীরগুড়ের সন্দেশ ও কলাইয়ের ডালের জিলাপী। ঘরের গরুর দুধ যথেষ্ট হইত। ঠাকুরমা ঘি ও সরভাজা করিতেন—যাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। মুগের ডাল 'ডেলিকেসি' গণ্য ছিল। মুসুরি ডাল চল্লিশ বৎসর পূর্বেও গ্রামে হিন্দুরা ব্যবহার করিত না। আজও বিধবা ও সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ মুসুর ডাল খান না। বৈষ্ণব বংশ সুতরাং তখন মাংস খাইতাম না। বাবার মৃত্যুর পর বাড়ীতে মাংস রাঁধা আরম্ভ হয় (রান্না-ঘরে নহে)। পিসীমাদের শাক্তবংশে বিবাহ হইয়াছিল। পিসীমারা আসিলে তাঁহাদের জন্য হাঁসের ডিম সিদ্ধ হইত। গোপনে আমরাও ভাগ পাইতাম। দাদামহাশয়৪ ও বাবা ছিলেন আচারনিষ্ঠ যদিও তাঁহারা পূজা সন্ধ্যা বা ধর্ম আলোচনা করিতেন না। খুল্লতাত মহাশয় (সুখময় চৌধুরী) যদিও সায়েব-সুবা মহলে যাইতেন ও কলেজে পড়িয়াছিলেন তথাপি আচারনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কেবল হিন্দুর খাদ্য মাংস খাইতেন। সকলেই শ্রীগুরুপাটে (শ্রীহট্টের যুগলটিলা) ভক্তিমান ছিলেন। বিজয়নারায়ণ৫ তদীয় গুরু ঠাকুর-যুগলের বিগ্রহ, গৃহদেবতা গোপালজীউ ও শালগ্রাম শিলা একাসনে বসাইয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। জয়নারায়ণ৬ বৃদ্ধ বয়সে সস্ত্রীক সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি একটি সমগ্র গ্রাম গুরুপাটে দান করেন।

ব্রজনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার বৃদ্ধা জননী দশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল কিন্তু কার্যক্ষম ছিলেন। বিগ্রহ বালগোপালের সেবার আয়োজন নিজের হাতে করিতেন। শৈশবে আমরা তাঁহার ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার নিকট ঠাকুরমার ঝুলির৭ গল্প শুনিতাম। সন্ধ্যার পর হইতে আহারের পূর্ব পর্যন্ত গল্প ছাড়া শিশুদের সামলানো যায় না। প্রতিবেশী, জ্ঞাতি ও প্রজাদের সমবয়স্ক বালকদের সহিত খেলা করিতাম। দুই দল হইয়া যুদ্ধ হইত ; অস্ত্র, বাঁশের বন্দুক—তাহার গোলা গাছের গোটা (অখাদ্য শক্ত ফল)।

সামাজিক জীবন

বাবা শহরের হাইস্কুলে কয়েক বৎসর পড়িলেও বিদেশী শিক্ষার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। বাবা প্রায়ই গ্রামের ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক ও প্রজা (৪।৫ জন) সহ তৃতীয় শ্রেণীতে শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবনধাম ও জয়পুর প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতেন। তীর্থ ভ্রমণে নিজেদের মোট নিজেরাই বহন করিতেন। এই ভ্রমণের ব্যয়, একা প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইত না। ইহা সোসিয়ালিজম কি না পাঠক বিচার করিবেন। ইনডিভিজুয়ালিজম ও সোসিয়ালিজম এক সঙ্গে মিশে না। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় আমরা ঘোর ইনডি-ভিজুয়ালিস্ট হইয়া পড়িয়াছি।

দোল ও দুর্গোৎসবে যাত্রাগান ও কবি গান হইত। কবির দুই দল গ্রামেই গঠিত হইত। গানের জের পূজার একমাস পূর্ব হইতে এক মাস পর পর্যন্ত চলিত। পুরানো নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদায়ক এই সব যাত্রাগানে সকলেই উপস্থিত হইত। ইহার ব্যয় অধুনা কলিকাতার একটি ধনীপরিবারের সিনেমা দেখার ব্যয়ের সমান। কলিকাতায় ধনীরা কেবল পরিবার নিয়া দেখেন। এখানে সমস্ত গ্রাম দেখিত। এখানেও পূর্বোক্ত খাঁটি সোসিয়ালিজমের তর্ক উপস্থিত করা যায়। উৎসবে বহু লোক খাওয়ানো হইত। ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, অম্বল, জোলো দধি—ব্যয় সামান্য। এখনও বড়লোকের পার্টিতে এইভাবে পাঁচজনকে একজনের ব্যয়ে খাওয়ানো চলে। সামাজিকতা এখন খ্যাতি ও মতলবের জন্য, মোটেই আন্তরিক নহে।

এই পরিবারের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবহারে কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতেছি না। সমশ্রেণীর এবং কতকাংশে সর্ব সাধারণের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবহার অনুরূপই ছিল।

পিতামহ বানিয়াচং হইতে ভাল আম আনাইয়া গ্রামের লোককে খাওয়াইতেন। মুসলমানপ্রধান বানিয়াচঙের আমের খ্যাতি ছিল। প্রথামত

আমের সময় ঐ অঞ্চলের আম দিল্লীতে না পাঠানোর দরুণ আলমগীর বাদশা বাংলার তদানীন্তন শাসক নিজ পুত্রকে বিদ্রোহী মনে করিয়াছিলেন। পিতামহ ব্রজনাথ শ্রীহট্টের কাজী আবদুল জলীল সাহেবের বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্ব তিন পুরুষ যাবৎ চলিতেছে। আবদুল জলীল সাহেব তাঁহার গ্রামের বাড়ী মৌলবীবাজার হইতে বর্ষার সময় পাইল গাঁও হইয়া সিলেট যাইতেন। একটি বৃহৎ নৌকা ভর্তি নিজ বাড়ীর ফসল কাঁঠাল ও আনারস আনিতেন। সমগ্র গ্রামকে তাহা খাওয়ানো হইত। এইগুলি ছিল আমাদের শিশু ও বৃদ্ধের উৎসব। এককালে এই সামাজিকতা ও ক্রিয়াকর্মকে বিদেশীর মর্কট অনুকরণে 'অর্থনৈতিক অপব্যয়' বলিয়া চীৎকার করিয়াছি—কিন্তু ইহার নৈতিক প্রভাব অনুমান করুন। তখন উপঢৌকনের মর্যাদা পরিমাণ দিয়া মাপা হইত, মুদ্রামূল্য দিয়া নহে। একশ' টাকার আংটি একজনে ভোগ করে কিন্তু ঐ টাকার কাঁঠাল এক হাজার লোকে খায়। Economy of goods vs. economy of money.

শ্রীহট্টের জমিদার সৈয়দ বক্ত্ মজুমদার, আবদুল কাদের, আবদুর রহমান ও ব্রজনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ৫ মাইল দূরবর্তী সোদপুরের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ আসগর আলী সাহেব মধ্যে মধ্যে দ্বিপ্রহরে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত ফার্সী কাব্যশাস্ত্র পাঠ করিতেন। খুল্লতাতের (সুখময় চৌধুরী) বিবাহে মুসলমান বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়া পাইল গাঁও যান। তাঁহাদের জন্য মাঠে রান্নাঘর করিয়া খাসি ও মুরগী রান্না হয়।

গ্রাম্য ভূম্যধিকারী মনুশাস্ত্রানুযায়ী আয়ের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ পরার্থে ব্যয় করিতেন ছোট বড় সকলেই। কলিকাতার ব্যবসায়ী বনেদী ঘরগুলি তখন দাতা ছিলেন। কিন্তু ধনী আই. সি. এসের দল ইংরাজের মর্কট অনুকরণে ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও চাল বাড়াইয়া ফেলায় এই উদারতা দেখাইতে পারেন না ; হয় তো দুই একজন ব্যতিক্রম আছেন।

গৃহবিগ্রহের ভোগ-আরতি শিশু ও বালকদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এই প্রভাব চাপা পড়ায় এক সময় নিজেকে ছাত্র মহলে Agnostic (অজ্ঞেয়বাদী) বলিয়া প্রচার করিলেও যৌবনে আবার কুড়ি বৎসর গ্রামে বাস করিয়া গৃহবিগ্রহের তত্ত্বাবধান করিয়া যুক্তি বুদ্ধির আলোকে মূর্তিপূজার সুপ্রভাব বুঝিতে পারিয়াছি। বুঝিয়াছি টোলের পণ্ডিতের বৃত্তি শিক্ষাখাতে অনুদান।

প্রাতে আহার করিয়া বাহির হইতাম। সাঁতার কাটিয়া স্নান করিয়া বাড়ী আসিতাম। তৈল মাখার ভয়ে স্নান না করিয়া বাড়ীতে ঢুকিতাম না। ২০ বৎসর বয়সে প্রথম মাথায় তৈল ব্যবহার করি। ৪৫ বৎসর বয়সে গায়ে তৈল মাখা আরম্ভ করি। বাবা তৈল ব্যবহার করিতেন না, সাবান ছুঁইতেন না।

বাল্যশিক্ষা ও পরিবেশ

পাঁচ বৎসরে সরস্বতী পূজা করিয়া হাতেখড়ি হয়। পুরোহিত ঠাকুর কালো পাথরের খাদায় (কালো পাথরের থালা) খড়ি দিয়া ৺ আদি, ক'খ হাতে ধরিয়া লেখাইয়া দেন। ৺বিপিনচন্দ্র পাল এই ৺ কে 'ওম্' এর অপভ্রংশ বলিয়াছেন। আমাদের বলা হইত হুঁকো আটকাইবার আংটা। শিক্ষকগণ তখন খুব তামাক খাইতেন। এই অনুষ্ঠান বিদ্যার গুরুত্ব ও আধ্যাত্মিকতার আভাস দেয়। অবশ্য বাল্যে আধ্যাত্মিকতা আমাদের কাছে গূঢ় রহস্যময় মাত্র। পুরোহিত রূপ ঠাকুর আমাদের গ্রামেরই কুলপুরোহিতের আত্মীয় ও প্রতিনিধি। যৎ সামান্য সংস্কৃত জানিতেন। পবিত্রমনা ও সরল ছিলেন। গ্রাম্য দলাদলিতে ঢুকিতেন না। বিকালে দাওয়ায় বসিয়া প্রতিবেশী কৃষক মটনরামকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। জাত্যভিমান বা জাতিবিদ্বেষের কোনও আভাস আমি পাই নাই। পড়া না পারিলে রূপ ঠাকুর "গাধা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ছাত্রদের পৃষ্ঠে পিচাশের (পুটুশ) কঞ্চি দিয়া প্রহার করিতেন। কঞ্চি খণ্ড খণ্ড হইত। ছাত্র মনে মনে হাসিত : এই অতিভঙ্গুর কঞ্চির প্রহার কিছুই নয়। রূপ ঠাকুর ক্রমাগত তামাক খাইতেন। বাবার চাকরের ওপর স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার ছিল রূপ ঠাকুর আসিলে যেন কলিকার আগুন না নিভে। রূপ ঠাকুর বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত পুরান ও তন্ত্রগুলি প্রতিবেশী মিরাশদার ৺আনন্দ মোহন গুপ্ত ওরফে রায় মহাশয়ের সহিত নিত্য পাঠ ও আলোচনা করিতেন। রায় মহাশয় আমাদের বংশের গৃহজামাতা। রূপ ঠাকুর গ্রাম্য পাঠশালার একমাত্র শিক্ষক ছিলেন। ছাত্র সংখ্যা মাত্র দশ পনেরো জন, ব্রাহ্মণ, ভদ্র ও শূদ্র শ্রেণীর। অন্ত্যজ ও স্ত্রীগণের শিক্ষা তখনও আরম্ভ হয় নাই। আমাদের বাল্যাবস্থায় ভদ্রশ্রেণীর বালিকারা গৃহেই লেখাপড়া শিখিত। বাবার ছোট পিসী প্রথম 'শিক্ষিতা'। তিনি কাকচরিত্র, সন্মমুরোগ, কৃত্তিবাস পাঠ করিতে পারিতেন। আমার অভিজ্ঞতা এই যে কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি প্রাপ্ত বয়সে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। সর্ব সাধারণের এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন নাই। আশা করি এখন হইতে কৃত্তিবাস কাশীদাসই যথেষ্ট শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইবে।

বিদ্যারম্ভের পর বাড়ীতে প্রবীণ সরকারী আমলা, সরকার কাকার নিকট বর্ণপরিচয় হয়। এক বৎসর পর রূপ ঠাকুরের পাঠশালায় ভর্তি হই। পড়ায় ভাল ছিলাম না। দুই বৎসরে শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ উত্তীর্ণ হইতে না পারায় পাঠশালা ছাড়িয়া ব্রজেন্দ্র কিশোর সেন মহাশয়ের নিকট বাড়ীতে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিলাম। ইঁহার বাড়ী মোলবীবাজার বারহাল গ্রামে। আমাদের গ্রামে প্রথম প্রাইভেট বালিকা বিদ্যালয় খুলেন। তাঁহার সহিত

বন্দোবস্ত হইল দুই বৎসর মধ্যে প্রাইমারী পরীক্ষায় আমি মাসিক ৫ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইলে মাসিক বেতনের (যতদূর মনে হয় ৫ টাকা) উপর ১০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। এক বৎসরের হিসাবে বৃত্তির পরিমাণ কিন্তু ৬০ টাকা মাত্র। অর্থনৈতিক হিসাবে এই বন্দোবস্ত লাভ না ক্ষতি? অর্থশাস্ত্রজ্ঞ এই ফর্মুলা প্রয়োগে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মে ব্যয়ের যৌক্তিকতা বিচার করিতে পারেন।

সেন মহাশয়ের কাছে এবং পরবর্তীকালে আরও কয়েক জনের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। সেন মহাশয় হইতে প্রথম পড়ার আনন্দ পাই। আনন্দ হইলে পড়ায় মনোসংযোগ হয়। কিছুকাল অভ্যাসে মনোসংযোগ তীব্র হয়। সেন মহাশয়ের আন্তরিকতা আমার দুর্বল শরীরের উপর (জন্মাবধি সবল ছিলাম না) পীড়াদায়ক হইলেও তিনি গাধা পিটাইয়া ঘোড়া বানাইয়াছিলেন। ভোঁতা বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মানসাঙ্ক শিখানো, ১৬, ৩২ এর নামতা এখনও আমার ভীতি উৎপাদন করে। পরবর্তীকালে অবশ্য ইহারই প্রসাদে good at budget figures বলিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম।

সেন মহাশয়ের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে শ্রীহট্ট শহরে যাইয়া পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিলাভ করি। শেষ দিনে মানসাঙ্ক পরীক্ষা। রাতে সেন-মহাশয় এত অঙ্ক করাইলেন যে আমার মাথায় গোলমাল হইয়া গেল। কেবলি ভুল উত্তর দিতে লাগিলাম। সেন মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। পরীক্ষার সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য স্নানের পূর্বে ল্যাভেণ্ডার তেল মাখিতাম। সেই দিন তিনি তদুপরি হুঁকার জল ঢালিয়া দিলেন। (হুঁকার জল মাথা ঠাণ্ডা করে।) সে কি বিশ্রী গন্ধ। আমি রাগিয়া বলিলাম "পরীক্ষা দিব না"। বিপদ দেখিয়া আত্মীয়স্বজন স্তুতিমিনতি শুরু করিলেন। অবশেষে পরীক্ষা দিলাম।

সরকারকাকা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে হয়। আমাদের গ্রামেই ইঁহাদের নিজ বাড়ী ও একশত বিঘা জমির ক্ষুদ্র তালুক ছিল। তিনি বাবার সমবয়সী বাল্যবন্ধু, একাধারে আমাদের গৃহের কেয়ার টেকার, জমিদারী মহাজনীর হিসাবরক্ষক ও ট্রেজারার। কোনও কিছুর দরকার হইলে বাবার কাছে যাইতে সাহস পাইতাম না। সরকারকাকাই আমাদের অভিভাবক। প্রথম সরকারকাকাই আমাদের শ্রীহট্টে দিয়া আসেন। ঠাকুরমা, মা এঁদের যতকিছু কাজকর্ম পরামর্শ সব সরকারকাকার সঙ্গে। তিনি সর্বঘটে। বাবার মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর আমাদের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। মালিকের কোনো ক্ষতি না করিয়া তিনি বেশ কিছু নগদ টাকা ও ভূমিসম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণমোহন সিলেটে চার বৎসর আমার গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। তিনি পরে শ্রীহট্ট মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ার হইয়া শ্রীহট্টে বাড়ী করেন।

পিতা, মাতৃগণ ও পরিজনবর্গ

যখন কলেজে পড়ি পিতা সময় সময় উপদেশ দিতেন। তাহার কয়েকটি নীতি খুব মূল্যবান। দরিদ্র ভদ্রলোক বা দরিদ্র আত্মীয় বাড়ীতে আসিলে তাহাদের সমাদর সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। চাকর-বাকর সাধারণতঃ ইহাদের যথেষ্ট সমাদর করে না। এই সম্বন্ধে দুর্গাদাদীর (দাদা) কথা উল্লেখ করিতে হয়। দাসীপুত্র, আমাদের পরিবারে পুত্রবৎ পালিত, পিতামহের কাছে শিক্ষিত। বাড়ীর কর্তার অনুপস্থিতিতেও সে অতিথির সমাদর করিতে জানিত। বহু গণ্যমান্য অতিথির মুখে তাহার সুখ্যাতি শুনিয়াছি।

বাবা বলিতেন আর্থিক অবস্থা আয়ের আধিক্যের অপেক্ষা মিতব্যয়িতার উপর বেশী নির্ভর করে। বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেন। বলিতেন আর্থিক ক্ষেত্রে অদৃষ্ট কিছুই নয়। চরিত্র এবং বুদ্ধির উপরই আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে। মাসিক ত্রিশ হাজার টাকা রোজগারী লর্ড সিংহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেন। হাতে টাকা থাকিলে এককালীন ব্যয় বা ক্যাপিটাল এক্সপেণ্ডিচার তত ভয়ের নহে, যতটা ভয়ের দৈনন্দিন খরচের এক আনা (ছয় নয়া পয়সা) অপব্যয়। দিন এক আনা বা এক টাকায় সারাজীবনে যে বৃহৎ অংক হয় তাহা উল্লেখ করিতেন। গরীব চাষীর, সম্পন্ন চাষীর, দরিদ্র ভদ্রলোকের পারিবারিক আয় ব্যয়ের হিসাব তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার হিসাবপত্রের শৃংখলা অসাধারণ ছিল। দলিলাদির তালুকওয়ারী মৌজাওয়ারী, বর্ণমালাওয়ারী পৃথক পৃথক সূচী ছিল। অনুসন্ধান করিতে দেরী হইত না। সাদাসিধা কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন অথচ ধোপার খরচ বেশী ছিল না। ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব প্রস্তুত না করিয়া ছোটবড় কোনো কাজে হাত দিতেন না। তীর্থে যাইবার পথে কলিকাতায় আসিলে গিরিশ ঘোষের গৌরাঙ্গলীলা প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখিতে ভালবাসিতেন। চারি শরিক জ্ঞাতিদের সহিত নানান বিরোধ থাকা সত্ত্বেও অন্তরঙ্গতা ছিল। গ্রামের স্বার্থসম্পর্কিত কাজে ও উৎসবে একযোগে কাজ করিতেন। বংশের মান রক্ষার্থ যত্নবান ছিলেন। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে পরস্পর পরামর্শ করিতেন। বাহিরের কোন ভূম্যধিকারী কর্তৃক কাহারও উপর আক্রমণ হইলে সকলে একজোট হইতেন।

বিরোধ সত্ত্বেও অন্তরঙ্গতার একটি দৃষ্টান্ত—একদিন এক জ্ঞাতি জ্যাঠামহাশয়ের সঙ্গে তাসখেলার পরে তিনি বাবাকে বলিলেন "ভাই, সদরে কাল তোমার সঙ্গে মোকদ্দমার তারিখ। আমার ২০০ টাকা চাই। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া পাঠাইয়া দিব। টাকা ঐ লোকসঙ্গে দিবে।" জ্ঞাতিদের বার্ষিক মাত্র ৬ টাকা সুদে

টাকা ধার দিতেন। শরিকীতে কাপড়ের দোকান, কাঠের কারবার এবং আত্মীয় কর্মচারী মারফৎ কমলার বাজার করিয়া কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। মুসলমান প্রজা ও তালুকদারদের সহিত হৃদ্যতা ছিল। পরগণার ৫ অংশে ৪ জন উল্লা নামধারী প্রতাপশালী তালুকদার ছিল। তাহাদের সাহায্যে স্বার্থ উদ্ধার করিতেন।

মাতাঠাকুরাণী, জ্যেঠিমা, খুড়িমা শ্রীহট্ট সম্মিলনীর নব প্রচলিত পরীক্ষা দিয়া হাতবাক্স ইত্যাদি পুরস্কার পাইতেন। এক জ্ঞাতি খুড়া পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। মা, ঠাকুরমা, জ্যেঠিমা বৃদ্ধ বয়সে শীতকালে সাদা ফ্লানেলের জামা ভিন্ন সেলাই করা জামা ব্যবহার করেন নাই। খুড়ীমা শ্রীহট্টে বাস করিতেন। তিনি শহরের ফ্যাসান অনুযায়ী জামা কাপড় পরিতেন, তবে সকলের অগ্রে নহে, সকলের পশ্চাতে থাকিতেন। মার একমাত্র কাজ ছিল রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী। শুকনা পুটুশ ছিল সাধারণ জ্বালানি। ইহার ধোঁয়ায় তাঁহার চোখ খারাপ হয়। ইংরেজী পড়ুয়া ছেলে,—অনুপযুক্ত গুরু, ব্রাহ্মণ, বৈরাগীর প্রতি তাঁহাদের ভক্তির সমালোচনা করিলে বলিতেন "বাবা, আমি খারাপ দিক দেখি না। গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান, ব্রাহ্মণকে ভূদেবতা, বৈরাগীকে ভগবদ্ভক্ত মনে করি। ইহাদের ভক্তি করায় আমার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।"

তাঁহারা শাস্ত্রের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কেহ ধর্মের অনাচার করিলে ধর্ম বা শাস্ত্র তো আর অশুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্ম খ্রীষ্টানও অনেক দুরাচারী আছে। তজ্জন্য সেই সকল ধর্ম দায়ী নহে। ধরুন জাত্যভিমান। কৌলিন্যের অভিমান তো শাস্ত্রসম্মত নহে 'কিংকুলেন বিশালেন—' চাণক্যবাক্য। 'বিপিনচন্দ্র পাল স্বীকার করিয়াছেন যে সমাজে ইংরেজ প্রভাব প্রবেশের পূর্বে জাত্যভিমান ও জাতিবৈর ছিল না। বর্তমান রাবীন্দ্রিক যুগে অনেক আছেন যাঁহারা পৌরাণিক হিন্দুধর্মের নাম শুনিলে উত্যক্ত হন। —বন্ধু, জ্ঞান গভীর জলে ; আরও ডুব দাও।

জ্ঞাতি জ্যাঠা রত্নগোবিন্দ চৌধুরী তেজীয়ান ছিলেন। ভাল 'জকি'—চোখে তেজ ফুটিয়া বাহির হইত। সূচ্যগ্র বুদ্ধি ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। ভিক্টোরিয়ার জুবিলীতে ঘড়ি পুরস্কার পান। বেত বাঁশের সূক্ষ্ম কাজ জানিতেন। পরম বৈষ্ণব ; কিশোরী ভজনীয়া দলের কীর্তনের পরিচালক ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কৃষ্ণগোবিন্দ অতি বুদ্ধিমান, দীর্ঘকায়, সুশ্রী ছিলেন। কিন্তু ষোলআনা বজায় রাখার জিদে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই। Uncompromising whole-hogging বিষয়ক্ষেত্রে অচল। বিপিনচন্দ্র পাল শ্রদ্ধা ও যশ অর্জন করিয়াছেন কিন্তু ঐ দোষে কৃতী পুরুষ হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতীপুরুষের উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত। তিনি স্বদেশীযুগের বয়কট আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। পরে বয়কট খুব জমিয়া উঠিলে জনমতের গতি বুঝিয়া গোলদীঘির সভায় 'Vox Populi Vox Dei' উচ্চারণ করিয়া বয়কটের প্রতি সমর্থন জানান। দর্শকদের সে কি আনন্দ!

বিশ্বনাথ সরকার আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন, নিঃসন্তান। বাড়ীতে বৃদ্ধা স্ত্রী ছিলেন। বিশ্বনাথ অতি দরিদ্র। ঠাকুরের ডাল বাছা ছাড়া আর কোনও কাজ করিতেন না। এক দিন বাবাকে বলিয়াছিলাম 'ইনি কোন কাজ করেন না।' উত্তর পাইলাম 'লোকটি অতি বিশ্বাসী। দুই হাজার টাকা তাহার কাছে রাখিলে তাহাকে খুন না করিয়া কেহ ঐ টাকা লইতে পারিবে না। এই গুণের কি মজুরী নাই?' Gandhian Economy : It is credit or character that really counts.

বাবার বড়মামা হরচন্দ্র দত্তরায় বাড়ী সরাইল (জিলা ত্রিপুরা বাংলাদেশ) প্রাচীন কালের সহজবুদ্ধি সরল লোকের দৃষ্টান্ত। সরাইলের মুসলমান জমিদার বাড়ীতে মুহুরী ছিলেন। একদিন জমিদারকে একটা হিসাব দেখাইতে ছিলেন। এই সময় জমিদারের পোষা ডাহুক চীৎকার করিয়া উঠে। তখনও তিনি কথা বলিতে থাকায় এমন ধমক খাইয়াছিলেন যে ভয়ে চটি ফেলিয়া গৃহাভিমুখে পলায়ন করিলেন। আর যান নাই।

তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, মৈমনসিংহের কায়স্থ সমাজের কুলজী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কুলজী নিয়া তাঁহার সহিত রঙ্গতামাসা করিতাম। পরোক্ষে বাবাও তাহাতে যোগ দিতেন। তিনি তাঁহার বংশের খ্যাতিমান পুরুষ দাতা গোপীনাথের ভ্রাতার বংশধর ছিলেন। তথাপি নিজেকে দাতা গোপীনাথের বংশধর বলিতেন। তাঁহার এই ভ্রান্তি কিছুতেই দূর করা যাইত না। বাবা আমাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইতেন যে বাবার মামার বংশ বড় না আমার মামার বংশ বড়। ইহাতে যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইত বাবা তাহা উপভোগ করিতেন। একই উপাধি ও গোত্রধারী দুই কায়স্থ পরিবারে সম্বন্ধ তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না—বলিতেন 'ইহারা গাবর'৯—অর্থাৎ অন্ত্যজ। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দমোহন যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সেই কথা উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধ চোখের জলে ভাসিতেন। "আমার ভাই বরিশালে চতুর্থ হেডমাস্টার, ছাত্রদের জন্য বহি লিখিয়াছে। এমন ভাই আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।" চতুর্থ হেডমাস্টার হইতে পারে না ইহা তাঁহাকে কিছুতেই বোঝান যাইত না। একটি গল্পে১০ পড়িয়াছিলাম এক অশিক্ষিত ব্যক্তি কৃতী ভাইএর বি.এ. পরীক্ষায় প্রাপ্ত মেডেল সকলকে দেখাইয়া গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিত। যাঁহারা যৌবনের মোহে প্রিন্সিপ্‌ল, বিবেক

ইত্যাদির দোহাই দিয়া কুলত্যাগ করেন তাঁহারা যে পারিবারিক প্রাণের সম্বন্ধকে কত আঘাত দেন বুঝিতে পারেন না। অথচ মুখে বুলি—'সবার উপরে মানুষ সত্য।' বয়স হইলে হয় তো অবিচার করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারেন। যৌবনে জ্ঞান ও কর্মশক্তি প্রবল হয়। বার্ধক্যে ভাবাধিক্যে আসে ভালবাসা ও ভক্তি। সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজে কুলত্যাগ মহাপাপ গণ্য হইবেই। যদি ইহারা কুলত্যাগ না করিয়া ধৈর্য ধরিয়া প্রচলিত সমাজকে শাস্ত্রের মর্ম, যাহা সমাজ ভুলিয়া গিয়াছে তাহা ধীর ভাবে বুঝাইতেন তবে সমাজ সংস্কৃত হইয়া প্রাচীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তখনকার ঐ বিদ্রোহ,—পৌরাণিক হিন্দুসমাজ একেশ্বরবাদ মানে না—এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে উদ্ভূত। ব্রাহ্ম রমেশ দত্তই প্রথম স্বীকার করেন যে টোলের পণ্ডিতগণ একেশ্বরবাদী। সমাজের ভিতরে থাকিলে বিধবা বিবাহ প্রচলন ও জাতি-অভিমান দূর করা সহজ হইত। বিদ্যাসাগর সমাজের ভিতরে থাকিয়াই বিধবা বিবাহের প্রচলন করিয়াছেন। মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কুলত্যাগের ইতিহাসের পিছনে কন্দর্পের কারসাজি দেখিতে পাওয়া যাইবে। আঠার বছরের যুবক মধুসূদন অধ্যাত্মতত্ত্ব কি বুঝিবে? সকলের সম্বন্ধে বলিতেছি না। আনন্দমোহন দত্তরায়ের সহিত পরে আমার দেখা হইয়াছে। তাহার ছোট ছেলের বিবাহের পর, শিবপুরের কুলীন বসু বংশের সহিত সম্বন্ধের বড়াই করিতেছিলেন। নাতি হওয়ার সুবাদে দাদামশাইকে খুব শুনাইয়াছিলাম। আরেকবার তিনি বরিশালের এক যুবককে ব্রাহ্ম করার উদ্দেশ্যে আমাদের মেসে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন বলিয়াছিলাম—"দাদামহাশয়! শেষটায় আড়কাঠিগিরি!!" দাদামহাশয়ের নিজের বিবাহে রোমান্স ছিল।

আমার যখন ৭।৮ বছর বয়েস তখন ঠাকুরমাকে কৃত্তিবাস পড়িয়া শুনাইতে হইত। লঙ্কাকাণ্ডই ভাল লাগিত বিশেষতঃ অঙ্গদের রায়বার। রামায়ণের কবি যে কত বড় মনস্তাত্ত্বিক তাহা এখন বুঝি। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়—রামায়ণ সকলেরই মনোরঞ্জন করে। দুঃখের বিষয় এ হেন গ্রন্থ আজকাল আর কেহ পড়ে না। স্কুলপাঠ্য গল্প হিসাবে অতি সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুধু জানে। এরই ফলে আজকাল ছেলেদের নৈতিক শিক্ষা হয় নাই। নীতিশিক্ষা আছে বলিয়াই রামায়ণ শাস্ত্রগ্রন্থ। বোধহয় দাদামহাশয় ঠাকুরমারাই শিশুদের রামায়ণে প্রথম আকর্ষণ জন্মাইতেন। এখন দাদামহাশয় ঠাকুরমারাই রামায়ণ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যা কিছু আলোচনা রামায়ণী সমাজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে এবং তাহা সমগ্র রামায়ণ ধীরভাবে পাঠ না করিয়াই করা হয়। আমার বিশ্বাস মনুশাস্ত্রের সমালোচনা যাঁহারা করেন তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জনই টীকাসহ সমগ্র মনুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। বাইবেল পড়ে নাই এমন ক্রিশ্চিয়ানের সংখ্যা নগণ্য। তদ্রূপ কোরান পড়ে নাই এরূপ শিক্ষিত

মুসলমান কমই আছেন। সাধারণ মুসলমান বালকবালিকা কোরাণ আবৃত্তি করিতে পারে যদিও আরবী জানে না। অধুনা একমাত্র হিন্দুই শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া হিন্দু নামের বড়াই করে। হিন্দুসভার নেতৃগণ ও সভ্য-দের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন বেদ তো দূরের কথা পঞ্চম বেদ মহাভারতের মূল বা মাতৃভাষায় মূলের অনুবাদ প্রায় কেহই পড়েন নাই। এমন বিড়ম্বনা ও লজ্জা মানুষের হয় না! এই অবস্থা অপেক্ষা জওহরলালের হিন্দু সমাজলোপ চেষ্টা অনেক ভাল। অন্ততঃ তাহাতে মেকী নাই, ভ্রান্তি থাকিতে পারে। ভ্রান্তি অভ্রান্তি আবার বিভিন্ন মতসাপেক্ষ।

গ্রামে চিকিৎসা

অসুখবিসুখে ছিলেন হাতুড়ে কবিরাজ কটু সরকার ও কম্পাউন্ডার ডাক্তার বসন্ত। ইঁহারা টাইফয়েড রোগও সারাইতেন। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব কেহ বোধ করি নাই। কালে ভদ্রে থানা হেড কোয়ার্টার হইতে সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জন আসিতেন। ভিজিট ২ টাকা ছিল। চিকিৎসার বিশেষ তারতম্য দেখি নাই। ছয় মাস বয়সে আমার কানের কাছে ফোড়া হয়। পিতা-মহ ব্রজনাথ থানা হইতে নূতন সাবএ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জন আনাইলেন। তিনি কাটিতে সাহস না পাওয়ায় বৃদ্ধ গৌর নাপিত ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করিয়া শাল বকশিশ পাইয়াছিল। বিলাতে নাকি Association of Barbers (নর-সুন্দর সমিতি)ই Association of surgeons (শল্যবিদ সমিতি)-এর পূর্ব-পুরুষ। পরে গ্রামে বাসকালে কম্পাউন্ডার ক্ষেত্র ডাক্তার দ্বারা দাতব্য ডিসপেন-সারী খুলাইয়াছিলাম। ডাক্তারকে বেতন দিতাম। তদুপরি ঔষধের খরিদমূল্য হইতে ১০% বেশী মূল্য নিতে পারিতেন। অসমর্থদের ঔষধব্যয় বহন করিতাম। চার পাঁচ বৎসর পর ডিসপেনসারী উঠিয়া যায়। এখন গ্রামে স্কুল-পাশ করা ডাক্তার আছে। প্রাইভেট প্র্যাকটিস পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিয়া মন্দ নয়। গরিবানা ভাবে ইহাদের চলিয়া যায়।

বাল্যসঙ্গী

শৈশবে গ্রামে খেলার সাথী জ্ঞাতিভ্রাতা দীনেশ চৌধুরী, বংশের দৌহিত্র অনঙ্গ গুপ্ত, রাজদাস, ভারত দাস প্রভৃতি প্রজা—ইহারা কেহই জীবিত নাই। দীনেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেজীয়ান, সর্দার গোছের ছিলেন। অনঙ্গ গুপ্তের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। আমি কোনও দলে ভিড়িতাম না, নিজে সর্দারীও করিতে পারিতাম না। ঢাকায় পড়ার কালে দীনেশের ডিসপেপ্সিয়া হয়। তাঁহার

সমস্ত তেজ, স্বাস্থ্য চলিয়া যায় এবং অতি শান্তশিষ্ট পিউরিটান স্বভাবের হইয়া পড়েন। তাঁহার বাবার মামার (মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামের সেন পরিবার) প্রভাবে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া বিধবাবিবাহের জন্য ব্যগ্র হন। কলিকাতায় পঠদ্দশায় বিধবাবিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়া পাত্রী না পাইয়া শেষে ব্রাহ্ম-কুমারী বিবাহ করিয়াছিলেন। মেসে বিধবাবিবাহ সমিতির সেক্রেটারী পরিচয়ে একটি লোক তাঁহার কাছে আসিত। আমরা ইহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতাম না। পরে প্রকাশ হয় যে লোকটি জুয়াচোর। অর্থ এবং স্ত্রীর গহনার লোভে দুই তিন স্থানে বিধবাবিবাহ করিয়া অর্থ ও গহনা লইয়া উধাও হইয়াছে : পুলিশের ফেরারী আসামী। দীনেশদাদা পরে বি.এ. পাশ করিয়া রাঁচী সেক্রেটারিয়েট শিক্ষাবিভাগে চাকুরী করিয়া ব্লাডপ্রেসারের দরুণ অকালে রিটায়ার করেন। কয়েকটি সন্তান আছে। তাহারা কলিকাতা অঞ্চলে বাস করে। অনঙ্গমোহন (বি.এ. ফেল) ওকালতী পাশ করেন। ইঁহার পিতা পূর্বোক্ত রায়মহাশয়এর মৃত্যুর পর গ্রামে মিরাশদারী রক্ষা করিতেন ; আমাদের প্রতিবেশী। প্রায় নিত্য সন্ধ্যার পর তাঁহার সহিত আড্ডা বসিত। ভাল মাছ আসিলে একসঙ্গে খাইতাম। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এত ধন লইয়া তুমি কি করিবে?" প্রফুল্ল বলিয়াছিলেন "ভোগ করিব"। ভবানী পাঠক বলিলেন "তোমার তো কেহ নাই বলিয়াছ। তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য ভোগ হয়?...লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্য সঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার যো নাই ; তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পার অথবা নরকের পথ সাফ করিতে পার।"

হঠাৎ সামান্য জ্বরে হার্টফেল হইয়া অনঙ্গ গুপ্ত পঞ্চাশের পূর্বেই মারা যান। শরীরচর্চা না থাকায় বেশী মোটা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রেরা কেহ কেহ কলিকাতায় কেহ বা গ্রামে আছেন। প্রসঙ্গাধীন সময় ছাড়িয়া বেশী অগ্রসর হইয়া গিয়াছি। আবার দশ বৎসর বয়সে ফিরিয়া যাইতেছি।

সহরে স্কুলজীবন

বৃত্তি পরীক্ষার দুই মাস পর সহরে যাইয়া গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে ক্লাশ থ্রীতে ভর্তি হইলাম। পিতামহের সহরের পাকা বাড়ী তখন খালি। কয়েকটি আত্মীয় ও জ্ঞাতি ছাত্র বাস করেন। চাকর রান্না করে। কৃষ্ণমোহন দে (ক্লাশ সেভেনের ছাত্র) হইলেন অভিভাবক ও গৃহশিক্ষক। খাওয়া—সাড়ে দশটায় ভাত, মুসুরি ডাল, আলুভাজা—কোন দিন আখালিয়া গ্রামের ফিরিওয়ালা গোয়ালাদের নিকট ক্রীত একগুলি মাখন ও এক ঠালি (নারিকেল মালা) ঘন

মাঠা (ঘোল) যাহা দধি হইতে অনেক সুস্বাদু। চারটায় স্কুল ফেরৎ দুপুরের ভাত, ডাল, ভাজা ; তৎপর গৃহাঙ্গনে বড় মাঠে খেলা। রাত্রের আহার মাছের তরকারী, অম্বল ও ভাত। দুধের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু তাতে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা অদ্যকার ফুড ক্যালোরীজ ইত্যাদি আলোচকদের অনু-ধাবনযোগ্য। ষাট বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ধারণা হইয়াছে স্বাস্থ্য ও দেহ-রক্ষার উপকরণ, প্রথম মুক্তবায়ু, দ্বিতীয় সূর্যালোক, তৃতীয় শরীর পরিচালনা, চতুর্থ পরিচ্ছন্নতা, পঞ্চম শীত, উত্তাপ ও আহার সম্বন্ধে মিতাচার। শরীর এই উপায়েই সুস্থ সবল থাকে। লাল চাল ও কচুশাকে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ আছে। সর্বোপরি Spiritual Force। পণ্ডিত বুনো রামনাথ তিন্তিড়ীপত্র ও চালেই সন্তুষ্ট ছিলেন—কারণ Moral Elevation সংক্ষেপে—সদাহাস্য, সন্তোষ, মনের স্ফূর্তি। খুড়ীমা সিলেট আসার পরই চর্বচোষ্যলেহ্য—নানা প্রকার খাবার বিলাসিতা আসিতে লাগিল।

অভিভাবক গৃহশিক্ষক হইলেও পড়াইতেন না কারণ দরকার ছিল না। স্কুলেই পড়া শিখিয়া আসিতাম। কিন্তু বাহিরের খারাপ ছেলেদের সঙ্গে না মিশি তাহা দৃষ্টি রাখিতেন মাত্র। চার বৎসর পর খুল্লতাত সুখময় চৌধুরী মহাশয় সপরিবার সহরে আসেন। তিনি পড়ার কথা কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। খেলায় এক ছেলেকে মারিয়া জখম করায় তাঁহার হাতে কানমলা খাইয়া-ছিলাম। অন্য শাস্তি পাই নাই। এন্ট্রেন্সের১১ টেস্ট পরীক্ষায় সংস্কৃতে ফেল হই। পণ্ডিত মহাশয় ও হেডমাস্টার কাকাকে জানান। কাকা কেবল বলিলেন "শিক্ষকেরা বলিয়াছেন সংস্কৃতে ফেল হইয়াছ। পাশ করিতে হইবে খেয়াল রাখিও।" স্কুলে ভাল ছাত্রই ছিলাম। ক্লাশে দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করিতাম।

তবে ক্লাশ ফোবএ আর এন. ধরের জিওগ্রাফী বেশ শক্ত ঠেকিত। "An archipelego is a sea interspersed with many islands"—Interspersed শব্দটির অর্থবোধ ও উচ্চারণ দুইই কঠিন। তদুপরি দ্বীপ তো মাটি, sea কি করিয়া হইল? ধর মহাশয় বোধহয় জীবিত নাই। স্কুলপাঠ্য বই লেখকগণ ছাত্রদের বয়সোচিত বুদ্ধির পরিমাপ সম্বন্ধে সাবধান হইবেন। বর্তমানে বহু পাঠ্যপুস্তক এই দোষে দুষ্ট। ভূগোলে, ম্যাপ আঁকা সহ প্রায়ই পুরা নম্বর পাইতাম। আমরা যখন ফার্ষ্ট ক্লাশে (ক্লাশ টেনএ) তখন স্যার হেনরী কটন (আসামের চীফ কমিশনার) আসিয়া ভূগোলের বিদ্যা পরীক্ষা করেন। প্রশ্ন ছিল—কলিকাতা হইতে বোম্বে, লাহোর, দিল্লী প্রভৃতির দূরত্ব কত? ম্যাপ টাঙানো ছিল। আমরা কয়েক জন পটাপট্ উত্তর দিতে লাগিলাম। তখন ম্যাপ গুটাইয়া আরও দূরত্বের প্রশ্ন করিলেন। উত্তর ঠিক হইল। সাহেব খুশী হইলেন। আমাদের অঙ্ক, ইতিহাস তখন পড়াইতেন দ্বিতীয় শিক্ষক

বিধুভূষণ মজুমদার। বাড়ী ঢাকা। তাঁহার নিকট ইউক্লিডের স্বাদ পাইলাম। ক্যাসির কঠিনতর জিওমেট্রির প্রবলেম কষিতাম। ইংরাজীর স্বাদ পাই তৃতীয় শিক্ষক এখনকার রায়বাহাদুর আবদার রহিমের নিকট। ক্লাশ এইটে ভারতের ইতিহাসের স্বাদ পাই। দেশপ্রেমের অংকুর জন্মে বৃন্দাবন ধরের (ঢাকা) পঞ্চাশ পৃষ্ঠার History of India দ্বারা। প্রাঞ্জল ভাষা, সহজ ইংরাজি। বন্ধুবর সতীশচন্দ্র দাস (রিটায়ার্ড হেডমাস্টার, গভর্ণমেন্ট স্কুল) এর সঙ্গে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ম্যাট্সিনি গ্যারীবল্ডির জীবনী ও টডের 'রাজস্থান' গৃহে পাঠ করিতাম। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' পুরস্কার বিতরণী সভায় আবৃত্তি হইত। হেডমাস্টার দুর্গাকুমার বসু পাশকোর্সে বি.এ. পাশ করিয়া হেডমাস্টার হন। তাঁহার বাড়ী ব্রজযোগিনী (ঢাকা)। পরিণত বয়সে ১৯০৪ ইংরাজীতে রিটায়ার করেন। প্রথমে যখন শিক্ষক হন তখন বোর্ডের স্কুল। পিতামহ ব্রজনাথ বোর্ডের একজন সদস্য ছিলেন। পরে সরকারী স্কুল হয়। দুর্গাকুমার রাশভারী ছিলেন। আসাম সার্ভিসে দুর্গাকুমারের খুব সুনাম হয় কঠোর নীতি ও সুশাসনের জন্য। শিক্ষকদের সামান্য ত্রুটির জন্য ধমকাইতেন। ছাত্রদের পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। অতি বৃদ্ধ বয়সেও পূর্বতন ছাত্রদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। সরকারী চাকুরে, রাজভক্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে স্বদেশী যুগে উন্মত্ত যুবকদের হাতে অপমানিত হন। বহুকাল শিক্ষকতা করায় ক্রমান্বয়ে বাপ ছেলে নাতিকেও পড়াইয়াছেন। নামজাদা অভয় দাস তাঁহার ছাত্র। বিপিন পাল তাঁহার ছাত্র-শিক্ষণ প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হইত, এখনও মনে হয়, তিনি বাঁধাগতে ইংরাজী পড়াইতেন। নোটবই অনুযায়ী মুখস্থ বলিতে না পারিলে রাগ করিতেন। স্বাধীন চেষ্টা বা চিন্তার প্রশ্রয় দিতেন না। আমার সহিত এই নিয়া একদিন বচসা হয়। খুব বেয়াড়া ছিলাম। যাঁহার চোখের দিকে শহরের কেহই চাহিতে পারে না তাঁহার সহিত তর্ক! কলেজে অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেবের সহিত একদিন তর্ক করিবার সাহস সঞ্চয় করিয়াছিলাম। তাহা পরে বলিব। কিন্তু এখনকার ছাত্রদের মতো শিক্ষককে বেতনধারী চাকর মনে করিতাম না। যাঁহাদের ভাল লাগিত, গুরু বলিয়া মান্য করিতাম। এখনও মনে হইলে গুরুজ্ঞানে প্রণাম করি। অবশ্য নিষ্কর্মা শিক্ষকদের ভক্তি করিতাম না। তখনকার দিনে ফোর্থ ক্লাশে (অর্থাৎ সেভেনে) বাংলা সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধ শেষ হইত। তারপর হইতে সংস্কৃত, ফার্সী, গ্রীক কি ল্যাটিন নিতে হইত। কেবল মেয়েরা বাংলা নিতে পারিত। Sex equality তখনও হয় নাই। এখনও পুরা হয় নাই।

বিখ্যাত অংকশাস্ত্রী ডাঃ বুথ (ডি. পি. আই) স্কুল পরিদর্শনে আসিয়া ফার্স্ট ক্লাশে (টেন) আমাদের একটি বৃহৎ অ্যালজেব্রা গুণ অংক কষিতে দেন। তাহা বোর্ড হইতে নকল করিলাম পুরা এক তা পরিমিত ফুলস্কেপ

কাগজে। সাহেব আধঘন্টা চুপ করিয়া বসিয়া পরে বলিয়া গেলেন পরদিন বাড়ী হইতে কষিয়া আনিতে। আমার দুষ্ট বুদ্ধিতে মনে হইল নিশ্চয়ই সহজ সমাধানের কোনও ফর্মুলা আছে—নতুবা সাহেবের পরীক্ষা করিতেই তো এক ঘন্টা লাগিবে। তা ছাড়া দেখিলাম অঙ্ক শিক্ষক বিধুবাবু আমার নিকট হইতে এক টুকরা কাগজ লইয়া কি লিখিয়া সাহেবকে দেখাইলে সাহেব হাসিলেন। বুঝিলাম Higher Mathametics এর খুব সহজ অঙ্ক। বাড়ী আসিয়া কয়েকখানি অ্যালজেব্রা পুস্তক ঘাঁটিয়া একটি ফর্মুলা বাহির করিয়া গুণের কাজ প্রায় তিন চতুর্থাংশ সংক্ষেপ করিলাম। পরদিন স্কুলে গিয়া দেখি কেবল নগেন গাঙ্গুলীর সহিত আমার উত্তর মিলিয়াছে। আর কাহারও দুইজনের উত্তরের মিল নাই। বিধুবাবুকে দেখাইলাম বলিলেন আমার ও নগেনের শুদ্ধ হইয়াছে। আমারটা সাহেবকে আগে দিতে বলিলেন। আমারটা সাহেবকে দিতেই এক মিনিট দেখিলেন কোথায় ফর্মুলা বসাইয়াছি। তারপর কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন "I didnot want this". আমার খুব রাগ হইল। কোথায় প্রশংসা পাইব, না তিরস্কার! বলিয়া ফেলিলাম "Sir that would be an asses labour (গাধার খাটুনী হইত)। সাহেব স্নেহের সুরে বলিলেন "No, no, my boy. I want to teach you honest labour"—সেই সুর এখনও কানে বাজিতেছে। নগেনের উত্তর দেখিয়া সাহেবের আনন্দের সীমা নাই। সাহেবের পিঠ চাপড়ানোর চোটে বেচারার প্রাণ যায়। স্বাধীন ভারত কি স্বাধীন পাকিস্তানে এইরূপ শিক্ষক জন্মিবে কি?

অবশ্য শিক্ষকদের নামে ছড়াও ছিল। যথা—

হেডমাস্টারের পেট মোটা/তার নীচে গোবিন্দ বুড়া/তার নীচে আনন্দ লহরী...ইত্যাদি।

হেডমাস্টার দুর্গাকুমারবাবুর ডায়াবিটিস ছিল। তিনি পেটে ধুতি জড়াইয়া তার উপর পার্সী কোর্ট পরিতেন। গোবিন্দ বুড়া অর্থাৎ গোবিন্দ দাস মার্টিনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার গিরীশ দাসের পিতা। তিনি সাবেক সিনিয়র পাশ ছিলেন। পড়াইবার সময় sure শব্দটি 'শুয়োর' উচ্চারণ করায় হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাহাতে ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার বাবাকে, কাকাকে পড়াইয়াছি, আর ছোকরা হাসে।" জানিতাম না যে শুয়োর উচ্চারণও শুদ্ধ। ইনি শহুরে সাহা সম্প্রদায়ের লোক। "বাবুমহাশয়" বলিতাম। সদানন্দ বৃদ্ধ খুশী হইতেন। ইনি চৌকিদারের ঘরে তামাক খাইতেন। হেডমাস্টার স্কুলে তামাক খাওয়া পছন্দ করিতেন না। বয়সে গোবিন্দবাবু তাঁহার অনেক বড়; কিছু বলিতেও পারেন না।

আনন্দলহরীর নাম আনন্দহরি বসাক। বাড়ী ঢাকা। কিছুকাল তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। চতুর্থ শিক্ষক আনন্দ দাস রাগতঃ স্বরে কথা বলিতেন—চোখে

চোখে চাহিতেন না। নামকরণ হইয়াছিল "মাছুয়া" (জেলে)। অন্তরে ছাত্র-দরদী ছিলেন। আনন্দ ভট্টাচার্য পণ্ডিত, বাড়ী ঢাকা। ক্লাশ সেভেনে তাঁহার কাছে সংস্কৃত আরম্ভ করি। প্রথম দিন তিনি নোট লিখাইয়া দিলেন—কেন সংস্কৃত পড়িব? প্রথমতঃ সংস্কৃত দেবভাষা, দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষা, তৃতীয়তঃ জার্মান পণ্ডিতগণ সংস্কৃত পড়েন ইত্যাদি। এক বৎসর শব্দরূপ লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ইংরাজী ব্যাকরণই ভাল লাগে না সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাল লাগিবে কেন? ব্যাকরণ এম.এ.-তে ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে পাঠ্য। নিম্নশ্রেণীতে ব্যাকরণ ভাল লাগে না। না বুঝিয়া শুধু মুখস্থ করার শক্তিও নাই, ভালও লাগে না। প্রপার নাউন ও তাহাদের বানান কোন কালেই মনে রাখিতে পারি না, যদিও এম. এ.-তে আমার ইতিহাস ছিল। কোথাও পড়িয়াছি প্রফেসর হাক্সলির নাকি ঐ দোষ ছিল।

পণ্ডিত ক্লাশে একদিন পড়াইতেছেন 'পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদৈব দৈবং ইতি কথ্যতে।" আমার দুষ্ট বুদ্ধি জাগিল। প্রশ্ন করিলাম "প্রথম জন্মে কি হইল দৈবের?" ঘন্টা ব্যাপিয়া নানা রকম বুঝাইলেন; বুঝিলাম না। বলিলেন—"পাঁচটার সময় আমার বাসায় যাবে।" সেখানে গেলে সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া শঙ্করভাষ্য খুলিলেন। ঘন্টাখানেক দুর্বোধ্য আলোচনার পর শুনিলাম "সৃষ্টি অনন্ত", অথৈ জলে ঠাঁই পাইলাম। বলিলাম "পণ্ডিত মহাশয়, সোজা বলিলেই হয় 'জানি না'।" কিন্তু জ্ঞান বিতরণের জন্য কি আকুল আগ্রহ! ইঁহাদের কথা স্মরণ হইলে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়। ক্লাশ এইটে দ্বিতীয় পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ কাব্যতীর্থের কাছে পড়ি। ইহার বাড়ী শ্রীহট্ট, খিত্তা। কাশীতে ভট্টিকাব্য শেষ করিয়া ব্যাকরণ আরম্ভ করেন। অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন। পরে উভয় পণ্ডিতের সহিত দুই একবার দেখা হইয়াছে। এখন বোধ হয় কেহ জীবিত নাই! কলেজে এফ. এ. ক্লাশে, অন্বয় দেখাইয়া পড়া শেষ করিতাম। মনে আছে সন্ধি বিশ্লেষণে অসমর্থ হইয়া হ্যারিসন রোডের তেতলা হইতে রাগে পুস্তক রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। কোন রকম ব্যাকরণের উত্তর না দিয়াই পাশ করিয়াছিলাম। টেস্ট পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় পণ্ডিত হরিশ কাব্যরত্ন বলিয়াছিলেন "বাপু হে, তোমাকে ভালো ছাত্র বলিয়াই জানি। সংস্কৃতে ফাইনালে অন্ততঃ পাশ মার্ক পাইতে হইবে।" সন্ধির ঘ্যাঁট কিছুতেই বিশ্লেষণ করিতে পারি না। সমাস বুঝিবার স্বাভাবিক শক্তি আছে। অন্বয় পাইলে সংস্কৃত পুস্তক ভালই বুঝি। আমার সংস্কৃতের ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আদর্শ ছিল। বিজ্ঞাপন স্থলে বিজ্ঞপ্তি লিখিতাম। সংস্কৃত ভাষার গৌরব ও ভারতের ইতিহাস পাঠে প্রথম দেশাত্মবোধ জাগে। আমাদের সময় রাজা গিরীশচন্দ্র সেকেণ্ড গ্রেড মুরারিচাঁদ কলেজ খুলেন। বহু ব্যয়ে দশ বৎসর

পালন করিয়া ইষ্ট বেঙ্গল এণ্ড আসাম গভর্ণমেন্টের হাতে দেন। রাজা নিজে এন্ট্রান্সও পাশ করেন নাই। সরকারী উকিল দুলালবাবু তাঁহার শুভানুধ্যায়ী, পরামর্শদাতা ছিলেন। আমরা সরকারী স্কুলের ছাত্ররা ছড়া কাটিতাম—মুরারী চাঁদ কলেজ/without knowledge/students are monkies/Teachers are donkies.

তখনকার দিনে পড়ায় ভাল ছেলেরা খেলাধুলা করিত না। আমি খেলার শিক্ষক বিধুবাবুর প্রিয় ছিলাম। মারবেল, ডাণ্ডাগুলি, কপাটি (কিৎকিৎ) ও ক্রিকেট ফুটবল খেলিতাম। কপাটি ও ডাণ্ডাগুলিতে শৌর্যের স্ফূরণ হয়। বড়দিনের ছুটিতে গভর্ণমেন্ট স্কুলের ছাত্রদের সহিত জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও চা-বাগানের সাহেবদের ক্রিকেট ম্যাচ হইত। কোনো রকমে এই ক্রিকেট দলে স্থান পাইতাম। পৌষ সংক্রান্তির ভোরে সুরমা নদীতে সাঁতার দিতাম। একবার নদী পার হইতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে শীতে হাত পা অবশ হইতে আরম্ভ করায় অর্ধেক পথ হইতে প্রাণ নিয়া ফিরিয়া আসি। ইদগা অঞ্চলে টিলায়১২ বেড়ানো ও সুরমা নদীর চাঁদনীঘাটের সিঁড়ি দৌড়াইয়া উঠা ছিল আমাদের নিত্যকর্ম। সতীর্থ কে. বি. মাহমুদ মামুদ, মেম্বার রেভিনিউ বোর্ড ইষ্টবেঙ্গল, এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। শ্রীহট্টে আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে দুই একবার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ইহাতে আমার শরীর খারাপ হওয়ায় মনের অবসাদ আসে। এই সঙ্গে সৃষ্টি রহস্যের চিন্তাও মনে জাগে। তখন গুরুসদয় দত্ত (পরে আই. সি. এস.) ফার্ষ্ট ক্লাশে, আমি সেকেণ্ড ক্লাশে। গুরুসদয়বাবু একটি ডিবেটিং ক্লাব করিয়াছিলেন। তথায় মাদ্রাজের একখানা স্টুডেন্ট ম্যাগাজিন আসিত। তাহার বাহিরের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ছিল "Strength and how to obtain it"—Eugene Sandow. দাম সাড়ে তিন টাকা। স্যাণ্ডোর কথা তখন জানিতাম না। কি ব্যাপার বুঝিলাম না। পত্র দিলাম এবং ডাকে পুস্তক পাইলাম। দেখি ছবি সম্বলিত ব্যায়ামের বই। কিন্তু ডাম্বেল পাই কোথা? একজন সতীর্থ বলিলেন তাঁহার অভিভাবকের আলমারীর নীচে ঐ রূপ একটা দ্রব্য আছে। আনাইয়া দেখিলাম ৫ পাউণ্ডের ডাম্বেলই বটে। ইহা দিয়াই ব্যায়াম আরম্ভ করিলাম। হোয়াইটওয়ে লেডলো কোম্পানীর ছাপানো ক্যাটালগে ডাম্বেলের ছবি দেখিয়া আড়াই পাউণ্ড ডাম্বেল আনাই। গোড়ায় ৫ পাউণ্ড ডাম্বেল ব্যবহার খারাপ। তদবধি ডাম্বেল, ডেভেলপার, ফ্রিহ্যাণ্ড, বুক-ডন, ভার তোলা বা দৌড় কোনো না কোনো ব্যায়াম নিত্য করিয়াছি ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত। শরীর সবল হয় নাই। কিন্তু রোগা হইলেও স্বাস্থ্য চলনসই ছিল—অন্ততঃ ডায়াবিটিস, ব্লাডপ্রেসার, হৃদ্‌রোগ হয় নাই। এখন ডাক্তার ব্যায়াম নিষেধ করেন।

স্কুলে ও গৃহে পঠিত পুস্তক

তখন পাঠ্য পুস্তকের পরিমাণ ছিল কম, পড়া হইত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। এখন বহি বেশী, তাড়াতাড়ি পড়া হয়। জ্ঞান হয় ভাসাভাসা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই অনুযোগ করায় উত্তর পাইয়াছিলাম "এখন পৃথিবী-প্রচলিত শিক্ষারীতি ব্যাপক (extensive) বিদ্যা"। আমি পড়িবার সময় শব্দ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি কখনও করি নাই। ক্র্যামিং (অর্থাৎ না বুঝিয়া মুখস্থ করা) দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলাম। Key book কখনও ব্যবহার করি নাই। দরকার মত সমগ্র পাঠ পরের দিন বা পরে পুনরায় পাঠ করিতাম। এমন কি ডিক্সনারীও ব্যবহার করিতাম না। বার বার পাঠ করিয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অর্থবোধ হইত। পরবর্তী কালে হাতের কাছে ডিক্সনারী থাকে। রুট (root) দেখিয়া অর্থের তারতম্য ও বিভিন্ন প্রয়োগের ইতিহাস সংগ্রহ করা আনন্দ-দায়ক। বন্ধু হেডমাস্টার সতীশবাবু বলেন ইহাই direct method.

স্কুল-কলেজে বাহিরের বহি বেশী পড়ি নাই। যাহা পড়িতে হয় খুব মনোনিবেশে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা করিয়া পড়া আমার রীতি। মার্জিনে ঐ সমালোচনা টুকিয়া রাখি এমন কি পরের বহিতেও অনেক সময় ঐ রূপ লিখি। বেশী বহি পড়া ভাল নয়। তাহাতে পল্লবগ্রাহী করে। ব্ল্যাকি বলেন "Good books are few not more than a dozen. They are to be read and re-read at intervals through-out life."

বালকদের রামায়ণ ও প্রবীণদের মহাভারত অবশ্য-পাঠ্যগ্রন্থ। যাঁহারা সভ্যতা ও সমাজতত্ত্বের তুলনামূলক জ্ঞান চান তাঁহারা তদুপরি বাইবেল, কোরান ও ডাস ক্যাপিটাল পড়িলেই যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন।

স্কুলে পাঠকালে ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ, অশ্বিনীবাবুর ভক্তি-যোগ, বাইবেলের গল্প, পিপ অভ ডে, গালিভার'স ট্রাভেলস, রবিনসন ক্রুশো, গ্রীম্‌স ফেয়ারী টেল্‌স, রমেশ দত্তের Rambles in India, রজনী গুপ্তের আর্যকীর্তি, ম্যাটসিনি গ্যারিবলডির জীবনী, টডের রাজস্থানের ইতিহাস ছাড়া আর বিশেষ কিছু পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সব পাঠই বন্ধুবর সতীশ দাসের সঙ্গে। Rambles in India দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে, ভারতের প্রাচীন কীর্তির ছবি সমন্বিত বহি। "Now to the land of the five rivers. . ." প্রাণে আলোড়ন উপস্থিত করিত। কয়েক বৎসর পর জগদীশ বসুর লাহোর বক্তৃতায় "Methinks I began to feel as my forefathers that there is but one force pervading the universe" পড়িয়াও অনুরূপ গৌরব অনুভব করি। টডের রাজস্থানে প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে "Behold, the solitary warrior weary with cares" ইত্যাদি পড়িয়া চক্ষে জল আসিত। পরবর্তী

কালে কার্থেজ নগরী ধ্বংসের ইতিহাস পাঠে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতাম না। স্কুলপাঠ্য রয়েল রীডার সিরিজগুলির পাঠ ও কবিতা, চরিত্র গঠনে সহায়ক হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতা এখনও কণ্ঠস্থ আছে। ক্যাসাব্লাঙ্কা, লস অব দি বার্কেনহেড, লুসী গ্রে, নেভ্স অভ এ হাউস, বোআডিসিয়া প্রভৃতি কতকগুলি পদ্যাংশ যথা পলায়মান রাজা আলফ্রেডএর স্বগতোক্তি মনে আছে "I whom heaven appointed their shepherd—unable to rescue them from the Danish Wolves"। এখন কেহ কবিতা মুখস্থ করে না। বর্তমানে আমাদের দেশে ভাবাবেগ (দেশপ্রেম) ও চরিত্রের দৃঢ়তার অভাবের ইহাই কারণ। গান্ধীজী ১৯২০ ইংরাজীতে অনুযোগ করেন—আমাদের শিক্ষা কেবল ইনটেলেক্ট-এর, হৃদয় বা হার্টের নহে। কলেজে Pro-Patria Mori কবিতাটির "How sweet it is to die for one's country!" হৃদয়গ্রাহী মনে হইত। এইটি সুভাষবাবুর প্রিয় ছিল।

স্কুলে সতীর্থগণ

কমলাচরণ দে এন্ট্রান্সে আসামে দ্বিতীয় হন। পরে হবিগঞ্জের উকীল হন। রমণী ভট্টাচার্য বি.এ. পাশ করিয়া স্কুল মাস্টার হন। পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। দেরাদুনে আছেন শুনিয়াছিলাম। নগেন গাঙ্গুলী বি.এ. পাশ করিয়া তেজপুরে উকীল হন। এখন জীবিত নাই। গণেশচন্দ্র দাস মণিপুরে ডাক্তার হন। আমার বৈবাহিক। আনন্দ বিশ্বাস খুব ডানপিটে ও ধুরন্ধর ছিল। এন্ট্রান্স ফেল করিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে গুড্সে কাজ করিয়া উন্নতি করে। এখন জীবিত নাই। খান বাহাদুর মাহমুদ মামুদ এর কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুর্গাচরণ দাসের শ্রীহট্ট শহরে বাড়ী। এইরূপ মেধাবী ছেলে দেখি নাই। কিন্তু পড়িত না, আড্ডা দিত। এন্ট্রান্সে আসামে প্রথম হয় কিন্তু পাশ কোর্সে বি.এ. পাশ করে। অঙ্ক, ইংরাজী সবই ভাল জানিত। বাল্যকাল হইতে তামাক খাইত। বার্কের 'ফ্রেঞ্চ রিভোলিউসন' কণ্ঠস্থ ছিল। এ বিষয়ে আমিও তাহার অনুসরণ করিতাম। দুর্গাচরণ রাজা গিরীশের স্কুলে মাস্টারী করিত। স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। গগন সেন আমার আত্মীয় ছিল। সে এক ক্লাশ উপরে পড়িত। একসঙ্গে বি.এ. পাশ করিয়া অশ্বিনী ও গিরিজা দত্তর একসঙ্গে পুলিশের সাব-ইন্‌সপেক্টার হয়। গিরিজা দেউলিতে ক্যাম্প কমাণ্ডার হইয়া বদনাম অর্জন করেন। গগন ডি.এস.পি-র উপরে উঠিতে পারে নাই। তাঁহার বিবাহিত জীবন বিষাদময়। স্ত্রী ঘর করিত না, কাশীতে থাকিত। ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছিল। তথাপি গগন পুনর্বিবাহ করে নাই। পেনসন

পাইয়া স্বগ্রামে বাস করিত। দাতব্য হাসপাতাল করিয়াছিল। ঠাণ্ডা মাথায় সব আয়োজন করিয়া রাত্রে পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করে। শাস্ত্রে বোধহয় বানপ্রস্থীর বেলা এইরূপ আত্মহত্যার বিধান আছে।

ভূমিকম্প

১৮৯৭ ইংরাজীর (১৩০৪ বাংলার) মহরমের দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকাল আন্দাজ ৫টার সময় ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ঘটনাক্রমে সেইদিন দ্বিপ্রহরে আমি লিসবন ভূমিকম্পের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম যাহাতে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে ভূমিকম্প একেবারে অপরিচিত ছিল না কিন্তু গৃহাদি এবং জল সামান্য নড়া ভিন্ন অন্যরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। ভূমিকম্পে ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হইবে এই আশঙ্কা প্রথমে কেহ করেন নাই। কিন্তু প্রবল কম্পনে যখন দাঁড়াইয়া থাকা এমন কি সুস্থিরে বসিয়া থাকা পর্যন্ত অসম্ভব হইল এবং তৎপরে পাকা বাড়ী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল তখন একটা ত্রাসের সঞ্চার হইল। আমার আশঙ্কা হইল লিসবনের ভূমিকম্পের মতই একটা কিছু হইবে এবং আমি মরণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বিশেষভাবে ভূমিকম্পের দ্বারা মস্তক ঘূর্ণনে দেখিতেছিলাম আমার উভয় পার্শ্বস্থ বাড়ীর বেড়া যেন আট-দশ হাত ঊর্ধ্বে উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইহার দুই একদিন পূর্বে আমার এবং সুধীর ও সুপ্রভার (খুল্লতাত ভ্রাতা ও ভগিনী) জ্বর ত্যাগ হয়। তজ্জন্য সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা আহারে ছিলাম। ঐ সময়ই ভূমিকম্প হয়। চাকর, দাদী, সুধীর ও সুপ্রভা সহ আমি রান্নাঘরের পিছনে খোলাস্থানে আশ্রয় লই। খুড়িমা অপর দিকে বাহির হইয়া খুড়ামহাশয় যিনি তখন দালানের দোতলায় ছিলেন তাঁহাকে সাবধান করিতে অগ্রসর হন। খুড়িমাকে নীচে দেখিয়া খুড়ামহাশয় দালানের দোতলার জানালা হইতে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতে থাকেন। দালানের ইটপাটকেল ছুটিতে আরম্ভ হইলে খুড়িমার পায়ে একটি পাটকেল পড়ায় তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। খুড়িমাকে সাবধান করিয়াই খুড়ামহাশয় নীচে নামিবার প্রয়াস পান। সিঁড়িতে পা দিবেন সেই মুহূর্তেই সমস্ত সিঁড়িটি দালান হইতে পৃথক হইয়া অপর দিকে ভূমিসাৎ হয়। সিঁড়িটি পশ্চাৎ নির্মিত হওয়ায় ভাল বাঁধ ছিল না। নিরুপায় হইয়া খুড়ামহাশয় দোতলায়—যাহা একটি মাত্র বৃহৎ প্রকোষ্ঠ ছিল তাহাতে দণ্ডায়মান হন। তখন তাঁহার মাথার উপর দিয়া চতুর্দিকে কাঠের বীম বরগা ছুটিতে থাকে, ছাত ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। তিনি ধৈর্য ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। ভাগ্যক্রমে বীম বরগা

ছাতের টুকরা দেয়াল ভাঙিয়া অধিকাংশ বাইরের দিকে পড়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি মস্তকে এবং পায়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। তাঁহার পায়ের উপর স্তূপাকার হইয়া ইঁট ও সুরকীর গুঁড়া জমিয়াছিল। সুরকীর গুঁড়ায় প্রায় পাঁচ মিনিটকাল চতুর্দিক লাল হইয়া যায়। আট-দশ হাত দূরস্থ লোক দেখা যায় নাই। বাতাসে সুরকীর ধূলা পরিষ্কার হইলে ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান ও চাকরদের পক্ষে দালানের দক্ষিণ দিকে ইঁটপাটকেলের স্তূপের সাহায্যে একতলার ছাতে ওঠা সম্ভবপর হইয়াছিল। দোতলা হইতে খুড়া-মহাশয়কে ধরিয়া নামান হয়। সেই মুহূর্তে ডাক্তার বৈকুণ্ঠ দত্তকে বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি উঠানের তুলসীগাছ হইতে কতকগুলি তুলসী-মঞ্জরী ছিঁড়িয়া মস্তকের আহত স্থানে দিয়া তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেন। ঐ আঘাত পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও দেড় ইঞ্চি গভীর ছিল। খানিকক্ষণ পর ডাক্তার বৈকুণ্ঠ নন্দী আসেন।

ঐ দিবস রাত্রে আমরা রান্না ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিলাম। ঘন ঘন ভূমি-কম্প হইতেছিল। অনেকেই সমস্ত রাত্রি বার বার দৌড়াইয়া বাহির হইয়াছে। রাত্রে নিদ্রা যায় নাই। খুড়ামহাশয় মাস খানেক শয্যাশায়ী ছিলেন এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে তিন মাস লাগিয়াছিল। কয়েক মাস পর্যন্ত (টিনের নূতন বাংলো না হওয়া পর্যন্ত) তিনি আস্তাবলে শুইতেন। আমরা রান্নাঘরে এবং বাহিরের একটি খড়ের ঘরে থাকিতাম। শহরের রাস্তা ফাটিয়া যাওয়ায় ঘোড়ার গাড়ী চলাচল কয়েকদিন বন্ধ ছিল। ভূমিকম্পের দিন রাত্রি দুইটার সময় বাড়ী হইতে মথুরামোহন চক্রবর্তী সংবাদ দিতে আসেন। তাঁহার নিকট অবগত হইলাম যে রঘুদাসের স্ত্রী পুকুরপাড়ে দেয়াল চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ তাঁহার খোঁজই পাওয়া যায় নাই। আরেকটি দাসী কেবল বলিতে পারে দুইজনে একসঙ্গে জল আনিতে পুকুরে গিয়াছিল। ভূমিকম্প আরম্ভ হইলে সে ছুটিয়া বাড়ীতে আসে। রাত্রে অনেকক্ষণ খোঁজার পর দেয়ালের ফাঁকে কাপড়ের খুঁট দৃষ্টে দেয়াল সরাইয়া দেখা যায় স্ত্রীলোকটি একেবারে পিষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রপিতামহী (ব্রজনাথবাবুর মাতা) তখন অতি বৃদ্ধা। কোমরধরায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ভূমিকম্প হওয়া মাত্র পিতাঠাকুর তাঁহাকে কোলপাঁজা করিয়া বাহির করেন। পাইলগাঁয়ের দুখানা বাড়ীর মধ্যে বাহিরের খানা ভূমিসাৎ হয়। ভূমিকম্পের সময় কেহ ছিলেন না। কাজেই আর কোন জীবনহানি হয় নাই।

স্কুলজীবনে শহরের সমাজ

তখনও ভূস্বামী অভিজাতদের ছিল প্রাধান্য। রাজা গিরীশচন্দ্র, মজুমদার সাহেব, দস্তিদার বংশ, আবদুল কাদের, মহেন্দ্র দাস, উকীল দুলালবাবু, সারদাবাবু ও খুল্লতাত সুখময়বাবু ইঁহারাই সমাজের মাথা ছিলেন। রাজা গিরীশচন্দ্র দেওয়ান মাণিকচাঁদের বংশধর। দস্তিদার বংশের পূর্বপুরুষ হরেকৃষ্ণ দস্তিদার মুসলমান আমলে আমীন (ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর) ছিলেন। মজুমদাররা বনেদী—পূর্বে হিন্দু ছিলেন। শ্রীহট্টের কয়েকটি মুসলমান পরিবার একশত বৎসর পূর্বেও হিন্দু ছিলেন। হিন্দুমুসলমানে তখনও সামাজিকতা ছিল, যদিও উভয়পক্ষই পরস্পরের সংস্কার যথাযথভাবে মানিয়া চলিতেন। উভয়পক্ষেরই হিন্দুমুসলমান প্রজা আছে। সকল প্রজারই তুষ্টি সাধন করিতে হয়। আড়াআড়ি, বিদ্বেষ, পরস্পর হিংসামি সরকারী আমলা-মহলে হইত। চল্লিশ বৎসর পূর্বে (১৯১৪-১৫) পশ্চিম হইতে আগত মৌলবীরা গ্রামাঞ্চলে ইসলামের অভ্যুদয় প্রচার এবং শিথিল হইয়া যাওয়া শরীয়তী রীতিনীতির পুনস্থাপনা করিতে গিয়া কথঞ্চিৎ ধূমায়িত বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। সেই সময়ে আমার একটি হাটে শুক্রবার (জুম্মাবার) মৌলবীরা বাজার বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইলে আমার সহিত বিবাদ বাঁধে। আমি নমাজঘর ও স্থান দিতে স্বীকৃত ছিলাম কিন্তু হাট বন্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলাম। তাহারা ইহা মানিয়া লয় নাই। বৃহস্পতিবার এক বাজার হইতে বাঁশ আনিয়া পরদিন আমার হাটে বিক্রয় হইত। আমি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলায় দাঙ্গা হয় নাই। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ডসন (তখন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত) চারি পৃষ্ঠাব্যাপী এক পত্রে ইসলামীয় ধর্মোন্মাদনা সম্বন্ধে সাবধান হইতে উপদেশ দেন। তৎপর সামান্য অছিলায় এক মুসলমান প্রজা, সমাজে মিথ্যা অভিযোগ করে যে আমার ভ্রাতা (রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী) তাহাকে ঠাকুর-ঘরের সামনে জোর করিয়া প্রণাম করাইয়াছেন। এই বিষয় নিয়া সে জিলার বড় বড় মুসলমান জমিদারদের কাছে গিয়াও সহানুভূতি পায় নাই। পরবর্তী কালে যখন আসাম কাউন্সিলে কৃষির উন্নতি ও বন্যা নিবারণের প্রয়াস পাই এবং ১৯২৯ এর বন্যায় সাহায্য সমিতি খুলিয়া ত্রাণের কাজ করি তখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জিলার সকলের প্রিয়পাত্র হই।

শ্রীহট্টে ব্রাহ্ম সমাজ

শ্রীহট্ট শহরে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল। বিপিন পাল তখন ব্রাহ্ম সমাজ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু রাজচন্দ্র চৌধুরী আছেন। রাজচন্দ্রবাবু সরল ও অমায়িক ছিলেন। অতি বৃদ্ধ অবস্থায়ও গলার জোর ছিল এবং খুব জোরে

হাঁটিতে পারিতেন। দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা নগণ্য। ছাত্ররা ব্রাহ্ম সমাজে বড় যাইত না। তখন হিন্দুর পুনরভ্যুত্থানের উল্টাস্রোত। শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রচারে বাহির হইয়াছেন।

মণিপুরী রাজবাড়ীর চৈত্রসংক্রান্তি ও রবিবাসরীয় মেলায় খুব লোক ও জাঁকজমক হইত। বৈষ্ণব আখড়াগুলির রাস, দোল ও ঝুলন উৎসবও জাঁকালো ছিল। গান-বাজনা শুনিতে বহু মুসলমান আসিত। ছাত্ররা আনন্দ পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে বালকাশ্রম করিয়াছিল। আমি উৎসবে আখড়াগুলিতে এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে মণিপুরী রাজবাটী ভিন্ন কোথাও যাই নাই।

বঙ্গবাসী পত্রিকা

আমরা কলিকাতা যাইবার পূর্বে খবরের কাগজ পড়ি নাই। বাল্যাবস্থায় 'বঙ্গবাসী' কাগজে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কথা খুড়ামহাশয়কে পড়িতে শুনিয়াছি। এই পাঠে আমরা বালকেরাও অভিভূত হইয়াছিলাম। গ্রামে সংবাদপত্রের প্রতিশব্দ 'বঙ্কবাসী' (বঙ্গবাসীর অশুদ্ধ উচ্চারণ)। গ্রামে উহাই একমাত্র কাগজ ছিল। শ্রীহট্টে থাকাকালীন মণিপুর যুদ্ধ ও টিকেন্দ্র-জিতের বিচারপ্রহসন জানিয়াছি। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত ইহাদের ছবি আমাদের উত্তেজিত করিত। পরে রাজপরিবারের নারী ও শিশুরা অতি হীন অবস্থায় শ্রীহট্টের মণিপুরী রাজবাটীতে বাস করিয়া অকালে প্রাণ ত্যাগ করে। ইহাদের ভাতা ছিল মাত্র তিন টাকা।

হিন্দু সভ্যতা ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সবল দেশাত্মবোধ ও হিন্দু সভ্যতার পুনরুদ্ধারে বঙ্গবাসী প্রেসের দান সর্বাধিক। ইহার সবল দেশাত্ম-বোধ ছিল ষাঁড়ের মত ; ইহা সারমেয়ের ভিক্ষা নহে। তজ্জন্য 'বঙ্গবাসী' কংগ্রেসকে বলিত 'কঙ্গরস'। পাশ্চাত্য পোষাকের হিন্দুধর্মী ব্রাহ্মাদিগকে বর্ধ-মানের উকীল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' এই ছদ্মনামে ব্যঙ্গ করিতেন। ইন্দ্রনাথ আবার পুরা সাহেব উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। উমেশ বোনার্জির সন্তানগণের বিলাতে জন্ম, ব্রিটিশ প্রজা। পুত্রকন্যাদের ইংরাজ সমাজে বিবাহ দিয়াছেন—যাহা ভারত স্বাধীন হওয়ার পর খুব চলিতেছে। জাতিগত হীনমন্যতা এখন আর নাই।

---

১. ইংরাজী শিক্ষিতগণ এখন 'আচার' শব্দটিকে প্রায় কুসংস্কারের সমার্থক ভাবেন। কিন্তু 'আচরণ' থেকেই 'আচার' শব্দ এসেছে—এবং আচরণেই যে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলে সেই বিষয়ে এবং 'আচারের' গুরুত্ব ও উপাযোগিতার প্রতি লেখক এখানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। ২. রসময় চৌধুরী। ৩ গ্রামের জোলার তৈরী মশারি। ৪. ব্রজনাথ চৌধুরী। ৫. প্রপিতামহ ৬. বিজয়-নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ৭. ঠাকুরমার ঝুলি পুস্তকে সংগৃহীত সুপ্রাচীন উপ-কথাসমূহ।

কলেজে কলিকাতায় (১৯০০—১৯০৭ ইং)

প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসামে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া ১৫ টাকা বৃত্তি পাইয়া ১৯০০ ইংরাজীর জুন মাসে কলিকাতায় আসি। বয়স প্রায় ১৮। বাড়ীর নিকট ইনাতগঞ্জ স্টেশন হইতে কাছাড় সুন্দরবন ডেসপাচ স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ, তথা হইতে ভিন্ন জাহাজে গোয়ালন্দ, তথা হইতে রেলে ঢাকা মেলে তিন রাত্রি দুই দিনে কলিকাতা পহুঁছি।

ডেসপাচ স্টিমারের সময় খুব নির্দিষ্ট ছিল না। ভোরে নৌকাযোগে বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার পর দেখিতে পাওয়া গেল স্টীমার আসিতেছে। জুন মাস, পুরা বর্ষা নামে নাই। ঘুরিয়া যাইতে হয়। তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়িয়া জলকাদায়ই হাঁটিয়া চলিলাম। ইতোমধ্যে স্টীমার স্টেশন ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিতেছে, আমরা তখন খেয়া নৌকায় নদীর অপর পারে। ভাগ্যক্রমে স্টীমার ছাড়িবার সময় পেছন দিক পাড়ে আটকাইয়া যায়। এই সুযোগে তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে লাফাইয়া জাহাজে উঠি। সঙ্গী অনঙ্গবাবু, দীনেশ-বাবু ও আর. জি. কর. মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র দ্বারিকাবাবু, সম্পর্কে আমার কাকা। তিনি আমাদের অভিভাবক। অপর সকলেই নূতন কলিকাতাযাত্রী। স্টীমার-পথে চিড়া, কলা, মিষ্টি ও ফল খাইয়াছি। একবার বিখ্যাত ব্যবসায়ী অবিনাশ সেনের পাল্লায় পড়িয়া স্টীমারে মুরগীকারি ও ভাত প্রথম খাই বি. এ. ক্লাশে পড়ার সময়।

খাদ্যবিচার

জীবনে খাদ্যের ব্যাপারে বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কখনো আনা-মরিচের[১] ঝোলভাত, কখনো ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের সঙ্গে সব রকম তরকারী একত্রে সিদ্ধ, কখনো নিত্য লুচি, পায়েস, পোলাও, কখনো দুবেলা মাংস। কিন্তু গোমাংস বা পোষা শূকর মাংস কখনো খাই নাই। তবে সিলেটে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়া বাসায় কয়েকবার বন্য শূকর খাইয়াছি। ইহা লইয়া শহরে আলোচনাও হইয়াছে। পরীক্ষার ফলাফলে High living ও simple living এর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ বুঝি নাই। তবে মশলা যেন কম হয় এবং ভাজা দ্রব্যও যেন বেশী না হয়। কয়েকমাস ভাত ছাড়িয়া ক্রমাগত চিড়ার পোলাও চিড়ার খিচুড়ী খাইয়াছি। কখনও বা শুধু সবজি সিদ্ধ। যাতায়াতের পথে ভিন্ন কখনো শহরের হোটেল রেস্টুরেন্টে খাই নাই। এগুলি দৃশ্যতঃ পরিচ্ছন্ন

হইলেও পাকশালে নোংরামি হইতে বাধ্য—বিশেষতঃ অহিন্দু রাঁধুনীর হাতে—কারণ ইহাদের পরিষ্কারের জ্ঞান অন্যপ্রকার। বাঙালী হিন্দু ভিন্ন অপর জাতি জলের ব্যবহার কম করে। আত্মীয়ার তত্ত্বাবধান ভিন্ন রান্না পরিচ্ছন্ন হইতে পারে না।

নারায়ণগঞ্জে সদ্যবিবাহিত ভগ্নীপতি সূর্য সেন সঙ্গী হন। দুই চার দিন ওল্ড বৈঠকখানা বাজারে পুরাতন সিলেট-মেসে থাকিয়া ৪২ নং হ্যারিসন রোডের বিশাল মেসে স্থানলাভ করি। রান্না ছিল দুইটি—একটি ঢাকাইয়াদের একটি সিলেটীয়াদের। সিলেটীয়াদের অভিভাবক আনন্দ দাস মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র ছাত্র। তাঁহাকে মান্য করিতাম। কলেজের বেতন বাদে ২০ টাকায় সব ব্যয় কুলাইত। সিট রেন্ট তিন টাকা ; খাওয়া চাকর ইত্যাদি ১২ টাকা বাকী পাঁচ টাকায় জলখাবার ইত্যাদি চলিত। ঘোড়ার ট্রামে কখনো চড়িতাম না। বৈদ্যুতিক ট্রাম হওয়ার পরও বেশী ট্রাম চড়ি নাই। হাঁটিয়াই গড়ের মাঠ এমন কি ভবানীপুর পর্যন্ত পাল্লা দিতাম। তেতলার কোণের ঘরটিতে সূর্যবাবু দীনেশবাবু ও আমি থাকিতাম। চারদিকে খোলা ধু ধু হাওয়া। কলিকাতার ঘিঞ্জির আঁচ তখনো পাই নাই। দুই বৎসর পর যখন পুরাতন সিটি কলেজের পিছনে ঠাণ্ডা সরু গলিতে একটি বাড়ীতে যাই তখন কলিকাতায় আলো হাওয়া যে কত মূল্যবান তাহা বুঝিতে পারি। পর বৎসর ওল্ড বৈঠকখানাতে একটি মেসে (৬ নং নূরমহম্মদ সরকার লেন) খোলা বাড়ীতে আত্মীয় বৃদ্ধ গগনচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে বাস করি। এইটি ছিল আত্মীয়দের মেস। প্রথমে দুই পয়সার১২ কচুরি জিলাপী ছিল টিফিন—পরে গ্রেট ইষ্টার্নের রুটি মাখন দুই পয়সা। কখনো বা মাখন গলাইয়া ঘি করিয়া স্টোভে হালুয়া পাক করিতাম। একটি ছেলে মেসেই মুরগীর ডিম খাইত এবং অভিভাবক গগনবাবুকে চটাইবার জন্য তাঁহাকে দেখাইয়া নীচের উঠানে খোলা ফেলিত। এই ছেলে পরে সিভিল সার্জন হইয়াছিল। সাহেবীয়ানার বাতিক তখন এতটা ছিল না। যৌবনের সাহেবদেরও বার্ধক্যে পরিবর্তন হয়। তখন উহারা উল্টা দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, গুরুমন্ত্র নিয়া বেশী সাত্ত্বিক হইয়া পড়ে।

স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় দেশাত্মবোধ স্ফুরণ হয়। এই সঙ্গে ইংরাজী ভাষা ও পলিটিক্‌স্‌ ভিন্ন ইংরাজের অন্য সব কিছুর উপর বিদ্বেষ সঞ্জাত হয়। সুভাষবাবুর এই দোষ বা গুণ (ইংরাজ বিদ্বেষ) বহুল পরিমাণে ছিল। আমাদের নেতৃগণ—তিলক, মদনমোহন মালবীয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া সকলেই যৌবনে ভূস্বর্গ (?) বিলাত প্রবাসে ও প্রভাবে মোহ-গ্রস্ত। পরবর্তী জীবনে ইঁহাদের বাহ্যরূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইলেও অন্তরটি 'হোম' (!!!) এর মোহ হইতে মুক্তি পায় নাই। আশ্চর্যের বিষয়

এইসব দেশবরেণ্য, বিশ্ববরেণ্য প্রতিভাবান নেতা বিলাতী সভ্যতার কোনো দোষ, যৌবনে লক্ষ্য করেন নাই। বাংলার গৃহস্থ ঘরের মহিলা পশ্চিমযাত্রী দুর্গাবতী ঘোষ বেশ কয় বৎসর পূর্বে২ ভারতবর্ষ পত্রিকায় স্বামীসহ বিলাত প্রবাসকালীন কিছু বিবরণে কিঞ্চিৎ কদাচারের কথা লিখিয়াছিলেন—তন্মধ্যে একটি হইল থুতু দিয়া শিশুদের মুখ পরিষ্কার করা। পূর্বোক্ত নেতাদের অনেকেই মদ্যপায়ী হন। কেহ কেহ বলনাচও শিখিয়াছেন। স্বাধীন ভারত কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লীকে হোম বানাইয়াছে—বলনাচ, শুঁড়িখানা (বার) কলগার্ল—সবই বেশ চলে। এই সব স্থান একাধারে হোম ও হলিউড—বিলাত, আমেরিকা। সেকেলে প্রবীণ রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল গলদঘর্ম হইতেছেন। আমি পাশ্চাত্য সভ্যতাদ্বেষী হইলেও ঠিক ইংরাজ বিদ্বেষী নহি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে যেসব ইংরাজের সহিত বচসা হইয়াছে তাহাদের সহিতই আবার অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছে বেশী ; স্বদেশী সহকর্মীদের সহিত তত হয় নাই।

কলিকাতায় খেলাধূলা ব্যয় সাপেক্ষ, মাঠ দূরে। খেলা ছাড়িয়া দিয়া বিকালে খুব হাঁটিতাম। শিয়ালদহ হইতে হাওড়ার পুল, শ্যামবাজার হইতে ভবানীপুরের সীমানা পর্যন্ত। মাঠে ফুটবল খেলায় দর্শকের ভিড় হইত। বেড়া ছিল না। টিকেট ছাড়াই খেলা দেখা যাইত। ভিড়ও কম ছিল। আমার ফুটবল খেলা দেখার বাতিক ছিল না। ইডেন গার্ডেনে ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে বিদেশী বড় খেলোয়াড় আসিলে ক্রিকেট খেলা দেখিতে যাইতাম। রঞ্জি, আরচি ম্যাকলারেন, লর্ড হক্, কে, জে, কী৩ প্রভৃতির খেলা দেখিয়াছি। লর্ড কার্জন একবার প্রহরীহীন অবস্থায় লাটপ্রাসাদ হইতে হাঁটিয়া মাঠে ভিড় ঠেলিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঞ্জির খেলা দেখেন। চলিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে "শেম, শেম" ধ্বনি দিয়াছিলাম। তিনি বঙ্গভঙ্গ, সরকারী মন্ত্রগুপ্তি আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ইত্যাদির দরুণ জনগণের খুব বিরাগভাজন ছিলেন। মোহনবাগান যখন ১৯১১-তে কেল্লার গোরাদের হারাইয়া আই. এফ. এ. শিল্ড পায় তখনই,—আমরা ইংরেজের সহিত পাল্লা দিতে পারি—এই আত্মপ্রত্যয় জন্মিল। এই আত্মপ্রত্যয়ের অঙ্কুর হইতেই কালে স্বাধীনতা লাভ। এই বিজয়ে বাঙালীর প্রচণ্ড উল্লাসের অভূতপূর্ব স্ফূর্তি দেখিয়া ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখিয়াছিল—"হাবেভাবে মনে হয় বাঙালী ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা ফতে করিয়াছে।"

চীনাপাড়ায় ২।১ খানা রিক্শা ছিল, অন্যত্র ছিল না। বিজলীর ট্রাম হইয়াছে বোধহয় ১৯০২-তে। পূর্বযুগের পুরুষ বিদ্যাসাগর না কি বলিতেন "ঘোড়ার ট্রামের ভাড়া দুই পয়সা না দিয়া তিন মাইল পথ হাঁটিবে—এক পয়সার মুড়ি খাইবে। পয়সা বাঁচিবে স্বাস্থ্যও ভাল হইবে।" এখন পয়সা বড় কেহ বলে না—টাকা বলে—দেশটা ধনী হইয়াছে কি না! ঘোড়ার গাড়ী করিয়া

মেয়েরা রেল স্টেশনে, কালীঘাটে যাইত। শ্যামবাজার কালীঘাট যাওয়া আসার ভাড়া তিন চার টাকা, রেল স্টেশন আট আনা (এখনকার ৫০ পয়সা) বা ১ টাকা। পাড়ায় মেয়েরা পাল্কী চড়িত। উড়ে বেহারা ছিল।

১৯০২ ইংরাজীতে রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে কলিকাতার পাড়াগুলি হইতে কীর্তন দল বাহির হইয়া মাঠে জমায়েৎ হয়। নগ্নপদে শুভ্র উষ্ণীষ ও কাপড়ে কলিকাতা শহর মাঠে ভাঙিয়া পড়ে। তখন বাঙালীর রাজভক্তি ছিল আন্তরিক। বঙ্গভঙ্গ এই ভক্তিকে ধূলিসাৎ করে। টাউন হলের সভায় সুরেন্দ্রনাথ রাজভক্তির দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। কার্জন ছিলেন সভাপতি। লেডী কার্জন চক্ষুর পলক না ফেলিয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। লর্ড কিন্তু বড় হিংসুক ছিলেন। এক দৃষ্টে হলের অপর প্রান্তে ভিক্টোরিয়ার মূর্তির দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল তিনি বড় বাগ্মী। সুরেনবাবু লাটকে হলে ঢুকিবার পথ করিয়া দেন। ছাপা অনুষ্ঠান সূচী অনুসারে সুরেন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় বক্তা হিসাবে বলিতে আহ্বান না করায় হলে দশ মিনিট গোলমাল হয়। পরে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতে উঠিলে দশ মিনিটব্যাপী করতালি ধ্বনি হয়।

পরবর্তীকালে মনাইর চরে স্ত্রীলোকের উপর পুলিশী অত্যাচারের কথা লর্ড লিটন অস্বীকার করিলে ঐ টাউন হলেরই প্রতিবাদ সভায় সরোজিনী নাইডু বলিয়াছিলেন—"Liar, take back thy lies."

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য না দেওয়ায় তেজস্বী পুরুষসিংহ আশুতোষ, লর্ড লিটনকে যে পত্র লিখেন তাহাতে "আমি আমার শিক্ষকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে অথবা উপবাস করিতে বলিব তবু তোমার কাছে সাহায্য চাহিব না"— এই জাতীয় উক্তি জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগ্রত করিতে সহায়ক হইয়াছিল।

আশুতোষ শিলং গভর্ণমেন্ট হাউসে লাটপ্রাসাদে রৌদ্রে তেল মাখিতেন, স্যার এইচ বাটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে তেল মাখিয়াছেন ইত্যাদি গল্পে গৌরব বোধ করিতাম। তাঁহার সন্দেশপ্রীতি, ভক্তদের মধ্যে তাহা বিতরণের গল্পে কৌতুক বোধ করিতাম। আশুতোষের বিধবা মেয়ের বিবাহে বহু গোঁড়া হিন্দুও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টিয়া মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশ্যেই বিরোধিতা করেন।

ছাত্রমেসগুলি যৌথ পরিবার। এক জিলার লোক, জানাশোনা, এমন কি অনেকে আত্মীয় ছিলেন। প্রত্যেক মাসে এক এক জনকে কর্তা হইতে হইত। অসুখে সেবাশুশ্রূষা প্রায় বাড়ীর মতই হইত। ঘরকন্নার বৈষয়িক শিক্ষাও হইত। কোনও কোনও মেসের ছাত্রদের দুর্নীতির কিছু বদনাম ছিল। এ বিষয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে (প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক রাসেল

সেক্রেটারী) তদন্ত কমিটি হয়। ঐ কমিটির রিপোর্টের পর মেসগুলিকে লাইসেন্স করা হয়। কমিটি রিপোর্ট বাহির হইলে স্বদেশী আন্দোলনের Palais Royal গোলদীঘির সান্ধ্য সভায় ব্যারিষ্টার এ. সি. ব্যানার্জি একদিন বলেন "বিলাতের ছাত্ররা এরূপ অপমানজনক রিপোর্টের দরুন রাসেলকে জুতাপেটা করিত।" পরদিন কলেজে উল্লাসকর দত্ত সত্যই রাসেলকে জুতা মারিয়াছিল। তাহার একজন সতীর্থ আমার সাক্ষী। এই কারণে ছোটলাট এক বৎসরের জন্য কলেজ বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রাসেলই বলেন—"ইহা সাময়িক উত্তেজনা। ছাত্ররা ভবিষ্যতে দুর্ব্যবহার করিবে আশঙ্কা করি না।" রাসেল আমাদের দর্শনশাস্ত্র পড়াইতেন। অল্প বয়স, সদা হাস্যময়, শাল-প্রাংশু মহাভুজ। ১৯১৪ ইংরাজীর মহাযুদ্ধে বোধহয় ইনি প্রাণ দেন।

মেসের দুই চারিজন ছাত্র প্রত্যেক শনিবার থিয়েটারে যাইত। অধিকাংশ দুই এক মাসে একদিন কি দুই দিন। থিয়েটার দেখার নেশায় অনেকের চরিত্র নষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু এখনকার সিনেমার মত সকলের নৈতিক কাঠামো দুর্বল করিত না। আমি কখনও থিয়েটার দেখি নাই। চার পাঁচ দিন সিনেমা দেখিয়াছি। পিউরিটান নহি। তখন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত প্রভৃতির বইএর নাট্যরূপ, সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, গৌরাঙ্গলীলা ইত্যাদি ও অমৃত-লাল বসুর ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত প্রহসন অভিনীত হইত। গিরিশ ঘোষ ছিলেন সেকালের প্রধান নাট্যকার। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ডি. এল. রায়ের মেবার পতন, সাজাহান, রাণা প্রতাপ সিংহ ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক জনপ্রিয় হয়। পূর্বে অশ্রুমতী ইত্যাদি রাজপুত শৌর্য-বীর্যের কাহিনী নিয়া নাটক ছিল। বিলাতে শেক্সপীয়ারের নাটকের মত এখানে ঐতিহাসিক নাটকও দেশপ্রেম জাগাইতে সহায়ক হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রভক্তদের পরস্পর বিরোধী দল ছিল।

কলিকাতায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস হয়। বেঙ্গলী, অমৃত-বাজার মেসে আসিত। প্রথমে কাগজ দখল করিতে হইলে প্রত্যূষে উঠিতে হইত। ইংলিশম্যান কাগজ হোম্‌রাচোম্‌রা খয়ের খাঁ ও রাজপুরুষ ভিন্ন কেহ পড়িত না। উহা ছিল আই. সি. এস. পেপার। পায়োনিয়র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ। মেসে ছাত্ররা তাঁহার বক্তৃতা মুখস্থ বলিত ও অনুকরণ করিত। ইহার কিছুকাল পূর্বে কলেজ-পড়ুয়া যেমন কেশবসেন-ভক্ত ছিল তখন তদ্রূপ সুরেন্দ্রভক্ত। বর্ধমানের কুমার ও সন্তোষের কুমার মন্মথ তাঁহার নিকট পলিটিক্‌সের শিক্ষানবীশ ছিলেন। বর্ধমানের কুমার (বিজয়চাঁদ মহতাব) বাহাদুর রাজা হইয়া এক দরবার করেন। তাহাতে বলিয়াছিলেন "My relations with British Raj continues to be friendly" কুমার বাহাদুর লেবার এম. পি. কিয়েভ হাওলিকে

বলিয়াছিলেন 'কুলি সর্দার' ; লোকে হাসিত। নরেন সেনের ইণ্ডিয়ান মিরার তখনও শক্তিশালী কাগজ।

শ্রীহট্টের ছাত্রদের ছিল সিলেট ইউনিয়ন (শ্রীহট্ট সম্মিলনী) এখনও আছে। সুন্দরীবাবু, বিপিন পাল নেতা। আমি ইউনিয়নের সভায় কমই গিয়াছি। আমার হুজুগে মাতা স্বভাব ছিল না। সভায় খুব কমই যাইতাম। বাড়ীতে বসিয়া কাগজে সভার বক্তৃতা পড়া আমি ভাল মনে করি এখনও। ধীরে সুস্থে বক্তৃতা বোঝা যায়। অবশ্য বক্তার স্বর, ভাবভঙ্গীর প্রভাব ঠাণ্ডা কাগজে পাওয়া কঠিন তবে চোখ থাকিলে ঠাণ্ডা হরফের মধ্যেই উত্তাপ দৃষ্ট হইবে।

ওয়াই. এম. সি. এ.-র ওভারটুন হলে নীতি বক্তৃতায় মাঝে মাঝে যাইতাম। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কে, সি, ব্যানার্জি, প্রোফেসর টমোরি প্রভৃতি বক্তৃতা দিতেন। কে, সি, ব্যানার্জির প্রত্যেক বাক্যে নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ, স্যার গুরুদাসের প্রত্যেক শব্দ ওজন করিয়া বলা আর প্রোফেসর টমোরির দাঁড়ি কমা বিহীন বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ছিল। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ সিলেট ইউনিয়ন, কুমিল্লা হিতৈষিণী প্রভৃতির বাৎসরিক সভা হইত। এই সব স্থানে বিপিন পাল, ভগ্নী নিবেদিতা, মেট্রোপলিটানের প্রিন্সিপাল নগেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা দিতেন। ব্রাহ্মসমাজে একবার মাঘোৎসবের প্রত্যূষে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা সুন্দরীবাবুর ও অমলা দাসের গান শুনিয়াছিলাম। শিবনাথের বক্তৃতায় দর্শকগণ কাঁদিতেন। আর একবার গোখলের কি একটা বক্তৃতা শুনিতে ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছি। প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বসুর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট (বর্তমান বিধান সরণী) এর কলেজ আঙিনায় একবার মিসেস এ্যানি বেশান্তের বক্তৃতা শুনিয়াছি। তিন দিন ব্যাপিয়া প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা পর্যন্ত অনর্গল বক্তৃতা দিতেন। বিষয় নৈতিক সত্য, ন্যায়বিচার ইত্যাদি। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইত। থিওজফিস্ট এ্যানি বেশান্তের কলিকাতায় প্রধান শিষ্য ছিলেন এটর্নী হীরেন দত্ত।

জাপান তখন রাশিয়ার কাছ হইতে পোর্ট আর্থার কাড়িয়া নিয়াছে। জাপানের বিজয়ীবীর এডমিরাল টোগোর নামে ছেলেদের নামকরণ হইত। তখনকার আশা ছিল জাপানই এশিয়ার পুনরুদ্ধার করিবে। ওকাকুরার Ideal of the East আমাদের বেদ। শ্রীহট্টের রমাকান্ত রায় এই সময় জাপান হইতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়া স্বদেশীতে জীবন উৎসর্গ করিয়া কাপড়ের মোট পিঠে করিয়া ফিরি করিতেন।

বঙ্গবাসী পত্রিকার তখন ভাঁটা পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলীর বাংলা সংস্করণ 'হিতবাদী' কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদনায় তখন উঠিয়াছে স্বদেশীর কল্যাণে। হিতবাদীও ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিল তবে বঙ্গবাসীর মত অত

গোঁড়া নয়। হেরম্ব মৈত্রের স্ত্রীর মানহানি করিয়া কাব্যবিশারদ জেল খাটেন। ইহার পূর্বে বঙ্গবাসী সম্পাদক রাজদ্রোহের জন্য জেলে যান। এই দুইজন সম্পাদক হইতে সর্বসাধারণ জেলের ভিতরের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পায়।

কাব্যবিশারদ জাপানের পথে জাহাজে মারা যান। এখন বঙ্কিমযুগের প্রভাবে ভাঁটা পড়িয়াছে ; ব্রাহ্মভাবাপন্ন গান্ধী, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রভাবে ব্রাহ্মভাব আবার বিস্তারলাভ করিয়াছে। রাজার ধর্ম প্রজা নির্বিচারে গ্রহণ করে। এই জন্যই কেশব সেন কুচবিহারের রাজপরিবারে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালও পরোক্ষে নূতন সভ্যতা ও ধর্মের প্রচারক!৪

তখন হাইকোর্টের জজ চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র উকীল যোগেন্দ্র ঘোষ এক সমিতি গঠন করিয়া বিদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতেন। এরূপ একটি বৃত্তি নিয়া আমাদের পরগণার উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী জার্মানীতে গিয়া ভূতত্ত্ববিদ হইয়া আসেন। তিনি হাইকোর্টের জজ আশুতোষ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে খুব ধুমধাম হয়। জজ হইবার পর আশুতোষ চৌধুরীর আয় কমিয়া যাওয়ায় তিনি বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহাকে শিবতুল্য লোক বলা যাইতে পারে। দেউলিয়া মোকদ্দমায় এক মাড়োয়ারীর পুত্রকে তিনি বিলাসিতার জন্য ধমকাইয়াছিলেন। বিলাসিতা ও চাল একবার বাড়িলে কমানো যায় না। ধনীরা সাবধান হউন।

কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রায়ই কানাঘুষা শুনিতাম যে পুনা না নাসিকের নিকট কোন পঞ্চবটীতে এক বিপ্লবী সন্ন্যাসী দল গঠিত হইতেছে বঙ্কিমের আনন্দমঠের আদর্শে। আনন্দমঠ বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাসমূলক উপন্যাস। ইহার কিছু পরে আরম্ভ হইল গোলদীঘিতে নিত্য বক্তৃতার উত্তেজনা। অধ্যাপক পার্সিভ্যাল ক্লাশে একদিন খুব বকুনি দিলেন—

"তোমাদের দুইটি আত্মা—আমার কাছে যখন পড় সুবোধ বালক আর Palais Royal-এ অর্থাৎ গোলদীঘিতে বিপ্লবী।"

তিনি কংগ্রেস বা সুরেন্দ্রনাথ কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়াই ইহাদের তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তব্য "You can petition His Excellency for redress of your grievances. You complain of heavy taxes—I can surrender my salary of Rs. 800/- if Govt. will provide for me."

আমরা অধৈর্য হইয়া উঠিলাম। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছি কিন্তু সাহেবের সঙ্গে বাদানুবাদ করিবার সাহস কই? আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট

প্রভাস দে আমাকে এক রকম ঠেলিয়াই দাঁড় করাইয়া দিল। মিনিট দশেক তর্ক করিলাম। সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন যদিও আমি তোতলাইতে ছিলাম। সাহেব বলিলেন "তুমি বোধ করি উকীল হইবে। তোত্‌লামি তোমার অন্তরায় হইবে। ডাক্তারের কাছে যাও।"

এরপর মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কারে আমরা স্তম্ভিত ও উল্লসিত হইলাম। অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন। টেগার্ট তখন নূতন চাকুরীতে ঢুকিয়াছে। তখন হইতে তাহার উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ পায়। অরবিন্দের গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার ভগ্নী সরোজিনী সার্জেন্টের উদ্যত রিভলভারকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একখানা কাগজ বাহিরে ফেলিয়া দেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। আলিপুর বোমার মামলার শেষদিকে আদালত বসিবার অনতিপূর্বে বন্দীদের "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" গান শুনিয়া আদালতে কৌঁসুলিরা স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য জেলে কাঁঠালের ভিতরে করিয়া রিভলভার নেওয়া হইয়াছিল—এ সব গল্প লোকমুখে প্রচারিত হইত। পুলিশ নাকি বলিত গ্রেপ্তারে ১০।১৫ দিন দেরী হইলে ইহারা সারা চৌরঙ্গী উড়াইয়া দিতে পারিত। বিপ্লবীদের পত্রিকা দৈনিক যুগান্তর বাংলা ভাষার রাজনৈতিক সাহিত্যে নতুন যুগ আনয়ন করে। আলিপুর বোমার মামলার আসামীরা ধরা পড়িবার পরদিন পত্রিকার শেষ কপিতে বাহির হইল Swan Song. অর্থাৎ অন্তিম গীতি—

'না হইতে মা বোধন তোমার ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গলঘট।'

টেগার্ট পুলিশ কমিশনার হওয়ার পূর্বে বিলাতে বোধ করি লণ্ডন ও আয়র্লণ্ডে পুলিশ-প্রধান ছিলেন। Black and Tans হাঙ্গামায় তাঁহার কৃতিত্বে সন্দেহ নাই। তিনি ক্রিমিনোলজিস্ট (অপরাধ বিজ্ঞানী)-ও ছিলেন। সুইন হো স্ট্রীটে অফিসে বড় লাইব্রেরী ছিল। তাঁহার সহকারীগণ বড় বড় বিপ্লবীদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের মনস্তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। ইহার কিছু পরেই ছাত্রদের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে পৃথক রাখিবার উদ্দেশ্যে কার্লাইল সার্কুলার আসে। গুরুদাসবাবু ইহার নিন্দা করেন। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি গড়িয়া তুলিলেন। রাধাকুমুদ মুখার্জির নেতৃত্বে হীরেন্দ্র দত্ত এটর্নির প্ররোচনায় আমরা এম. এ. বি. এল. পরীক্ষার্থীরা স্থির করিলাম পরীক্ষা বয়কট করিব। ইহা ১৯০৫ ইংরাজীর নবেম্বর মাসের কথা। বাড়ী বাড়ী যাইয়া পরীক্ষার্থীদের দলে টানার জন্য প্রচার আরম্ভ হইল। সতীর্থ যোগেশ চৌধুরী ও আমার উপর ভার পড়িল ক্যাম্বেল হাসপাতাল পাড়ায় প্রচারের। সেখানে প্রবীণ উকিল যদু কাঞ্জিলাল থাকিতেন। তিনি এম. এল. পরীক্ষার্থী। বুড়াকে কি সহজে বুঝানো যায়?

অগত্যা বলিলাম "গুরুদাসবাবু সার্কুলারের নিন্দা করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন "বেশ, আজ হাইকোর্টে গুরুদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্তব্য স্থির করিব।"

ফল হইল গুরুদাস ও সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রনেতাদের ডাকাইয়া এই কাজ হইতে তাহাদের ক্ষান্ত করিলেন।

অরবিন্দ সম্পাদিত দৈনিক বন্দেমাতরম্ বিপিন পাল সম্পাদিত নিউ ইণ্ডিয়া (সাপ্তাহিক) ছিল চরমপন্থীদের কাগজ। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 'বন্দেমারতম্'এ "কাছাছাড়া", "নিত্য ভিক্ষা" প্রভৃতি প্রাণস্পর্শী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লিখা "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"— শীর্ষক প্রাণস্পর্শী সম্পাদকীয় অরবিন্দের লেখা বলিয়া অনেকের ভুল ধারণা ছিল।

স্বদেশী যুগে **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** সম্পাদিত দৈনিক 'সন্ধ্যা'ই প্রথম গণ-সংযোগের চেষ্টা। মুদির দোকানেও উহা সাগ্রহে পাঠ হইত। ভাষা দ্ব্যর্থবোধক, সরল, সাধারণের মন হরণ করিত। এখনকার বাংলা সাহিত্য ইংরাজী অনভিজ্ঞ লোকে বুঝিতে পারে না। রেডিও, সিনেমা ও সাংবাদিকের কল্যাণে উহা প্রতি-শব্দ ধরিয়া ইংরাজী অনুবাদও আমাদেরই বুঝিতে কষ্ট হয়।

উপাধ্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ। প্রথমে 'খ্রীষ্টিয়ান এপিফ্যানী' পত্রিকার সম্পাদক পরে সন্ন্যাসী। গেরুয়া তফন (লুঙ্গি) পরিতেন। বেপরোয়া একটি অগ্নি-পিণ্ড। "কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা, একটা সাদা একটা কালা", "কালীমাইকী বোমা", "ফিরিঙ্গির কৃপায় দাড়ি গজায়, শীতকালে খাই শাঁকালু"—ইত্যাদি প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন। সরকারী অনুবাদক (সম্ভবতঃ চন্দ্রনাথ বসু) ঐ সব প্রবন্ধ ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে গলদ্ঘর্ম হইতেন। বিচার কালে হার্নিয়া হইয়া ক্যাম্বেল হাসপাতালে হঠাৎ উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে কয়েকদিন পূর্বে কাগজে লিখিয়াছিলেন "ফিরিঙ্গি, ফাঁকি দিয়ে চলে যাব। আমাকে আটকাতে পারবিনে।" আদালতে প্রথম দিন কুক কোম্পানী হইতে জুড়ী গাড়ী ভাড়া করিয়া চেলী-টোপর পরিয়া নাপিত সহ হাজির হন, যেন বিবাহের বর শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন। তাঁহার শবদেহ ছাত্ররা গাড়ীতে করিয়া টানিয়া শ্মশানে লইয়া যায়।

গোলদীঘির পূর্বপাড়ে সঞ্জীবনীর প্রেসের পাশে ভাঙ্গা বাড়ীতে এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির আড্ডা। এখানে বিপিন পাল, রাজা সুবোধ মল্লিক (ইঁহারই নামে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) অরবিন্দ প্রভৃতি আসিতেন।। উহা বিলাতী বয়কটের কেন্দ্র ছিল। সুবোধ মল্লিকের দানের উপর ভিত্তি করিয়া যাদবপুর National Council of Education (বর্তমানে College of Technology-তে রূপান্তরিত) হইয়াছে। দানের জন্য দেশবাসী সুবোধ

মল্লিককে রাজা উপাধি দেয়। মৈমনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর বিশেষ-ভাবে রাজা সূর্যকান্ত ও তাঁহাদের সঙ্গে বাংলার সমস্ত হিন্দু ও কতক মুসলমান ভূম্যধিকারী বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। লর্ড কুর্জনের৬ বঙ্গচ্ছেদ এই আন্দোলনের মূলে। প্রথমে ঢাকা, চট্টগ্রাম পৃথক করণে কোনও উচ্চবাচ্য হয় নাই। কিন্তু কয়েকদিন পর যখন রাজসাহী ডিভিসনও সামিল করা হইল তখন আচম্বিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মতলব ধরা পড়িয়াছে। তাহা হইল বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করা। 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' ইত্যাদি শ্লোগান ও গানে আকাশ বিদীর্ণ হইল। নিত্য মিছিল, বন্দেমাতরম্ ও নূতন নূতন স্বদেশী গান, শহরে ও গ্রামে বিলাতী কাপড় ও লবণ বর্জন ও অগ্নিসাৎ বা নদীতে নিক্ষেপ। এরূপ ব্যাপক গণ-আন্দোলন ১৯৪২-এও হয নাই। স্বদেশী কেবল দ্রব্য ব্যবহারে নয় স্বদেশী চিন্তায়ও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ ব্যবস্থা দিলেন বিলাতী কাপড়, লবণ, চিনি অশুদ্ধ। ১৯১০-এ অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন "আমবা হিন্দুর মাতৃমূর্তি দেখিয়াছি কিন্তু হিন্দু-মুসলমানেব মার দেখা পাই নাই।"

সেই আদর্শ এখন অতল তলে। যদি তখন আইন অমান্যের আওয়াজ উঠিত তবে তখনই ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইত। নূতন লাট স্যাব ব্যামফিল্ড ফুলার ঢাকার নবাবকে শিখণ্ডী করিয়া পাল্টা আক্রমণ চালান। হিন্দু-মুসল-মান বিদ্বেষ ইহাতে ধূমায়িত হইল।

কুমিল্লা অভয় আশ্রমের প্রতিবেশী মুসলমানগণ,—যাহাদের আশ্রম কর্তৃপক্ষ সেবা করিয়া আসিতেছিলেন,—আশ্রম আক্রমণ করে। নিবারণ (দাশগুপ্ত) বাধ্য হইয়া গুলী ছোঁড়ায় তিনজন প্রাণ হারায়। বিচারে ফাঁসীর হুকুম হয়। জজ সাবদা মিত্র ও ফ্লেচার (?) ঐ হুকুম নাকচ করিলে কলিকাতায় আনন্দ উল্লাস কবা হয়। মুসলমান স্বদেশীদের মধ্যে কুমিল্লাব ব্যাবিষ্টার আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হালিমের ভ্রাতা করিম ছিলেন ফুলারের পক্ষে। ফুলার করিমকে বলিতেন Right Gaznavi আর হালিমকে Wrong Gaznavi. হালিমের প্রথম বৃহৎ স্বদেশী ষ্টোর লালবাজারে বিখ্যাত ছিল। হালিম পাটের ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে করিম বেলিফের কাছে ভাইএর জামিন হন। পরে আদালতে তাহা অস্বীকার করিলে জে. জে. ফ্লেচার রায়ে লিখিয়াছিলেন "He comes in with a false story"। করিম জীবিত নাই। হালিম আছেন। দিল্লীতে সেন্ট্রাল এসেম্বলিতে ইহাকে দেখিয়াছি ; কতকটা লীগপন্থী ছিলেন। স্বদেশী যুগের কথা বলিতে বৃদ্ধের গলা আবেগে কাঁপিত। আবদুল রসুলকে ইউনিভার্সিটি লেকচারে অনুমতি দিতে কমিশনার শার্প অস্বীকার করেন। প্রতিবাদে টাউন হল সভায় রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন "Who is this sharp? I know

one Sharp. He was once an Inspector of schools in East Bengal." রাসবিহারীর এই রকম তাচ্ছিল্যের ভাব কার্যকর হইত।

মেদিনীপুর বোমার মামলা ছিল 'ভয়ঙ্কর' অথচ প্রহসন। ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার মানসে, মেদিনীপুর নেতৃগণ, উপেন্দ্র মাইতি, প্রধান উকীল, নাড়াজোলের মহারাজা প্রভৃতি ১৩৫ জন মালতী বেশ্যার বাড়ীতে বোমা তৈয়ার করাইয়া রাখিয়াছেন—এই ছিল অভিযোগ। হাইকোর্ট ভ্যাকেশন বেঞ্চ সারদা মিত্র Senior Judge হিসাবে সহকারীর মতের বিরুদ্ধে মহারাজাকে জামিন দেন। তখন ইহা খুব সাহসের কাজ গণ্য হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সরকারী কৌঁসুলি মেদিনীপুর জজ আদালতে উপস্থিত হইয়া অধিকাংশ আসামীকে ছাড়িয়া দিবার আর্জি পেশ করেন। জজ আদালতে এক মস্ত প্রহসন। গেঁজেল রাখাল রাহার spydiary-ই মোকদ্দমার ভিত্তি। রাহা সম্ভবতঃ আসামী পক্ষের হাত হইয়া জজ আদালতে সম্পূর্ণ উল্টা সাক্ষ্য দেয়। জজ ধমক দিলে বলে "আমার জবানবন্দীর শেষের দিক দেখুন।" দেখা গেল লেখা আছে 'ইতি সমস্ত মিথ্যা'। অবশ্যই আদালতে নথি পরিবর্তন হইয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য রাখাল রাহার দুই বৎসর জেল হয়। মূল আসামীদের মধ্যে ৬।৭ জনের কঠোর শাস্তি হয়—বোধহয় দ্বীপান্তর পর্যন্ত হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যারিষ্টার কে. বি দত্ত ছিলেন আসামী পক্ষে। লর্ড মর্লি অল্পদিন পূর্বে লরেন্স জেঙ্কিন্সকে প্রধান বিচারপতি করিয়া পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য হাইকোর্টে সরকারী মোকদ্দমায় নিরপেক্ষ বিচারের যশ পুনঃস্থাপনা। এই কেসের আপীলের শুনানীর সময় সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ অন্য আদালতে ছিলেন। জেঙ্কিন্স জুনিয়ার কৌঁসুলিকে মামলা বুঝাইতে বলিলে তিনি অনেকক্ষণ বকিয়া সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। জেঙ্কিন্স তো অগ্নিশর্মা। সরকার গরীব নহেন। অন্য কৌঁসুলি রাখিতে পারিতেন। শেষে রায় দিলেন—'অভিযোগ দুর্বোধ্য। আসামী খালাস।' তখন কলিকাতায় মহা উল্লাস।

কলিকাতায় 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় করেন 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি। আমার শ্বশুরবাড়ী কাঁটাপুকুর (বর্তমান শ্যাম পার্ক)-এ ছিল ইঁহার আড্ডা। ঐখানে বৃদ্ধ ছিন্নবস্ত্র মৌলবী লিয়াকৎ হুসেনকে দেখিয়াছি। রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া মিছিল করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে সহায়তা করিয়াছেন। সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও খগেন্দ্র মিত্রকে প্রায়ই আমার শ্বশুরবাড়ীতে দেখিতাম। আমার বিবাহকে সাহিত্য পত্রিকায় সুরেশ সমাজপতির লেখায় 'বাংলা আসামের গাঁটছড়া' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গে অনেকের ধারণা ছিল শ্রীহট্ট অসমীয়া অধ্যুষিত অঞ্চল।৭

১৯১১ ইংরাজীর একটি ব্যাপার এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। আমার শ্বশুর ৺যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র ৺আনন্দকৃষ্ণ বসুর পুত্র। আমার শ্বশুর মিউনিসিপ্যালিটির কোর্ট ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। রাজনীতি নিয়া খুব মাতামাতি করিতেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন। কলিকাতার ভদ্র সমাজে বহু আত্মীয় বন্ধুবান্ধব থাকায় তাহাদের সাহায্যে কংগ্রেসের অনেক কাজ করাইয়া দিতেন। ভূপেন বসু, চুণীলাল বসু, আর. জি. কর, কৃষ্ণলাল দত্ত প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রতিবেশী। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা আফিসে ডঃ আন্না নামে এক মহারাষ্ট্রীয় যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন। ডঃ আন্না (ছদ্মনাম?) ১৯০৩ ইংরাজী হইতে বিপ্লবী ফেরারী। পরে সে আমেরিকা পলায়ন করে। সাত বৎসর পর ফিরিয়া আসে। তখন সে ক্ষয়রোগগ্রস্ত, শয্যাশায়ী। আমার শ্বশুরবাড়ীতে বৎসর খানেক ভুগিয়া মারা যায়। আমার বড় শ্যালক গৌরবাবু তাহার শুশ্রূষা করিত। সে কিন্তু ভাব দেখাইত যেন ইংরাজী বাংলা জানে না। সাধারণতঃ কথা বলিত না। আকারে ইঙ্গিতে বুঝাইত। ইহার নাম-পরিচয় শ্বশুর মহাশয় হয় তো জানিতেন কিন্তু গোপন করিয়াছেন। তাহার এক ইহুদী বন্ধু মাঝে মাঝে গাড়ী করিয়া আসিত। শুনিয়াছি পুনায় তাহার স্ত্রী ছিল। স্বজাতি, স্বগোত্রের প্রতি টান ভগবৎপ্রদত্ত। না হইলে অজ্ঞাত অনাত্মীয় ব্যক্তিকে কেবলমাত্র বিপ্লবী স্বগোত্রজ্ঞানে এরূপ মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেহ বাড়ীতে রাখিয়া সেবাশুশ্রূষা করিত না।

ইংরাজী বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় রাজদ্রোহসূচক রচনা লিখার জন্য অরবিন্দকে অভিযুক্ত করা হয়। অরবিন্দই যে পত্রিকার সম্পাদক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পুলিশ বিপিনবাবুকে সাক্ষী মান্য করে। বিপিনবাবু হলফ লইতে ও সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অরবিন্দ বাঁচিয়া যান। হলফ লইতে অস্বীকার করা ভারতে এই প্রথম, বোধহয় পৃথিবীতে। শ্বশুর মহাশয় আদালতের সম্মুখেই উল্লাস প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "বিপিন আমাদের মানরক্ষা করিয়াছে।" এই গল্প বন্ধু সুরেশ দেবের নিকট শুনিয়াছি। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পুত্রদের স্বদেশীর সময় ১৯০৫ ইংরাজীতে স্কুল ছাড়াইয়া নেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কিছুকাল এদের পড়াইতেন। পরে আর এদের পড়াশোনা হয় নাই।

নেতৃগণ ৩০শে আশ্বিন বঙ্গচ্ছেদের দিন গঙ্গাস্নানান্তে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন ব্যবস্থা দিলেন। সেই দিন কলিকাতা কি বঙ্গদেশে কোনো হিন্দুর বাড়ীতে উনুন জ্বলে নাই। অপরাহ্ণে গ্রীয়ার পার্ক (লেডীস পার্ক)-এ সার্কুলার রোডে বিরাট সভায়, ঐ জমিতেই দ্বিখণ্ডিত বাংলার একত্ববোধক

"ফেডারেশন হল" করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। রোগশয্যায় শুইয়া আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব করেন। সভাভঙ্গে লক্ষাধিক লোক প্রস্তাবিত হলের জন্য চাঁদা-দানের উদ্দেশ্যে সুদূর বাগবাজারে পশুপতি বসুর প্রাসাদে খালি পায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ উৎসাহ কখনও দেখা যায় নাই। গান্ধী-আন্দোলনে মুষ্টিমেয় লোক আন্তরিক ছিলেন। অধিকাংশই Non-violence from Policy। গণশক্তির বল উপলব্ধি করিয়া দশজনের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। বাংলার কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের সময় Non-violence from Principle or Policy—এই বিতর্ক ছিল। মৃত্যুর পর চিত্তরঞ্জনের প্রভাব ১০।১২ বৎসর ছিল। গান্ধীর এও থাকিবে না। Impractically high ideal—চলে না। প্রকৃতিতে অবিমিশ্র শুদ্ধ থাকিতে পারে না। শক্তির অতিরিক্ত লক্ষের ফল হয় পতন। গঙ্গায় গঙ্গাপিশাচ সৃষ্ট হয়।

উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'র পর সান্ধ্য খবরের কাগজ বোধহয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নায়ক'। অতি স্পষ্ট বক্তা। কাহারও দুর্নীতি উদ্‌ঘাটনে ভয় পাইতেন না। আবার মানহানির মামলা করিলে মাফ চাহিয়া খালাস পাইতেন। অনেকে ইহাকে ভণ্ডামি বলিত। রাস্তার মোড়ে ছোকরা হকার—"আজকের নায়ক, বাবু—পাঁচকড়িবাবু ভারী গাল দিয়াছে, বাবু"—এইরূপ চীৎকার করিয়া কাগজ বিক্রী করিত। তিনি পূতচরিত্র ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্য। বিধবার পূত পবিত্র জীবনযাপন সম্বন্ধে ইঁহার একখানা নীতিমূলক উপন্যাস আছে। ইঁহার ফর্সা, লম্বা, ঋজু নাসাসম্বলিত ব্রাহ্মণোচিত মূর্তি ছিল।

ছাত্র নির্মলকান্তি রায়ের নামে মিথ্যা বোমার মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনে ব্যারিস্টার নর্টনের যশ হইয়াছিল। সরকার পক্ষে এই মোকদ্দমা নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার জন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আদালতের প্রশংসা লাভ করেন। আদালত জিজ্ঞাসা করেন "Mr. Sinha, have you been able to prove your case?"

উত্তর হইয়াছিল—"My Lord, it is for me to argue, for you to judge."

সুরেন্দ্রনাথ গোখলে ও কার্জন

১৯০৪ ইংরাজীতে বন্ধু সুরেশ দেব—গগন সেন সহযোগে জাপান প্রত্যাগত শ্রীহট্ট জলসুকার পূর্ব কথিত রমাকান্ত রায়কে এলবার্ট হলে এক মানপত্র দিবার আয়োজন করি। হলের ট্রাস্টী, 'মিরার' পত্রিকা সম্পাদক নরেন সেন অহিফেনসেবী ছিলেন। তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিতে গেলে আমাদের একটা কথা শোনেন আর ঝিমাইতে থাকেন এই রূপ আধঘন্টা চেষ্টার পর হল ব্যবহারের অনুমতি পাই।

এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে ও গান্ধী বক্তৃতা করেন। মেসের ছাত্ররা বক্তাদের নম্বর দিয়াছিল—সুরেন্দ্রনাথ ১০০ গোখলে ৭০ গান্ধী মাত্র ৩০। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে তখন গান্ধীর কিছু যশ হয়। গান্ধী তখন প্যান্টালুন, লং কোট, মাথায় টুপি পরিতেন। গোখলে পরিতেন প্যান্টালুন, লং কোট, গলায় মারহাট্টি চাদর জড়াইতেন ও মাথায় মারহাট্টি পাগড়ী। চশমা পরিতেন তাহার ভিতর হইতে চোখ জ্বল জ্বল করিত। অতি উৎসাহী; একাগ্রতার দরুণ অতি তাড়াতাড়ি বলিতেন এবং বাক্য শেষে ফিসফিস শব্দ হইত। ভাবখানা Art is long but time is short. হৃদয়গ্রাহী বক্তা, যদিও তথ্য ও হিসাবই বেশী। বাজেট বক্তৃতায় তখনকার দিনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অংকশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়া পুনায় ফার্গুসন কলেজে লেকচারার ছিলেন। দুই কন্যা রাখিয়া স্ত্রী অল্প বয়সে মারা যান। তখন সার্ভেন্ট অব ইন্ডিয়া সোসাইটিতে যোগ দেন। কলেজ হইতে মাসিক পেনসন ৬০ টাকা মাত্র সম্বল। লর্ড কার্জন বিলাতে গোখলের স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন "He was a Political Sanyasin, Rs. 60/- a month was all that he had in this world."

গোখলে পঞ্চাশের পূর্বেই মারা যান। গান্ধী নিজেকে গোখলের শিষ্য বলিতেন। সর্বত্যাগী দেশসেবক গোখলে সার্ভেন্ট অব ইন্ডিয়া সোসাইটির আদি সভ্য। বাঙালীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তি দমনের উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন অফিসিয়াল সিক্রেট্স এ্যাক্ট, ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট করেন। কাউন্সিলে গোখলে বলিয়াছিলেন "My Lord, Conciliate Bengal. What Bengal thinks today India thinks tomorrow. A people that has produced Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, J. C. Bose, P. C. Roy is not to be easily coerced. Do not antagonize Bengal."

গোখলে প্রায়ই সিস্টার নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, দেখিয়াছি। সিস্টার নিবেদিতা থাকিতেন বাগবাজার বসুপাড়ায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল-বাড়ীতে। মেয়েরা গলিতে ময়লা ফেলিলে বুঝাইয়া দিতেন "তোমার দরজার সামনের অংশ পরিষ্কার রাখ রাস্তা ও পরিষ্কার থাকিবে।" বাড়ীতে ঢুকিয়া বুঝাইতেন—ইহা অন্যায়।

সুরেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের প্রেরণা, গ্যারিল্ডী কর্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর শৃঙ্খল মুক্তি এবং গ্রীস রোমের ইতিহাস। তাঁহার আদর্শ বাগ্মী ডিমস্থিনিস, সিসেরো। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মুগুর ভাঁজিতেন। বুক ছিল উঁচু। বদ্ধ মুষ্টি ডাইনে বাঁয়ে সঞ্চালনপূর্বক বুক উঁচাইয়া বাক্য শেষ করিতেন। আমি কলিকাতায় আসার পূর্বে চৈতন্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন

মেডিক্যাল কলেজ হলএ। তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আমি তাঁহার রাজনৈতিক বক্তৃতাই শুনিয়াছি।

তাঁহার স্থাপিত রিপন কলেজে সুরেন্দ্রনাথ, বার্কের Reflections on French Revolution পড়াইতেন। লর্ড রিপন সমগ্র ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইলবার্ট বিলে দেশী ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে ইউরোপীয়ানদের বিচার করিবার ক্ষমতা দিয়া এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই কলেজের নাম তাঁহার নামানুসারে হয়। শাদা সাহেবেরা এই বিলের দরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া রিপনকে অপহরণপূর্বক জাহাজে তুলিয়া ইংল্যাণ্ডে পাঠাইয়া দিবার মতলব আঁটিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজীতে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। বিলাত হইতে আসিয়া যখন প্রথম সিলেটএ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন খুব সাহেবীয়ানা ছিল। স্ত্রীর মেমসাহেব গভর্নেস ছিল। আমাদের গ্রামের দুর্গাদাদি তাঁহার চাপরাসী ছিল। তাহার মুখে শুনিয়াছি সহরে সুরেন্দ্রনাথের নাম ছিল সুরেন্দ্রসাহেব এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম চণ্ডীবিবি। সুরেন্দ্রনাথ ও চণ্ডীদেবী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটএর পরিবারের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কালা আদমীর বাড়াবাড়িতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। একটি কেরানী সুরেন্দ্রনাথের দ্বারা একটি কয়েদীর খালাস পাইবার হুকুম সহি করাইয়া লয়। প্রকৃতপক্ষে তাহার ছাড়া পাইবার কয়দিন বিলম্ব ছিল। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এ সুযোগ ছাড়িলেন না। সুরেন্দ্রনাথের চাকরী গেল। ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়া হাউস পর্যন্ত লড়িয়াও ফল হইল না। এই কাহিনী আমি শ্রীহট্টের হেডমাস্টার দুর্গাকুমার বসুর নিকট শুনিয়াছি। তখন সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষা ও রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট হন।

১৯০৪ ইংরেজীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় লর্ড কার্জন মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"—এই উক্তির সূত্র ধরিয়া মন্তব্য করেন "হিন্দুদের সত্যনিষ্ঠা নাই।"

ঐ কথায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরদিবস প্রাতে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কার্জনের "Travels in the East" পুস্তক লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষের নিকট ছুটিলেন। ঐ পুস্তকে আছে যে লর্ড কার্জন কোরিয়ার রাজার কাছে বয়স মিথ্যা করিয়া চল্লিশোর্ধ্ব বলিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি এও বলিয়াছিলেন যে নিজে রাজবংশজাত না হইলেও তাঁহার বাগদত্তা রাজবংশজাত। এই সব মিথ্যাচরণের ঘটনা অকাট্য প্রমাণসহ অমৃতবাজারে বাহির হইল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদপত্রে অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিলেন। সাপ্তাহিক ন্যাশন পত্রিকায়

এন. এন. ঘোষ লিখিলেন "আড়ম্বর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাপিপাসু কার্জন হিন্দু-সভ্যতার কি বুঝিবেন? তিনি বোধহয় জানেন না যে তাঁহার প্রিয়পাত্র বর্ধমানের মহারাজা নিজের দ্বারবানের চেয়েও দরিদ্র শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, কুলীন স্বদেশবাসীর সম্মুখে নগ্নপদে নগ্নগাত্রে গললগ্নীকৃতবাসে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন।"

সংবাদপত্রসমূহ কার্জনকে তুলোধোনা করিয়া ছাড়িল।

কয়েকটি অপ্রিয় আইন ও বঙ্গভঙ্গ করায় কার্জন জনসাধারণের বিরাগ-ভাজন হন। ঐ সব অবিবেচক উক্তিও এ জন্য কম দায়ী নহে।

সুদক্ষ ও সর্বজনমান্য শিক্ষাবিদ হিসাবে স্যার আশুতোষকে কার্জন তাঁহার কাউন্সিলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত একত্রে রাশি রাশি সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিতে থাকেন। সরকারী সভ্যদের ভোটে ঐ সব প্রস্তাব হারিয়া গেলেও তাঁহারা নিরুদ্যম হন না। তাঁহাদের সংশোধনীর বহরে হয়রান হইয়া কার্জন টেবিল চাপড়াইয়া সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের এই ব্যাপারে অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া অভিযোগ করেন। এতে জনসাধারণ আরও ক্ষিপ্ত হয়।

কার্জন তাঁহার দ্বিতীয়বারের ভারত শাসনের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার এবং অডিটার জেনারেল এটি করাইয়াছিলেন। লর্ড কিচেনার বঙ্গভঙ্গ পছন্দ করেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা ছিল ইহাতে ভারতীয় সৈন্যদের রাজভক্তি হ্রাস পাইবে। লাট-প্রাসাদে যে ভোজ হইত কার্জন তাহার কোনও বিল বা ঐ জাতীয় কিছু দিতেন না। শুধু খরচের অঙ্কটি দিতেন। অডিটার আপত্তি জানাইলেন এবং অনমনীয় ভাব দেখাইলেন। আপত্তিসম্বন্ধীয় চিঠিটির ব্যাপারে দুই ইংরাজ অফিসারের ইতস্ততঃ ভাব থাকিলেও তৃতীয় অফিসার কৃষ্ণলাল দত্ত উহা সমর্থন করিলেন। ভারতসচিব অডিটার জেনারেলকে সমর্থন করায় অসন্তুষ্ট হইয়া কার্জন পদত্যাগ করেন। কৃষ্ণলাল দত্ত পরে ১৯১২ সালের মূল্যসংক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে কিছু-কাল চাকুরী করেন। তিনি শ্যামবাজারে আমার শ্বশুরমহাশয়ের বন্ধু ও প্রতিবেশী ছিলেন। সেখানে প্রায়ই তাঁহাকে দেখিয়াছি। খুব অমায়িক ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন।

কার্জনের কিন্তু অনেক গুণ ছিল। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন। পিঠে আজীবন একটা যন্ত্রণা লইয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। রাত্রে খাওয়ার পর ফাইল লইয়া বসিতেন এবং মধ্যরাত্রির পরে শুইতে যাইতেন। নির্ভীক ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা দোকানপাট বন্ধ হওয়ার পর তিনি নিজস্ব সচিবসহ গভর্ণমেন্ট হাউস ও ডালহাউসী স্কোয়ারের মধ্যে হাঁটিয়া বেড়াইতেন, মধ্যে মধ্যে

দেখিয়াছি। ঐ সময় লোকে তাঁহার উপর খুব অসন্তুষ্ট। তিনি শক্ত লোক এবং নিজের মতাবলম্বনে অনমনীয় ছিলেন। তিনি যখন সিন্ধুর শুক্কুর বাঁধ দেখিতে যান তখন কাজ সবে শুরু হইয়াছে। কার্জন বাঁধের স্থান পরিবর্তনে অনমনীয় ভাব ধরেন। শেষ পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন হয়। পরে দেখা গেল কার্জন ঠিকই বলিয়াছিলেন।

শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাইয়া শিক্ষা বিস্তারের তিনি বিরোধী ছিলেন। পার্সিভ্যাল সাহেবও এই মতাবলম্বী ছিলেন। ডঃ রমেশ মজুমদারের মতে কার্জনের অসদুদ্দেশ্য ছিল না। শিক্ষানীতি ও উদ্দেশ্য ত্রিশের দশকে লর্ড মেকলের ডেসপ্যাচে স্থির হইয়াছিল। "ব্রিটিশের সামরিক বিজয় দীর্ঘস্থায়ী না হইতে পারে কিন্তু সাংস্কৃতিক বিজয় হয় তো হইবে—" এই ছিল বিশিষ্ট ও মহৎ ইংরাজগণের উদ্দেশ্য। আমরা শুধু যে সাংস্কৃতিক বিজয় মানিয়া লইয়াছি তাহাই নহে, একেবারে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বঙ্গবাসী দল, ভূদেব বঙ্কিম প্রভৃতি মুষ্টিমেয় রক্ষণশীলেরা ব্যতিক্রম মাত্র। আশ্চর্য এই যে আজীবন পুরা সাহেবীয়ানার ভক্ত উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৯৩২-এ লাহোর কংগ্রেস অভিযোগ করিয়াছিল যে শাসকপক্ষ আমাদের নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি বিনষ্ট করিতেছেন। আজ যখন দেখি রাজনীতিকগণ, সরকারী কর্মচারী ও ধনী সকলেই পোষাকে, আচরণে, জীবনযাত্রার ধরণে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে সাহেবীয়ানার ভক্ত হইয়া উঠিতেছেন তখন ঐ অভিযোগ যথার্থই হাস্যকর মনে হয়। ইঁহাদের বুলি অবশ্য নিখিলবিশ্বসামাজিক সমন্বয়ের সহিত তাল রাখা। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া ধার করা ময়ূরপুচ্ছ-সজ্জিত হইয়া আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর কর্মদক্ষতা উচ্চআদর্শ ও সামাজিক শান্তি হারাইয়াছি। আমি নিজে স্কুল কলেজে পঠদ্দশায় ভারতে ইংরাজের কার্যকলাপের ইতিহাস পড়িয়া ইংরাজ বিদ্বেষী হই। বোআডিসিয়া কবিতা পাঠ কালে বোআডিসিয়া আমাদের চক্ষে ভারতমাতা এবং সাম্রাজ্যবাদী রোম ইংরেজ। খুড়ামহাশয় বাড়ীতে আচারে ও বেশভূষায় খাঁটি হিন্দু হইলেও বাহিরে স্যুট পরিতেন। বৈঠকখানায় সোফা ছিল। তাঁহার আদেশে দুই তিন বৎসর স্যুট পরিয়া স্কুলে গিয়াছি। তৎপর ক্লাশ সেভেনে রাজস্থান ইত্যাদি পাঠ করিয়া একদিন বিদ্রোহ করিলাম। তদবধি সর্বপ্রকার সাহেবিয়ানার প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরূপ ভাব হয়। ইহাকে প্রেজুডিস বলা যাইতে পারে। "The apparel oft proclaims the man" নেতাদের মধ্যে কেবল মালবীয়, স্যার গুরুদাস, তিলক, অশ্বিনীবাবু, প্রভৃতি কয়েকজন ভিন্ন কাহাকেও এই কারণে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই। বাহিরের কাজকর্মে স্যুটের উপযোগিতার যুক্তিতর্ক নিরর্থক। আমি সিমলাই ধুতি পরিয়া তেত্রিশ মাইল ঘোড়া

দৌড়াইয়াছি। দার্জিলিং সিমলায় নবেম্বরে-ডিসেম্বরে ধুতি পরিয়া কাটাইয়াছি। জাপান রুশকে হারাইয়া পোর্ট আর্থার দখলের পর জাপানের অনুকরণ ও প্রশংসা ফ্যাসন। এর পূর্বে সকলে ইংরাজভক্ত ও অনুকরণকারী ছিলাম। জাপানীরা স্যুট পরে চেয়ারটেবিল ব্যবহার করে সেজন্যই না কি ইহারা বড় হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ধুতি ও ফরাসভক্ত আমাকে মেসে অনেক বাকযুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পরে রবিবাবুর 'জাপানযাত্রীর পত্র' পড়িয়া জানিলাম যে গৃহে জাপানীরা ঘরময় পাতা ফরাসে হাঁটু গাড়িয়া বসে ও আলখাল্লাজাতীয় কিমোনো পরে। আত্মবিস্মৃত জাতি আর কতকাল পরের অন্ধ অনুকরণ করিবে?

যে কথা বলিতেছিলাম সেই কার্জনের কথায় ফিরিয়া যাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে কার্জনের বিদায় সম্বর্ধনায় তিনি বলেন "কখনো কখনো আমার মনে হয় আমি যদি কলিকাতার নাগরিক হইতাম তবে এই শহরকে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিতাম...। আশা করি এই শহর ক্রমে উন্নত হইবে।"

হইয়াছে কি? শহরে গগনচুম্বী অট্টালিকা উঠিতেছে কিন্তু শহর ক্রমেই বেশী নোংরা ও কুশ্রী হইতেছে।

লর্ড কার্জন পত্নীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের দুই কন্যা মাতার সম্পত্তির জন্য পিতার সহিত মামলা করেন। ইংলণ্ডে লর্ড কার্জন পররাষ্ট্র সচিব হন। একদিন তাঁহার গাড়ী নির্দিষ্ট গতিসীমা অতিক্রম করিলে পুলিশ গাড়ী আটকায়। কার্জন অপরাধ স্বীকার করিয়া লঘুদণ্ডের জন্য আবেদন করেন। মন্ত্রীসভার বৈঠকে যাইতে তাঁহার দেরী হইয়া যাইতেছিল বলিয়া গাড়ী বেশী জোরে চালান হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হয়। এই ধরণের আর একটি ঘটনা হইতে ইংরাজ চরিত্রের বিশিষ্ট গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। আসামের লাট স্যার জন কারের ছেলে মিলিটারী কলেজে পড়িবার কালে গৌহাটি শিলং রাস্তায় বেপরোয়া ভাবে গাড়ী চালাইয়াছিল। তাহার পিতার উদ্যোগে তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের শত শত মন্ত্রীদের মধ্যে কাহার গাড়ী এই রূপ আইনভঙ্গের জন্য শাস্তি পাইয়াছে? এই সব গাড়ীচালকেরা বোধ হয় এতই দক্ষ যে রাস্তা চলার আইন ভঙ্গ তাহাদের দ্বারা সম্ভবই নহে! জনসাধারণ অবশ্য এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় ঐসব নেতাদের গাড়ী সংক্রান্ত সব কীর্তিই জানে।

লর্ড কার্জন ইংরাজ কর্মচারী ও চা-করদিগকে ভারতীয়দের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া নোট পাঠাইয়াছিলেন। শহরের ইংরাজ দোকানদার বীমা ও ব্যাঙ্ক কর্মীরা নম্র, ভদ্র ব্যবহার করিতেন কারণ ভারতীয় খদ্দেরদের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহাদের অত্যাবশ্যক। টমিসৈন্যদের

ব্যবহার ছিল অতি খারাপ। ১৯১৮ সালে দার্জিলিংএ জলাপাহাড়ের রাস্তায় সৈন্যাবাসের কাছে একটি টমি আমাদের বিরক্ত করিতেছিল। তিরস্কৃত হইয়া শেষে চুপ করে। বিহার হাইকোর্টের জজ স্যার হাসান ইমাম ও স্যার আশুতোষের সহিত ট্রেনে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের ভ্রমণকালীন ঘটনা সকলেই জানে।

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকপ্রদ কাহিনী বলা যাইতে পারে। গল্পের নায়ক সুবিখ্যাত স্যার রাজেন মুখোপাধ্যায়। মার্টিন রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনিয়ার গিরীশচন্দ্র দাসের নিকট স্যার রাজেন গল্পটি বলিয়াছিলেন। আমি গিরীশ-বাবুর নিকট শুনিয়াছি। স্যার রাজেন ট্রেনে সিমলা হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। কালকা স্টেশনে তিনি দেখিলেন সামরিক বিভাগের কোনো হোমরাচোমরা ব্যক্তি ঐ কামরায় উঠিয়া স্যার রাজেনকে দেখিয়াই নামিয়া গেলেন। স্যার রাজেন বুঝিলেন যে কালা আদমীর সহিত এক কামরায় যাইতে সাহেব রাজী নহেন। তিনি দেখিলেন ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয়ান স্টেশন-মাস্টারের নিকট আলাদা কামরার জন্য বলিতেছেন। কিন্তু স্টেশনমাস্টার উত্তর দিলেন "আর কোন কামরায় জায়গা নাই। রেলগাড়ীর সহিত আর একটা বগী তো জুড়িয়া দেওয়া যায় না। আপনাকে যদি যাইতে হয় তো ঐ কামরায়ই যাইতে হইবে।"

জঙ্গীসাহেব বিরক্ত ও বিমর্ষভাবে কামরায় উঠিলেন। কালা আদমীর দিকে না তাকাইয়া একটা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। স্যার রাজেনের রঙ্গ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি সকৌতুকে প্রতি স্টেশনে চা-চুরুটের ফর-মাইস করিতে লাগিলেন এবং খানসামাকে বেশী রকম বক্‌শিশ দিতে লাগিলেন। জঙ্গী সাহেব কম্বলের ফাঁক দিয়া সব দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজেই উঠিয়া স্যার রাজেনের সহিত আলাপ জমাইলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নামিবার পূর্বে স্যার রাজেনের হোল্ডল পর্যন্ত বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সাহেব ফোর্ট উইলিয়মের কম্যাণ্ডার ছিলেন। স্যার রাজেন ব্রিটিশ চরিত্র ভালই জানিতেন। ইহারা সামরিক আদর্শ বা শ্রেয়োমন্যতার ভক্ত তত নহে যতটা ধনের। ধনীব্যক্তির সম্মুখে ইহারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না।

ঐ কালে চাবাগানের সাহেবরা বাগানের রাস্তা দিয়া ভারতীয় কাহাকেও ঘোড়ায় চড়িয়া বা ছাতা মাথায় দিয়া যাইতে দিত না। বড় বড় সড়ক অনেক সময় বাগানের ভিতর দিয়া যাইত। ১৮৯০ সালে এক নিরুদ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ চা-বাগানে কুলীর সর্দাররূপে বাস করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তাহা কৃষ্ণ-কুমার মিত্রের সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সঞ্জীবনী পত্রিকা চাবাগানের কুলীদের জন্য খুব করিয়াছে। ১৯০৩ ইংরাজীতে একদিন

বিকালে আমরা ছাত্ররা দেখি আমাদের মেসের কাছে একদল কুলী ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের আড়কাঠির চেষ্টা সত্ত্বেও নড়িতেছে না। ছাত্ররা অগ্রসর হইলে আড়কাঠিরা পলাইয়া গেল। তার পর ইহাদের লইয়া কি করা যায় সমস্যা দাঁড়াইল। আমরা কৃষ্ণকুমার মিত্রের শরণাপন্ন হইলে তিনি ইহাদের চাঁদা তুলিয়া দেশে পাঠাইয়া দিতে আমাদের সাহায্য করেন। কুলীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে দেশ সচেতন হইলে লর্ড কার্জন আসামের চীফ কমিশনার স্যার হেনরী কটনকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলেন। কটনের রিপোর্টে স্বীকার করা হইয়াছিল যে ইহারা প্রায় ক্রীতদাস। আড়কাঠিরা প্রায়ই বিহার, মধ্যপ্রদেশের ও সাঁওতাল পরগণার সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে ইহাদের ফুসলাইয়া আনিয়া জড়ো করিত। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ ছিল ইহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ইহারা স্বেচ্ছায় যাইতেছে এই মর্মে লিখিয়া দেওয়া। ধূর্ত আড়কাঠি ছাড়াও ইউরোপীয়ান এজেন্সীও এই ব্যবসা চালাইত। তাহাদের পূর্বপুরুষ যে রূপ নিগ্রো ক্রীতদাসের ব্যবসা করিতেন সে রূপ একটা কুলীর দাম ১০০—২০০ টাকা দাবী করা হইত। খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। স্যার হেনরী এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কিছু প্রস্তাব করেন। কার্জন শক্ত লোক হইলেও চাবাগানের সাহেবদের সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হন। স্যার হেনরীকে গাছে তুলিয়া তিনি মই সরাইয়া নিলেন। চা-করদের রোষ গিয়া পড়িল স্যার হেনরীর উপর। যাহা হউক আড়কাঠির স্থলে সর্দারদের আবির্ভাব হইল। বাগিচা হইতে তাঁহাদের নিজস্ব কুলী সর্দারকে তার নিজের জেলা হইতে পরিচিত লোক আনিতে পাঠান হইত। ইহাতে কুলীদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। কুলী জোগাড় করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলে চা শিল্পের বিস্তারে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয় ফলে একটা কথার সৃষ্টি হয় যে একটা ম্যানেজার গেলে বাগিচার তত ক্ষতি নাই। কিন্তু কুলী একটাও গেলে চলিবে না।

এখন চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক কর্মীদের সামাজিক সাম্যের আদর্শের প্রচারের ফলে সরল বুদ্ধি কুলীর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাকে শিখান হইতেছে যে সংঘবদ্ধ শক্তিতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির নিকট হইতে সে কম কাজ করিয়া বেশী পয়সা পাইতে পারে এবং তাহাদের নিজের শর্তে বাধ্য করিতে পারে। সরকারের শ্রম আইন শ্রম কমিশনার সবই আছে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র শব্দটির প্রতি সরকারের মোহ আছে। তদুপরি নিজেদের মতিস্থির নাই। ইঁহারা পুঁজিবাদ ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক কিন্তু সাহস নাই। ইহার ফল—ধর্মঘট, কর্মবিরতি—যাহার ফলে শ্রমিক মালিক বা দেশ কেহই লাভবান হয় নাই। এবং বাড়তি ফল মার, দাঙ্গা, ম্যানেজারের উপর আক্রমণ এমন কি খুন পর্যন্ত।

পূর্বে বলিয়াছি যে গোরা টমিরাই ইংরাজ চরিত্রের নিকৃষ্টতম নিদর্শন। ইহারা সমাজের নিম্নশ্রেণী হইতে আসিয়াছে। স্বভাবতঃই ক্ষমতা পাইয়া উদ্ধত এবং অত্যাচারী হয়। টমির বুটের লাথিতে এক পাংখাবরদার (যাহারা টানাপাখা টানিত) মারা গেলে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট রায় দেন যে মৃত-ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ প্লীহার রোগে ভুগিতেছিল তাই স্পর্শমাত্র প্লীহা ফাটিয়া গিয়াছে। এইভাবে অপরাধীকে শাস্তি হইতে বাঁচানো হইত। যুবতী নারীরা টমিদের বন্যবাঘের মত ভয় করিত। শিকারের ছুতায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান টমিদের হাতে পড়িলে ইহাদের নিস্তার ছিল না। নব্বই-এর দশকে কলেজের ছাত্ররা ধর্মতলার টমিদের সহিত বিবাদ বাধাইবার জন্য কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে যাইত। সুরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই যতীন্দ্রনাথ উত্তর কলিকাতার অম্বুজবাবু ও তৎপরে গোবরবাবু (যতীন গুহ) শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার পার্শ্বনাথ সেন শরীরচর্চার আন্দোলন শুরু করেন। পরাধীনতার জ্বালাই ইহার মূলে ছিল। ইংরাজকে হারাইতে হইলে তাহাদের মত শক্তি ও সাহস চাই। ফুটবল খেলায়ও এই মনোভাব প্রকাশ পাইত। মোহন-বাগানের শীল্ড জয়ের ফলে যে উদ্দীপনা দেখা দেয় তাহাতেই ইহা সুস্পষ্ট।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্যোধৃত ব্যাঘ্রের সহিত কুস্তি লড়িতেন। ইনি তাঁহার সার্কাসের দল সহ শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বাঘের শারীরিক শক্তি মানুষের চেয়ে বেশী নহে কিন্তু বাঘের সাহসের দরুন সে মানুষকে কাবু করিয়া ফেলে। ভয়ে মানুষ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। শেষে শ্যামাকান্ত সোহহং স্বামীরূপে হিমালয়ে চলিয়া যান।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে যেমন সব রাস্তাই নিউক্যাসেলে গিয়া পৌঁছিত সে রূপ ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষিত ভারতবাসীর সব কার্যকলাপ রাজ-নীতিতে তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে পৌঁছিত। শাস্ত্র বলিতেছেন পরাধীন দেশে সব যজ্ঞ নিষ্ফল।

কার্জন আমাদের কাছে অপ্রিয় হইলেও অনেক ব্যাপারে মিত্রের কাজ করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন কীর্তিসংরক্ষণে তিনিই উদ্যোগী হন। ঐ কীর্তিগুলি আমাদের প্রেরণাদায়ক ছিল। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধকেও আমি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান মনে করি যদিও ব্রিটিশ আমলে কখনো ইহার ভিতরে ঢুকি নাই। পরিবারের লোকদের সহিত গেলেও বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলাম। স্বাধীনতার পরে দুই-তিন দিন গিয়াছি কিন্তু দেরী হইয়া যাওয়ায় খোলা পাই নাই। এই ভবনটি আমার চক্ষে মহান সৌন্দর্যের অধিকারী। তাজমহল আকারে ছোট হইলেও চন্দ্রালোকে ইহার সৌন্দর্য অপরূপ। শাহজাহানের প্রেমের নিদর্শনরূপে এবং যমুনার তীরে অবস্থানের দরুন পরিবেশের জন্যও তাজ অধিক আকৃষ্ট করে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সর্বদাই সুন্দর।

ইহাকে সাময়িক পরাধীনতার জন্য দাসত্বের চিহ্নরূপে গণ্য করা ঠিক নহে ; বরং যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না সেই পরাক্রান্ত ব্রিটিশের নিকট হইতে আমরা স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়াছি ইহা গৌরবের। আমাদের তরুণ বয়সের আদর্শ বীর গ্যারিবলডির গৌরবের চেয়ে ইহা কম নহে।

ভারতবাসী বহু জাতি ও সভ্যতার সমন্বয় ও সহিষ্ণুতার গর্ব করে। এখানে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস পাওয়া যায়। দিল্লীতে সাতজন সম্রাটের রাজত্বের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিহ্নরূপে থাকিলে ক্ষতি কি?

বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস অধিবেশন

১৯০১ ইংরাজীতে বিডন স্কোয়ারে (বর্তমান রবীন্দ্রকানন) দীনশা ওয়াচার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিতে যাই। ঐখানেই প্রথম স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার ও তিলককে দেখি। স্যার সি. পি.-কে দেখিতে ছেলেমানুষ—যেন কিশোর কৃষ্ণের মতন। তিলক ক্ষীণদেহ, মনে হয় যেন গ্রামের পণ্ডিত। ইঁহাদের বক্তৃতায় ইঁহাদের প্রতিভার পরিচয় ছিল। লালমোহন ঘোষ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাতা মনোমোহন ঘোষের মৃত্যুর পর লালমোহন ঘোষ খুব শোকাতুর ছিলেন। কোথাও বাহির হইতেন না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে বাংলার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিবার জন্য লইয়া আসেন। লালমোহন অতি সুন্দর বলিলেন। এত মিষ্ট সংক্ষিপ্ত অথচ তেজোব্যঞ্জক বক্তৃতা কমই শোনা যায়। শোকাতুর লালমোহন প্রচুর মদ্যপান করিতেন। মদের ঝোঁকে তিনি চেয়ারে বসিতে গিয়া পাশের চেয়ারে উপবিষ্ট গোখলের কোলে বসিয়া পড়েন। কিন্তু কেহ হাসে নাই। বিরাট জনসভা ভ্রাতৃশোকাতুর লালমোহনের প্রতি সমবেদনাশীল ছিল।

দাদাভাই নওরোজী—যিনি "স্বরাজ্য" কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন—এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না। বিপিন পাল গণতান্ত্রিক স্বরাজ কথাটি আনয়ন করেন। ইহাই এখন সর্বজন স্বীকৃত।

রাত্রি নয়টার সময় তৎকালীন কলিকাতার নিস্তব্ধতার মধ্যে (এখনকার সারারাত্রিব্যাপী হট্টগোলের কলিকাতা নহে) পামবৃক্ষশোভিত, আলোকোজ্জ্বল প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেলের মধ্যে বক্তৃতা শুরু হইল। চারিদিক নিস্তব্ধ! একটি প্রস্রবণ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া দেখা দিল—অতি মৃদু গতি, লক্ষ্য হয় কি না হয় --তারপর ধীরে ধীরে একটি ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হইল। তারপর গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শাসকবর্গের দর্প নাশ করিয়া প্রবলবেগে ছুটিল।

বাগ্মীতা এখন বিদায় লইয়াছে। বার্ক, পিট, ফক্স, সুরেন্দ্রনাথ, লালমোহন

প্রভৃতির বক্তৃতা আর শোনা যাইবে না। আবেগ এবং অনুপ্রেরণা ব্যতীত বাগ্মী হওয়া যায় না। আধুনিক হিসাবী মনের পক্ষে বাগ্মী হওয়া দুরূহ। আধুনিক মনের অনুভবশক্তি কম। সুদীর্ঘ বক্তৃতা আর বাগ্মীতা এক নহে।

অধিবেশনের শেষে মেসে ফিরিবার পথে আমাদের অঙ্কের অধ্যাপক বিপিনবিহারী ঘোষের সহিত দেখা হইল। এত রাত্রি অবধি কোথায় ছিলাম —তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে জানাইলাম কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলাম। তখনকার দিনের ছাত্র-অধ্যাপক সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

কংগ্রেসের প্রারম্ভ হইতে ত্রিশ বৎসর—১৯০৬ পর্যন্ত মডারেট সুরেন্দ্রনাথের যুগ। দেশপ্রেমের মন্ত্রদাতা সুরেন্দ্রনাথ। ভারতময় তিনিই প্রথম দেশপ্রেম প্রচার করেন। বোম্বাই-এর ফিরোজশাহ মেটা, দাদাভাই নওরোজী, গোখলে, দীনশা ওয়াচা, তিলক, বাংলার উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি, মাদ্রাজের আনন্দ চালু প্রভৃতি, বিহার ও উত্তর প্রদেশের রামভকত, মদনমোহন মালবীয়, দীপনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি তাঁহার সহকারী। বাংলা ও বোম্বাই অগ্রণী, উত্তর ভারত ও বিহার প্রায় নিদ্রিত—গান্ধী, জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসার পর জাগে। সুরেন্দ্রনাথের দলের আশা ছিল 'সূর্য যেখানে অস্ত যায় না' সেই পৃথিবীব্যাপী বিরাট সাম্রাজ্যে আমাদেরও সম্মানের স্থান হইবে। মিল (জন স্টুয়ার্ট মিল) ও স্পেনসারের গণতান্ত্রিক জাতি কি তাহা অস্বীকার করিতে পারে! এই বিশ্বাসের দরুন সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার ধুয়া ছিল—"British rule is broadbased on the foundation of Indian loyalty. We are for the permanence of British rule in India."

এই বিশ্বাস তাঁহার শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বারীন ঘোষ নাকি প্রথম বোমা তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিল। হয় তো পরাধীনতার অসম্মান, ইংরাজ শাসকের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া বোমারুদের আস্কারা দিয়াছেন। মডারেটগণ (নামটি অবশ্য আসিয়াছে গরমপন্থী তিলক প্রভৃতির উদ্ভবের পর) ভারতের আমলাতন্ত্র এবং খোদ কর্তা পার্লামেন্টের মধ্যে পার্থক্য করিতেন। মনে করিতেন ইংরাজ জাতি দয়ালু ও বুদ্ধিমান। অত্যাচার তাঁহাদের অজ্ঞাতে হইতেছে। ইহা নিবারণার্থ বিলাতের প্রতিনিধি লাট (ভাইসরয়) ও পার্লামেন্টকে উদ্দেশ করিয়া বিশেষভাবে অত্যাচারগুলির তথ্য প্রচার করিতেন এবং ইংরেজের সহিত ভারতে এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে সমান অধিকার British Citizenship-এর বাসনা করিতেন। এই অধিকার পাইবার জন্য উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সব সন্তানের বিলাতে জন্মগ্রহণের বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদের নাম ইংরাজ কবিদের নামে, যথা শেলী প্রভৃতি। এখন আমরা হাসিতে পারি কিন্তু তখন ইহাই সকলের আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

বঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বদেশী আন্দোলন দমনে বরিশালের নেতাদের উপর পাশবিক আক্রমণে অনেকের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিল। অনেকেই ক্রমশঃ তিলকের সহিত একমত হইলেন যে, Protest, Prayer, Petition-এ হইবে না, ভয় দেখান চাই। বলে তাড়াইবার চেষ্টার চিন্তা তখন সকলেরই কল্পনাতীত। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, Passive Resistance-এর কথা বলিতেন।

স্বদেশী যুগের পূর্বেই বোম্বাইয়ে প্লেগ দমনে বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া Rand ও Ayerst নামে দুই শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী দামোদর চাপেকার কর্তৃক নিহত হ'ন।৯ (১৮৯৭) দামোদরের ফাঁসি হয়। মহারাষ্ট্র ও কেশরী পত্রিকার সম্পাদক তিলক তাঁহার পত্রিকায় বোমারুদের উস্কানি দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত হন।

তিলকের সাত বৎসর জেল হয়। নিজের মোকদ্দমা নিজেই চালাইয়াছিলেন। বহু পরে এ্যানি বেশান্তও নিজের মোকদ্দমা নিজেই চালান। ১৯০৬ হইতে তিলকের দল (লাল-বাল-পাল অর্থাৎ লালা লাজপত, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল) সুরাট কংগ্রেসে সুরেন্দ্রবাবুর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তখন সুরেন্দ্রবাবুর দল পৃথক লিবারেল ফেডারেশন গঠন করেন। কলিকাতার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ঐ দলের। সাপ্রুও ঐ দলের। গান্ধী সাপ্রুকে মান্য করিতেন। বহু বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। গান্ধী কিন্তু মোটেই চরমপন্থী ছিলেন না। সর্বদাই বলিতেন "আমি গোখলের শিষ্য।" মডারেটরা ইংরাজকে বুঝাইতেন যে ভারতীয়ের সমানাধিকার ইংরেজ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—an appeal to intellect, আর গান্ধীর ছিল ইংরেজের হৃদয় জয় করা—an appeal to heart. একবার গান্ধী বলিয়াছিলেন "If India had sword she would have drawn it. আমি দুর্বল কাজেই ক্ষাত্রশক্তি অভাবে ব্রহ্মণ্যশক্তি প্রয়োগ করিব।" ক্ষাত্রশক্তি অপেক্ষা ব্রহ্মণ্যশক্তি অর্জন কঠিন তাহাও বলিতেন, এ যেন—ম্যাট্রিকমানের উপযুক্ত নহি অথচ বি. এ. পাশ করার আশা! প্রমাদভীত ভীরু জাতি মনে করিল 'এ তো বড় সহজ উপায় ; রক্তারক্তি নাই।' ব্রহ্মণ্যতেজ এক শতাংশ কর্মীরও ছিল না। গান্ধী ইংরেজজাতির অন্তর জয় করিতে পারিয়াছেন বিশ্বাস করি না। ইংরেজ যে গান্ধী আন্দোলনকে তাহার শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিয়াছিল তাহাও মনে করি না। গান্ধী আন্দোলন ব্যাপক হওয়ায় দেশশুদ্ধ লোকের ইংরাজ বিদ্বেষ বাড়িল ইহাই ইংরেজের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদজনক, কারণ যে কোনো মুহূর্তে এই বিদ্বেষ রক্তারক্তি আকার ধারণ করিতে পারিত। ১৯৪২ ইংরাজীতে জয়প্রকাশ প্রমুখের আন্দোলনকে ইংরাজ কিছুটা ভয় করিয়াছে। তখন সহস্র সহস্র লোক বালিয়ার আদালতে ঢুকিয়া নথিপত্র ধ্বংস করিয়াছে, রেললাইন উৎপাটন, রাস্তা বন্ধ করিয়াছে।

এই সব নিশ্চয়ই অহিংসা নহে। শেষে অরাজকতার ভয়ে ইংরাজ তাড়াতাড়ি জহরলাল ও জিন্নার হাতে দেশভাগ করিয়া দিয়া পলাইল। ইংরেজ তাড়ানোর বাহাদুরী যদি কাহারও প্রাপ্য হয় তবে তাহা দাঙ্গাকারীদের। তবে ইহা ঘরে আগুন দিয়া ডাকাত খেদানোর ন্যায়! জ্ঞানতঃ এই উদ্দেশ্য ছিল না। যুদ্ধের প্রারম্ভে দিল্লী এসেম্বলীতে এন. এম. যোশী বলিয়াছিলেন "Let the combatants bleed to death then will come our chance of freedom"--সূক্ষ্ম দৃষ্টি বটে।

তিলকের দল প্রকাশ্যে ইংরেজকে হুমকি দিতে গিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সন্ত্রাসবাদী বোমার দলকে প্রশ্রয় দিতেন এই অভিযোগে সুরেন্দ্রবাবু কৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি বহু মডারেট নেতাও অন্তরীণ হন। এ অভিযোগ স্বীকার করিয়া লওয়াই এখন গৌরবের বিষয়। Everything is fair in love and war। মহাভারতের যুদ্ধেও "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"—হইয়াছিল। ইংরাজ কঠোর হস্তে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহাদের দল-বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—কখন দমে কখন বা বাড়ে। এই অবস্থার ভিতর ১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গান্ধী যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করিলেন। পরে পুরস্কার চাহিলেন স্বায়ত্তশাসন। পাঞ্জাবের ছোটলাট'ও ডায়ার—রাওলাট এ্যাক্ট পাশ করিলেন। জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালা বাগের জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিতে উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাইলেন। পরে অবশ্য এ জন্য বিলাতে তাঁহাকে কোর্ট-মার্শাল করা হয় এবং তরবারি কাড়িয়া লওয়া হয়। এই মর্মান্তিক অপমানে মনোকষ্টে তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় বাকী জীবন কাটান। তাঁহার সাফাই ছিল এই—"আমি সৈনিক, হুকুম তামিল করিব মাত্র।" কাহাকেও প্রশমন করিবার আদেশ দিলে সৈনিক শত্রু গণ্য করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। যেমন যুদ্ধে অতিরিক্ত বল প্রয়োগে সৈন্যের শাস্তি হয় না।

বেসামরিক কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সৈন্য নিয়োগ সম্বন্ধে সাবধান হইবেন। ইহা চিরকালই বিপদজনক।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ক্রন্দন সুদূর শ্রীহট্ট আসামে পর্যন্ত পহুঁচিল।

এই সব মিলিয়া ১৯২১ ইংরাজীর খিলাফৎ অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী হইল। আর্যসমাজী শ্রদ্ধানন্দ জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দিলেন। কিছুকাল পর এই শ্রদ্ধানন্দই আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন।

১৯১৮ ইংরেজীতে তিলক, অশ্বিনীবাবু বৃদ্ধ। গান্ধীর সহিত কিছু আলোচনার পর ইঁহারা সরিয়া পড়িলেন। গান্ধীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হইল।

সুরেন্দ্রবাবু যুদ্ধের পর ১৯১৯ ইংরাজীর স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করিয়া

মন্ত্রী হইলেন। ১৯২৩ ইংরাজীতে চিত্তরঞ্জন গান্ধীর অমতে স্বরাজ্য দল করিয়া কাউন্সিল প্রবেশ করেন। কলিকাতা কেন্দ্রে দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথকে নির্বাচনে হারাইবার জন্য ডাঃ বিধান রায়কে দাঁড় করান হয়। রাজনীতিতে বিধান রায় তখন অজ্ঞাত পরিচয়। তাঁহার রাজনীতিক মত যে কিছু ছিল তাহাই জানা যায় নাই। তবে বিখ্যাত চিকিৎসকরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব যথেষ্ট ছিল। স্বরাজ্য দল ও সত্যাগ্রহের মর্যাদার দাম সুরেন্দ্রনাথের জীবন-ব্যাপী অপূর্ব দেশসেবা ও উন্নততর ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিধান রায়ের হইয়া চিত্তরঞ্জন নির্বাচনে জিতিলেন। তদবধি বিধান রায় কংগ্রেসী ও রাজনীতিক। পরবর্তী কালে সিলেটে আমরা এক গ্রাম্য জমিদার সরপঞ্চ দ্বারা রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্তকে হারাইয়াছিলাম।

বিপিন পাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে গান্ধীর অহিংস অসহযোগের প্রতিবাদ করিয়া কংগ্রেসে তথা রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইলেন। এমন কি কোনও কাগজ তাঁহার লেখা ছাপিত না। শেষে Englishman পত্রিকায় তাঁহার স্বাধীন মত লিখিতেন। ইহাতেও তাঁহার বদনাম হইল যে তিনি ইংলিশম্যানের ভাড়াটে লেখক। বিপিন পাল লেখায় কথায় শেষ পর্যন্ত গরমপন্থী ছিলেন কখনও মডারেট (নরমপন্থী) বা লয়ালিষ্ট (রাজভক্ত) হন নাই কিন্তু গান্ধীনীতির দোষ উদ্ঘাটন বন্ধ করেন নাই। গান্ধীভক্তি তখন এতই প্রখর ছিল যে কেহ সমালোচনা সহ্য করিতে পারিত না। গুরুনিন্দা শ্রবণ পাপ যে!

১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীগণ জার্মানীর সহযোগে ইংরাজকে বলপ্রয়োগে সশস্ত্র যুদ্ধে তাড়াইবার মতলব আঁটেন। এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র নাকি গঙ্গার মোহনায় আসিয়া ধরা পড়ে।১০

১৯৪২ ইংরাজীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুভাষবাবু জাপানী সহযোগিতায় বর্মায় জাপানীদের হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈন্য এবং মালয়ের ভারতীয়দের সহযোগে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া কোহিমা পর্যন্ত আসেন। বর্ষার দরুণ রসদের পথ বন্ধ হওয়ায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। আমার পরিচিত আনন্দ বিশ্বাস ঐ সময় ঐখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকটি সৈন্যকে খাওয়াইয়াছিলেন। জহরলাল শুনিলে ইঁহাকে গুলী করিতেন কি না জানি না!

১৯১৪ ইংরাজীতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এ্যানি বেশান্ত হোম রুল লীগ করেন ও আয়ারল্যাণ্ডের মত হোমরুল দাবী করেন।

এই দল মডারেট (নরমপন্থী) ও চরমপন্থী উভয় দল হইতেই সমর্থন পান—ব্যবস্থাটা মাঝামাঝি কি না। পাকিস্তান দাবীকে Moslem Homeland-এ হোমরুল বলা যাইতে পারে। পরে রাওলাট এ্যাক্ট জালিয়ানওয়ালা-

বাগের পর অন্যসব আন্দোলন ভাসিয়া গিয়া অসহযোগের রাজত্ব হইল। সিডিশনের মোকদ্দমায় এ্যানি বেশান্তের জেল হয়। বেশান্ত নিজে সওয়াল জবাব করেন। তখন তিনি অতি বৃদ্ধা। তাঁহার থিওজফিস্ট শিষ্যগণ তাঁহার দলে যোগ দেন।

অশ্বিনীবাবু সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় দেন নাই। ভক্তিযোগের লেখক জাতীয় চরিত্র গঠনেই মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার স্কুলকলেজে মুকুন্দ দাসের যাত্রা করান। মুকুন্দ দাস 'যাত্রায় রাজদ্রোহের' অভিযোগে কয়েকবার জেল খাটিয়াছেন।

কথায় কথায় বহুদূর আসিয়াছি। এখন আবার কলেজ জীবনে ফিরিয়া যাই।

পুস্তক পাঠ

কলেজ জীবনে নিবেদিতার "Web of Indian Life" যাহাতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা সমর্থন পাইয়াছে (এমন কি নিয়োগপ্রথা ও বহু-স্বামিত্ব পর্যন্ত), ভূদেববাবুর সামাজিক প্রবন্ধ, বিপিন পালের "Soul of India", কাউন্ট ওকাকুরার Ideals of the East, Herbert Spencer-এর সাইকোলজী, জন স্টুয়ার্ট মিলের Liberty, Women ও হাক্সলী টিণ্ডালের Rationalist.। Liberty ছাড়া অন্য বইএর কথা মনে পড়ে না। বাংলা সাহিত্যের আকার তখন সংকীর্ণ ছিল তথাপি ভাল বহি তখন বাহির হইয়াছে বেশী। বিবেকানন্দ, নবীন সেন, হেমবাবু, বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতির গ্রন্থাবলী, হিতবাদী ও বসুমতী প্রেসের কল্যাণে অল্পব্যয়ে পড়িয়াছি। এখন যুবকদের কাছে এই সকল গ্রন্থ অজ্ঞাত। হয়ত নাম শুনিয়াছে মাত্র। স্কুলে পাঠকালে হার্বার্ট স্পেনসারের "এডুকেশন" পড়িয়া অজ্ঞেয়বাদী হইয়াছিলাম। চল্লিশ বৎসর বয়সে আবার "এডুকেশন" পড়িয়া বুঝিয়াছি স্পেন্সার ভগবৎ বিশ্বাসী। ইউরোপে তখন স্পেন্সার ও মিলের যুগ। বিপিন পালের নিউ ইণ্ডিয়ায় ছিল সাপ্তাহিক পলিটিকসের আলোচনা। New India সম্পর্কে গোখলে বলেন "I have not been to such Political Philosophy during the quarter of a century."

বহি কখনও বেশী পড়ি নাই। কিন্তু সময় সময় একখানা দুখানা করিয়া পড়িতেই গ্রন্থসংখ্যা হাজার দাঁড়াইয়াছে সুদীর্ঘ জীবনে। অনেক বহি হারাইয়াছেও বটে। ধার করা বহি কোনো দেশেই ফেরত দিবার গরজ নাই। রবিবাবু তখন লিরিক (গীতি) কবি। তাঁহার বাবুরি চুল, পাঁসনে—এসব অনুকরণ হইত। ইহাকে বলা হইত রাবীন্দ্রিক। উর্বশী, পতিতা, সোনার

তরী, অয়ি ভুবনমোহিনী প্রভৃতি কয়েকটি লিরিক কবিতা ভিন্ন তাঁহার পরবর্তী কালের পদ্যের সমজদার হইতে পারি নাই বোধহয় যুগধর্মের প্রভাবে। গীতাঞ্জলি ভাল লাগে নাই। ভানু সিংহের পদাবলী ভাল লাগে তবে বড় আলঙ্কারিক। গদ্যপ্রবন্ধগুলি ভাল লাগিত। চোখের বালির একটা মোহ ছিল যুবা বয়সের ধর্মে। সুন্দরীমোহন দাস আমাকে বলিয়াছিলেন "রবির পদ্য তো বুঝিই না, গদ্যও বুঝি না।" বিদেশী চিন্তাধারা ইংরাজী সাহিত্য হইতে, দেশী ভাব বাংলা সাহিত্য হইতে তিনি গ্রহণ করিতেন।

স্বদেশীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় চিঠিপত্র লেখার রীতি প্রসার লাভ করে। বহু পূর্বে কামিনী চন্দ, আশু মুখার্জি ছাত্রাবস্থায় বাঙালীর নিকট ইংরাজী লিখা, বলা বর্জন করেন। আমরা বাংলা কথাই বলিতাম, তবে বহুল ইংরাজী মিশ্রিত। ভাব প্রথমে ইংরাজী হইতে গৃহীত, তাহার প্রকাশ ইংরাজীতে হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কুলী মজুর ও মাড়োয়ারীরা পরস্পর যে ভাষায় কথা বলিত তাহাই হিন্দী বলিয়া জানিতাম। কয়েকজন প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যিক চাঁদ কবি, তুলসীদাস ইত্যাদির নাম শুনিয়াছিলাম। কাকা কালেলকার বলিয়াছিলেন "পূর্ব হইতে আপনারা দেবনাগরী অক্ষর গ্রহণ করিলে আজ বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হইত।" সর্বভারতময় এক ভাষা চলিবে ইহা চিন্তার বাহিরে। রাজকার্যে যে ভাষা ব্যবহার হইবে তাহাই রাজদরবারীগণ শিখিবেন। কথিত ভাষা প্রাকৃত। জোর করিয়া বর্জন বা ধ্বংস হয় না। সুভাষবাবুর সাক্ষাতে ডঃ কিচ্‌লুকে বলিয়াছিলাম "I refuse to learn Hindi" সুভাষবাবু বলেন "Typical Bengali"! নিরেস নাগরী গ্রহণ করিয়া নিরেস ভাষা হিন্দী চালাও। 'মাথা গুনতি ডেমোক্রেসীতে' সবই নিরেস হবে। আসল কথা এখন রাজা হিন্দুস্থানী। কখনো বাঙালী রাজা হইলে আবার বাংলা চলিবে। গোয়ালিয়রে কাজকর্মে মারাঠি রাজভাষা ছিল।

কলেজের বাৎসরিক উৎসবে সেক্সপীয়রের নাটক অভিনয় হইত। ছোট-লাট নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। এই সভায় সরলা দেবীকে প্রথম দেখি। মেয়েরা তখন সভাসমিতিতে খুব কম যাইতেন এক ব্রাহ্ম সমিতি ভিন্ন। পরে সরলা দেবীর বাড়ী বীরাষ্টমী উৎসবে গিয়া সত্যকার রায়বেঁশে নৃত্য দেখিয়াছিলাম। রক্তচক্ষু ভীমদর্শন, যশোহরের এক বাগদী ডাকাত দেখাইয়াছিল। ব্রতচারীর Parlour Performance—পোষাকী ব্রতচারী—হইতে আলাদা চীজ। সাহস, তেজ, ক্রোধ নাই ; mimicry—হাস্যাস্পদ। এই সভায়ই সরলাদেবীর ভাবী স্বামী পাঞ্জাবী রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে দেখি। সরলাদেবী তখন 'ভারতী' মাসিকের সম্পাদিকা। ১৯০০—১৯০৮ পর্যন্ত নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। এই সময় ভারতীতে রবিবাবুর 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা' বাহির হয়। সরলা দেবীর পাঞ্জাবী বিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনা হইত যে এই

রূপে আন্তঃপ্রাদেশিক সম্বন্ধ দ্বারা বাঙালীর শৌর্য ও পাঞ্জাবী বুদ্ধির উৎকর্ষ হইবে। প্রাচীন পন্থী জজ সারদা মিত্র পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই রূপ আন্তঃসমাজ বা Intercommunity বিবাহে আদান-প্রদান কিন্তু মুস্কিল। কোন ধর্মই বিধর্মীর সহিত সম্বন্ধ সমর্থন করে না। কিন্তু কেবল ধর্ম-সাম্যেই (সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা সাম্যে) দৃঢ় সমাজ হয় না। দৃষ্টান্ত,—বাঙালী, বিহারী, আসামী হিন্দু। দৈনন্দিন জীবনযাপনে ভাষাসাম্য বড় বন্ধন। ভাষার পরিবর্তন বহুকাল সাপেক্ষ তাহাও পুরাপুরি পরিবর্তন হয় না—ক্রমশঃ বিকৃতির দিকে চলিতে পারে। পূর্ববঙ্গের বাংলা ক্রমশঃ উর্দু, ফারসী, আরবীর দিকে যাইবেই। আনুষ্ঠানিক ধর্মের সম্পর্ক না থাকিলে ভাষা ক্রমশঃ জগাখিচুড়ী হয়। আবেগ, জোর থাকে না, হৃদয়গ্রাহী হয় না। শূন্যে ঝোলা (যেমন বর্তমান বাংলা)—নিরস, নীতিবাদী ভাষা, অকেজো, অবসর বিনোদন করিবে মাত্র। বিভিন্ন ভাষীর বিবাহ সুখের হইতে পারে কারণ স্ত্রী সহজেই নূতন ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু স্বামীস্ত্রীতে আচারব্যবহার, রীতিনীতিতে পার্থক্য থাকিলে বিবাহ সুখের হয় না। ইঙ্গভারতীয় সমাজে মিশ্র বিবাহ চলিবে—ধর্মের, ভাষার, রক্তের—কারণ রীতিনীতি এক।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ব্রাহ্ম সমাজের কাছে ফিল্ডেন একাডেমী ক্লাবে বরোদার মহারাজাকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। ভারতীয় রাজন্যের এই সর্বপ্রথম গণসংযোগ। মহারাজার একটি কথা স্মরণ আছে "At times I feel I were an ordinary citizen. Then I could have more liberty."

স্বাধীনমনা মহারাজাকে Lord Curzon প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। রমেশ দত্ত, অরবিন্দ বরোদায় কাজ করিয়াছেন। এই ফিল্ডেন একাডেমী ক্লাবের ছাদের সভায় হীরেন্দ্র দত্ত আমাদের এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষা বয়কট করার উপদেশ দেন। এইখানে শিবাজীপূজিত সিংহবাহিনী মূর্তির পূজা হয়। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ এবার মূর্তি পূজার দিকে আবার হেলিলেন।

কলেজে অধ্যাপকগণ

বরাবর প্রেসিডেন্সীতে পড়িয়াছি। আইন পড়ি সিটি কলেজে। আই. এ. ক্লাশে উল্লেখযোগ্য শিক্ষক বিনয়েন্দ্র সেন নববিধানের ব্রাহ্ম, সৌম্যমূর্তি প্রিয়দর্শন। ভক্তি আকর্ষণ করিতেন। পড়াইতেন লজিক ও টেনিসনের Almyers' Field। টেনিসন, এমারসন নববিধানীদের প্রিয়। একটি উৎকট ডিসপেপসিয়া রোগী ছাত্র ছিল। তার হাত কাঁপিত ও ঠাণ্ডা থাকিত—কিন্তু লজিকে সেরা ছাত্র ছিল। রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন আফিং খায়। তারপর পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সীর পার্সিভ্যাল, মেট্রোপলিটানের এন. এন. ঘোষ, বঙ্গবাসীর হুইলার—ইঁহাদের “বার্ক” পাঠনার প্রসিদ্ধি ছিল। ছাত্ররা নিজের কলেজ ছাড়া অন্য কলেজে গিয়া “বার্ক” পড়ানো শুনিত। আমরা একদিন হুইলারের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছিলাম। বলিলেন “I spy strangers”. বলিলাম “আপনার নাম শুনিয়া পড়ানো শুনিতে আসিয়াছি।” হুইলারের মা বাঙালী ছিলেন—নাম মনোমোহিনী। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজ হইতে কয়েকজন বড় শিক্ষাবিদ আসিয়াছেন। ডিরোজিওর নাম উল্লেখযোগ্য। পার্সিভ্যাল কৃষ্ণকায় ছিলেন—পিতৃপুরুষ পোর্তুগীজ।

যদুনাথ সরকার অল্পদিন ইংরাজী পড়াইয়াছেন। বিপিন গুপ্ত অঙ্ক পড়াইতেন। পরে কটকে প্রিন্সিপাল হন। ডিসিপ্লিনারিয়ান ছিলেন। একদিন চন্দননগরের চারু চ্যাটার্জি ক্লাসে আপীল করিতেছিল। বিপিনবাবু বলিলেন “চ্যাটার্জি has no right to chatter” চারু লজ্জায় অধোবদন হইল। সারদাবাবু এর পর অঙ্ক পড়াইতেন। নূতন লোক। হেয়ার হিন্দু স্কুল হইতে আসা কয়েকটি বখাটে ছেলে তাঁহাকে বড় উত্যক্ত করিত। ঢাকা কলেজ হইতে হ্যালোয়ার্ড সাহেব আসিয়া কিছুদিন মিলটন পড়ান। এত উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেন যে তখন কলেজে অন্য ক্লাশে পড়ার ব্যাঘাত হইত।

জ্বর হইয়া ক্লাশে এক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকার পর কোনিক্সের পাঠ্যপাঠ্যগুলি আর বুঝিতে পারিতাম না। তখন হইতে অঙ্কশাস্ত্রে অনুরাগ কমিয়া যায়। ফার্স্ট ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া ইংরাজীতে সর্বোচ্চ নম্বর পাই। অনেক ছাত্র আমাপেক্ষা ভাল ইংরাজী জানিত। “কী বুক” নোট কিছুই আমার ছিল না। বোধহয় নিজের ইংরাজীতে লিখিয়াছিলাম বলিয়া বেশী নম্বর পাইয়াছিলাম।

স্টেপল্টন ফার্স্ট ইয়ারে কেমিস্ট্রী পড়াইতেন—তখন আনকোরা নূতন। ব্যবহার খুব ভাল ছিল। পরে D.P.I. হন। সেকেণ্ড ইয়ারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট পড়ি। সারা বৎসব পড়াইলেন না। ডিমনস্ট্রেটার ভাদুড়ীবাবুর experiment শেষ হইলে আসিতেন এবং বোর্ডে ফরমুলা লিখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। ছাত্ররা ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইত। কিন্তু সেসন শেষ হইবার পূর্বে তিনদিন উল্লাস ও উল্লম্ফন সহকারে valency ও atomic theory সম্বন্ধে যে লেকচার দিলেন তাহা অমূল্য—বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা সবই বলা চলে। জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিত্য ক্লাশে পড়াইতে বলা অপব্যয়। আচার্যের উৎসর্গীকৃত ও অবিবাহিত সাদাসিদা জীবন সম্বন্ধে সকলেই জানেন। থাকিতেন B.C.P.W.-র সার্কুলার রোডের ভাড়াবাড়ীর বাহিরের হলে এক খাটিয়ায়। আলকাপের ময়নামতী ছিটের কোটপ্যান্ট পরিয়া কাঁধে ছাতা ফেলিয়া হাঁটিয়া কলেজে আসিতেন। ডিসপেপ্সিয়া ছিল সর্বদা

মাথাধরা থাকিত। পড়াইবার কালেও কপাল টিপিয়া ধরিতেন। এক মেঘলা দিনে জিজ্ঞাসা করিলেন "জুড়ী করিয়া কে কে আসিয়াছ"? ধনীর ছেলেরা লজ্জায় অধোবদন হইল। বলিলেন "I have a pair which never fails but require no upkeep" অর্থাৎ পদদ্বয়।

ফিজিক্স পড়াইতেন আনকোরা প্রফেসর জ্যাকসন। ইনির পাজী স্বভাব। ছাত্রদের উত্যক্ত করিতেন।

বৃদ্ধ হরিশ বিদ্যারত্ন ছিলেন রসিক, ডিসিপ্লিনারিয়ান। সুবোধ মহলানবীশ এ্যাডিশনাল ফিজিওলজি পড়াইতেন। ইনি পোষাকে চলায় উচ্চারণে পুরা সাহেব ছিলেন। পার্সিভ্যাল সাহেবএর টাইফয়েড হইয়া মেজাজ একেবারে বিগড়াইয়া যায়। তিনি চট্টগ্রামের কালো ফিরিঙ্গি হইলেও আপনাকে ভারতীয় মনে করিতেন। মহলানবীশকে দু চোখে দেখিতে পারিতেন না। একদিন তাঁহাদের হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইলে পালির অধ্যাপক সতীশ বিদ্যাভূষণ উভয়কে পৃথক করেন। ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় হিন্দু কলেজ ফাউণ্ডেশন বৃত্তি একটি লাভ করি।

বি.এ. ক্লাশের প্রধান শিক্ষক পার্সিভ্যাল সাহেব লণ্ডনের এম.এ.। সাহিত্য, ইতিহাস সব পড়াইতে পারিতেন। ১৯০৫-এ প্রিন্সিপালের অনুরোধে তিনি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ভাবে ২১টি লেকচার দেন। জজ গুরুদাস কয়েকদিন ৬ টাকা ফি দিয়া এই লেকচার শুনিতে গিয়াছিলেন। যদুনাথ সরকারের পুস্তক ইহার বহু পরে। পার্সিভ্যাল উচ্চ টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া পড়াইতেন। দুই বৎসর ব্যাপিয়া আমাদের বার্কের Reflections on French Revolution পড়ান। Merchant of Venice এবং Richard-ও পড়ান। এ্যাক্টিং করিয়া পড়াইতেন, তাহাতে অর্থ সহজেই বোধগম্য হইত। তাঁহার পড়াইবার রীতি ছিল "Four lines from the top of the page or three lines from bottom" এক একটি শব্দ বা phrase এর paraphrase মাত্র করিতেন। কখনো বা "Put on 'of' before বা 'Put a comma' after—" এ ভাবে বলিতেন। অর্থ পরিষ্কার হইয়া যাইত। ঐগুলি তাঁহার বহির মার্জিনে লেখা থাকিত। আমি সাধারণতঃ ক্লাশে যাহা পড়ানো হইবে তাহা প্রাতে পড়িয়া দুর্বোধ্য স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিতাম। ক্লাশে সমস্ত প্রফেসরের কথাগুলি মার্জিনে টুকিয়া লইতাম। ইহাতে পড়া হইয়া যাইত। পরীক্ষার পূর্বে কখনও revision করি নাই। বি.এল. ও এম.এ. পরীক্ষার সময় ছয় মাস দৈনিক ছয় ঘণ্টা পড়িয়াছি। এ ছাড়া স্কুলকলেজে প্রাতে দুই ঘণ্টার বেশী জীবনে কখনো পড়ার দরকার হয় নাই। পরীক্ষার পূর্বে ক্লাশ শেষ হইলেই আমার পাঠ শেষ। আড্ডা দিয়া অন্য পরীক্ষার্থীদের জ্বালাতন করিতাম। রাসেল সাহেবের সাইকোলজির নোট ক্লাশে টুকিতাম

কিন্তু পড়ার দরকার হয় নাই। মনঃ সংযোগ, interest generating concentration of attention-ই সাফল্য লাভের উপায়। কথাটা সাইকোলজির লেকচারের মত শুনাইতেছে নয় কি? এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটাই কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই। কাজ করার সময় আশপাশের পরিবেশ আমার মোটেই লক্ষ্য হয় না। পরবর্তীকালে বন্যাত্রাণের কাজের সময় বন্যা সমিতিতে এক সহ-সেক্রেটারী আমাকে বলেন 'আপিসে আপনার চেয়ারের পিছনের দিকে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা চলে লক্ষ্য করেন কি?" আমি তো শুনিয়া অবাক। আমার মোটেই লক্ষ্য হয় নাই।

পার্সিভ্যাল একদিন ক্লাশে 'Calcutta' সম্বন্ধে লিখিতে দেন। দুই সেকশনের ২৫০ জন ছাত্রের খাতা দশদিন পর ফেরৎ দেন। প্রত্যেকটি ছাত্রের বানান ভুল, গ্রামারের ভুল লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের পাশে মন্তব্য করিয়া উপরে সাধারণ মন্তব্য। এইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। আমার লেখার উপরে মন্তব্য ছিল "Be careful of your prepositions and spelling. You have originality." বানান সম্বন্ধে আমি বলিলাম "ভাষার দোষ। কি করিব?"

বলিলেন "পাঁচ নম্বর কাটা যাইবে।"

বলিলাম "বাদ দিয়া রাখিয়াছি।"

তখন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "Then I have no objection."

সাবধান করিলেন যাহারা মডার্ন ইংলিশ শুদ্ধমত লিখিতে না পারে তাহারা যেন এম.এ.-তে ইংলিশ না নেয়। ইতিহাস বা দর্শনের ছাত্রের পক্ষে ইংরাজী ভুল তত দোষের নহে। সেকেণ্ড ইয়ার-এ আমরা অনেক ছাত্র ঠিক করিয়াছিলাম নবপ্রবর্তিত বি. এস-সি. কোর্স গ্রহণ করিব। শেষে দেখা গেল মত বদলাইয়া অনেকে বি.এ. কোর্স নিয়াছে। বাবা বলিলেন আমাকে উকীল হইতে হইবে। জমিদারী রক্ষার সুবিধা হয়। মনে মনে বোধ করি আশা ছিল যে পুত্র তাঁহার পিতা ব্রজনাথের ওকালতীর যশ পাইবে। ওকালতীর উপযোগী বলিয়া হিস্ট্রী ফিলজফী নিলাম। কেবল সাইকোলজীর ১০০ নম্বর মধ্যে ৬৬-র বেশী নম্বর পাইয়া পাশ করিয়াছিলাম। লজিক এথিক্সএর ১০০ মধ্যে নম্বর পাই নাই বলিলেই চলে। রাসেল একদিন পড়াইতে গিয়া দৃষ্টান্ত হিসাবে অত্যধিক রাজস্বই যে ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ—রমেশ দত্তের এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। হিন্দু মুসলমান শাসকদের তুলনায় ইংরেজ সমগ্র ফসলে ক্ষুদ্রাংশ রাজস্ব নেয়। তিনি এই যুক্তি দেন। তৎক্ষণাৎ আপত্তি করিয়া বলিলাম "Gross produce দিয়া আলোচনার কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। Net produce না জানিলে বুঝা যাইবে না রাজস্ব দিয়া চাষার কি থাকে।" তৎক্ষণাৎ বহি বন্ধ করিয়া বলিলেন "পরে Net pro-

duce-এর আলোচনা হবে।" পরে Net produce উৎপাদন-খরচা ইত্যাদির কোনো হিসাব পান নাই। এই সম্বন্ধে আর কিছু বলেন নাই। ডঃ পি, কে, রায় লজিক পড়াইতেন। তাঁহার সতীর্থ Carveth Reid-এর বই কেবল পড়িয়া যাইতেন ক্লাশে। ভাল পড়িতেও পারিতেন না বিক্রমপুরী উচ্চারণ—অথচ তিনি একজন নামজাদা দার্শনিক।

এথিক্‌স পড়িতম শশীভূষণ দত্তের কাছে। ইনি ব্রাহ্ম। অতি নিরীহ বেসংসারী লোক। প্রত্যেক শব্দ এত ওজন করিয়া বলিতেন যে মুখ দিয়া যেন কথাই বাহির হইত না। ইনি নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সেকালের সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছিলেন। একদিন ঘর বদলাইয়া সমস্ত ছাত্রদের লইয়া অন্য ঘরে যাইবার সময় সিঁড়িতে প্রবোধ দে ইহার মাথায় ছাতি ধরিয়াছিল। ক্লাশে গিয়া ধীর ভাবে বলিলেন "Probodh, you should not do this."

এম.এ.-র ছাত্র ভগ্নীপতি সূর্যবাবুর সঙ্গে এথিক্‌স লইয়া খুব তর্ক করিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল ভাল জানি। কিন্তু এথিক্‌স পরীক্ষায় দেখা গেল কিছু জানি না। ইতিহাসে অনার্স ছিল। থার্ড ইয়ারেই ইকনমিক্‌সের সমজদার বলিয়া ছাত্রমহলে খ্যাতি হইয়াছিল। এম.এ.-তে History combined Economics নেই। ১৮৯০-এর কাছাকাছি সময় সব ছাত্রই এম.এ.-তে English নিত। কামিনী চন্দ তখন ভাল ছাত্র ছিলেন। তারপর আট-দশ বৎসর দর্শনের ছাত্রসংখ্যা বাড়িল। জেনারেল এসেম্বলীর স্টিফেন সাহেবের নোট পড়িয়া পাশ করা যাইত। আমাদের বৎসর ১৯০৫ হইতে ইতিহাসে ছাত্রসংখ্যা বাড়ে। আমাদের পূর্ববৎসর একমাত্র ছাত্রী ছিলেন তারকনাথ পালিতের মেয়ে লিলিয়ান পালিত। আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে মাত্র তিনটি ছাত্রী লিলিয়ান, একাউন্ট্যান্ট জেনারেল রজনী রায়ের মেয়ে ও একটি বিধবা। আরও দুই বৎসর পূর্বে পি. এন. ব্যানার্জি পাশ করেন। ছাত্র সংখ্যা তিন চার মাত্র ছিল। আমাদের বৎসর পরীক্ষার্থী সংখ্যা চব্বিশ জন ছিল। প্রেসিডেন্সী হইতেই বারো জন। বাকীরা বেশীর ভাগ জেনারেল এসেম্বলী হইতে। তখনকার হিস্ট্রী কোর্স হইতে এখন হইয়াছে পাঁচটি—তিনটি ইতিহাস দুইটি ইকনমিক্স। আমরা ছিলাম "Jack of all trade." জেনারেল নলেজ আমাদের বেশী হইত। এখনকার মতো ইকনমিক্স এমন কি ইতিহাস ভূগোল জানেনা এমন ছিল না। টায়ার্স-এর ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এর Rapid style, logical sequence of events, chapter inevitably following chapter—এই ঐতিহাসিক ধারা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সবই নিয়তি। আমরা সবাই ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক। নেপোলিয়ন অদৃষ্টবাদী

ছিলেন। দেশবিভাগ অদৃষ্ট ভিন্ন কি? একদিন জিন্নার তিক্ততাপূর্ণ আক্রমণ ছিল হাসির বিষয়।

এম.এ.-তে শিক্ষকদের নিকট কোনো সাহায্য পাই নাই। ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান ইকনমিক্সে প্রথম স্থান অধিকার করি। ইকনমিক্স-এ শতকরা নব্বই-এর উপর পাই। পরীক্ষক ছিলেন পার্সিভ্যাল সাহেব। প্রশ্ন কেবল কয়টি phrase। কোনও প্রশ্নের উত্তর দুই চার লাইনের বেশী হয় না। এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করিয়া হলে সকলে মিলিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। জে. এন. দাশগুপ্ত গার্ড ছিলেন। বলিলেন "আশা করি তোমরা উত্তর বলাবলি করিতেছ না।"

বলিলাম "স্যার, আমাদের এইটুকু বিশ্বাস করিতে পারেন।" হল হইতে বাহির হইয়া কে কত পাইবার আশা করি তাহা আলোচনা করিলাম। কেহ বলে দশ, কেহ বলে আঠারো, আমি দেখিলাম মাত্র একুশ পাইব। তেত্রিশের কমে পাশ হওয়া যায় না। সকলেই পাশের সম্বন্ধে হতাশ হইলাম। তখন এম.এ.-তে দৈনিক এক পেপার (১০—৩টা) হইত। একটি প্রশ্ন ছিল এগ্রি-কালচার বনাম ম্যানুফ্যাকচার—কৃষি বনাম শিল্প। উত্তর লিখিতে লিখিতে একটা নূতন আইডিয়া মনে আসিল। কোথাও পাই নাই। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া চিন্তা করিলাম—আইডিয়া ভুল কি না। সন্দেহ ছিল। তখন ফেল তো হইবই ইহা ভাবিয়া মরিয়া হইয়া এটাই লিখিলাম। পার্সিভ্যাল সাহেব এম.এ.-তে উত্তরের গুণাগুণ বিচার করিয়া নম্বর দিতেন পরিমাণ দিয়া নহে। এই-টুকুই ছিল ভরসা। যদি শুদ্ধ হইয়া থাকে তো পাশ করিব। এই পরিমাণের বদলে গুণাগুণ বিচার করিয়া নম্বর দেওয়া লইয়া সিন্ডিকেটের সঙ্গে তাঁহার বিরোধও হয়। তিনি কোন দলের ছিলেন না। উচিত বক্তা; ছাত্রের স্বার্থ তাঁহার নিকট সর্বাগ্রগণ্য। একবার অস্থায়ী প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁহার প্রিয় ছাত্র প্রফুল্ল ঘোষ তখন নূতন প্রোফেসার হইয়াছেন। তাঁহাকে নিয়া ইলিয়ট শিল্ড এর খেলা দেখিতে গেলেন কারণ প্রিন্সিপাল হিসাবে উপস্থিত থাকা কর্তব্য। খেলা শেষ হইলে প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "খেলা কি শেষ? কে জিতিল?"

একবার ছাত্ররা ইলিয়ট শিল্ড জিতিয়া হৈ চৈ করিয়া আসিতেছে। কলেজের গেটে আসা মাত্র তিনি "ঐ দেখ বিজয়ী বীরেরা আসিতেছে।" বলিয়া পড়ান বন্ধ করিলেন। বীরেরা তাঁহার সামনেই জানালার কাঁচ ভাঙিল। প্রিন্সিপাল এই জন্য সমস্ত কলেজকে পাঁচ টাকা জরিমানা করেন। গভর্নিং বডির সভায় এই প্রসঙ্গ উঠিলে পার্সিভ্যাল বলিয়াছিলেন "এ জন্য কাহাকেও শাস্তি দিতে হয় তবে শিক্ষক ও অভিভাবকবর্গকেই দিতে হয়। তাঁহারা ছেলেদের ভব্য আচরণ শিখাইতে পারেন নাই।" ঐ সভার গোপন খবর—ফ্রথার্স বলেন "ভারতীয়রা অত্যন্ত গরীব। প্রতি ছাত্রকে চারি আনা (এখনকার ২৫ পয়সা)

জরিমানা করা হউক।" কানিংহাম বলেন "ছেলেরা সর্বত্রই চপলতা করিয়া থাকেই। আমরাও আমাদের কালে করিয়াছি।"

পর বৎসর বি. এল. পরীক্ষা। এম.এ. পরীক্ষার সঙ্গে প্রাতে সিটি কলেজে দুই এক পিরিয়ড-এ যাইতাম। বই ছিল না। কে. সি. বন্দ্যোপাধ্যায়, খুদাবক্স, পি. কে. সেন ইঁহারা পড়াইতেন। অর্ধেক নম্বর প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব ল' আর অর্ধেক নম্বর কোড ল'। কোড ল' তখন বুঝিতাম না। যদিও পরে আইন-সভায় সংশোধন প্রস্তাবের খসড়া করায় নিরেস ছিলাম না।

'অধম তারণ পতিতপাবন' গাইড বুক (বি. কে. মিত্র) কিনিয়া ছয়মাস দৈনিক ছয় ঘন্টা পড়িয়াও ফল হইল না। জীবনে এই একবারই মাত্র ক্র্যামিং (না বুঝিয়া খাড়া মুখস্থ করা) এর প্রয়াস পাইয়াছিলাম কিন্তু সফল হই নাই। ফার্স্ট পেপার এর বহি প্রায় সবই পূর্বে এম.এ.-তে পড়িয়াছি। এগুলির সাহায্যে নীচে হইতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ওকালতী করিবার সনদ পাইলাম।

কয়েকদিন পর কলিকাতায় বিবাহ করিয়া বধূসহ একেবারে বাংলার পূর্ব প্রান্তে গ্রামে পাড়ি দিলাম।

কলিকাতায় দাঙ্গা

টালার দাঙ্গা, আমি ১৯০০ সালে কলিকাতা আসার কিছু পূর্বে। গল্প শুনিয়াছি, মিলিটারী এক সহস্র দাঙ্গাকারীকে গুলি করিয়া মারে। ইহাদের লাশ নাকি রেলে করিয়া নিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হয়। আমরা বালকেরা তখন কলিকাতার লোককে রক্তভীত মনে করিয়া এই বিবরণ অতিরঞ্জিত মনে করিয়াছি।

আমাদের পাঠ্যাবস্থায় বড়বাজারের দাঙ্গা। তখন আমি কলিকাতায়। আবদার রহিম (পরে দিল্লীতে এসেম্বলীর সভাপতি) তখন বাংলার সচিব। চার পাঁচ দিন দাঙ্গা চলে। মারোয়াড়ীরা অনেকে ভয়ে পলায়ন করে। পরে মিলিটারী ডাকিয়া সায়েস্তা করা হয়। এই দাঙ্গা সত্বর থামানো নিয়া বড়লাট ও ছোটলাটের মধ্যে বিতর্ক হয়—দায়িত্ব কাহার। ছোটলাটের রাজধানী হইতে বড়লাটের রাজধানী দিল্লীতে অপসারণের কি ইহাই কারণ? দিল্লী তখন চীফ-কমিশনারের অধীন। তিনি সাক্ষাৎভাবে বড়লাটের কর্মচারী মাত্র।

১৯০০ ইংরাজীতে মুসলমানদের নেতা নবাব আবদুল লতিফ, তৎপর জাস্টিস আমীর আলী, পরে আবদার রহিম। বড়বাজারের দাঙ্গার বিষয়ে হিন্দুরা আবদার রহিমের উপর দোষারোপ করিত। ১৯৪৬-এর কলিকাতার নরমেধ যজ্ঞের সময় অবশ্য আমি সিলেটে।

কলিকাতায় যুবরাজ ও বয়কট

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বিলাতের যুবরাজ (পরে ডিউক অব উইণ্ডসর) কলিকাতায় আসেন। বাংলায় তখন চিত্তরঞ্জন একচ্ছত্র সম্রাট। যুবরাজ-বয়কট আরম্ভ হইল। বড়বাজারে কাপড় ও মদ গাঁজার দোকানে পিকেটিং আরও জোর চলিতে লাগিল। চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তী দেবী পিকেটিং করিয়া গ্রেপ্তার হন। দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হইবার জন্য ছুটিল। একটা উড়িয়া চাকর স্বেচ্ছায় লাফাইয়া পুলিশের গাড়ীতে উঠিয়া রাস্তায় তাহার মুনিবকে দেখিয়া সোল্লাসে বলিয়াছিল—"বাবু, জেলে যাচ্ছি। বন্দেমাতরম্।" যখন সত্যিকার ভাবাবেশ আসে তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। উড়িয়া চাকরটি "কেন, কি করিতেছি" জ্ঞান হারাইয়াছিল। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Frenzy ; Fanaticism সৎকাজে ভালো, অসৎকাজে মন্দ। চিত্তরঞ্জনের পর অনুরূপভাবে সাইমন কমিশনকে কালো পতাকা দেখাইয়া বর্জন করা হয়।

কলিকাতায় কীর্তনের প্রচার

১৯১৩ ইংরাজীতে আমার শ্বশুরবাড়ী বোস পাড়ায়, নবদ্বীপের ঠাকুরদাস কীর্তনীয়া প্রথম কলিকাতায় কীর্তন করেন। পাড়ায় চিত্ততোষ গোস্বামী নামে এক দরিদ্র গোঁসাই ছিলেন। লোকে সংক্ষেপে চিতু গোঁসাই বলিত। শীতে গ্রীষ্মে খালি গা, গা-ময় কৃষ্ণ-নাম ছাপ। সেই ছাপের জন্য বন্ধুরা বলিত 'চিতে বাঘ'। রেশমের হাঁটুয়া ধুতি পরিতেন, মুখে সর্বদা, 'গৌরনিতাই রাধেশ্যাম মা গঙ্গা শিবরাম বাঁচিয়ে রাখ রক্ষা কর'। আমার শ্বশুরবাড়ীর পাশের বাড়ীতে থাকিতেন। সংসারে মাত্র এক বিধবা কন্যা। বড়লোকের দেওয়া সাহায্যই ছিল উপজীবিকা। রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে যে কীর্তন দল বাহির হয় তাহাতে প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের দলে ইনি ছিলেন। রাত্রি বারোটায় বাড়ী ফিরিতেন। তখন তাঁহার একান্তে "গৌরনিতাই" গান খুব মিষ্ট লাগিত যদিও গলায় সে রকম সুর ছিল না। বাড়ীর কড়া নাড়িয়া ডাকিতেন 'গৌরনিতাই'—মেয়ে দরজা খুলিয়া দিত। তাঁহার বাড়ীতে 'গৌরনিতাই' বিগ্রহ ছিল। ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরনিতাই' ইত্যাদি বলিত।

এই চিতু গোঁসাই-ই ঠাকুরদাস বাবাজীকে কলিকাতায় আনেন। ভোরবেলা বৃহৎ আঙিনায় গান আরম্ভ হয়। ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় আমরা বাড়ীর পুরুষরা বিরক্ত হই। কিন্তু বেলা দুইটার সময় যখন গান জমিল তখন আর না গিয়া পারিলাম না। সাহিত্যিক দীনেশ সেন আসরে শেষ পর্যন্ত ছিলেন।

তিনি সেই কীর্তনের খুব সুখ্যাতি করেন। তদবধি কলিকাতায় নবদ্বীপের কীর্তনের খুব রেওয়াজ। পুরীতে একজন উড়িয়া রাজপুত্রের কীর্তন ভারী চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সিলেটে খগেন মিত্র একবার আমার বাড়ীতে কীর্তন করেন। বৃদ্ধ খগেনবাবু কীর্তন গাইবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন না। এই বয়সেও জোর গাইতে পারেন। সর্বপ্রথম যখন ঠাকুরদাস বাবাজীর গান শুনি তখন তিনি বয়সে প্রৌঢ় ; চেহারাও ভালো না, গলাও কর্কশ, তথাপি কীর্তন চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

প্রলয়চেতাবনী

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে মানব ভীত। কিন্তু ভুলিয়া যায়, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হইতে পারে। হিন্দু ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষী ও বৈজ্ঞানিক কাহারও কাহারও মাঝে মাঝে খেয়াল চাপে অমুকদিন প্রলয় হইবে। ইহাতে অধিকাংশ লোক ভীত হইয়া শেষে হাস্যাস্পদ হয়। আমার সময়ে দুই তিনবার এইরূপ ঘটিয়াছে। ১৯০৩-এ প্রলয়ের ভয়ে এক রাত্রি গোলদীঘির বাগানে শীতের মধ্যে দুই ঘন্টা কাটাইয়া রাত্রি বারোটায় মেসে ফিরিয়া শুইয়া পড়ি। ভয় অপেক্ষা দল বাঁধিয়া পার্কে রাত্রিযাপনের আমোদের আকর্ষণই বোধহয় বেশী ছিল। শাস্ত্রে খণ্ডপ্রলয়, মহাপ্রলয়ের কথা আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আশুপ্রলয় সম্বন্ধে "চেতাবনী" নামক পুস্তক খুব বিক্রী হয়। প্রকাশক খড়িবাজ বটে।

তখনকার রোগসমস্যা ও ডাক্তার কবিরাজ

রোগসমস্যা, বিশেষ চিকিৎসাব্যয়-সমস্যা ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তারের, কবিরাজের ভিজিট অসম্ভব বাড়িয়াছে—৩২ টাকা, ৬৪ টাকা। পূর্বে ছিল ৪ টাকা, ৮ টাকা, ১৬ টাকা মাত্র। ঔষধের মূল্য ৪ হইতে ১০ গুণ হইয়াছে। তার উপর এখন রক্ত ইত্যাদি দশ রকম পরীক্ষা ছাড়া কেবল রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা হয় না। যুদ্ধের বাজারে চোরাকারবারী নূতন ধনীদের কল্যাণেই ভিজিট ও ব্যয় বাড়িয়াছে—ইহার মূলে চাহিদা ও সরবরাহের নীতি। বাঙ্গালী নবধনী নহে—উপায় একমাত্র দাতব্য হাসপাতাল—তাহার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিত্য চিৎকার। বসবাসের স্থানের অভাবে বাড়ীতে প্রসূতি-আগার ও শয্যাশায়ী রোগী রাখা চলে না। এখন ধনীও এই অবস্থার জন্য লজ্জিত হন না।

যুদ্ধের বাজারে বাঙ্গালী ডাক্তাররাই নাকি বেশী লাভবান হইয়াছেন। আমার ছাত্রাবস্থায় আর, এল, দত্ত, হ্যারিস, কর্ণেল সুকীয়া, নীলরতন সরকার, কেদার দাশ, চক্ষু চিকিৎসক কালী বাগচী, হোমিওপ্যাথ প্রতাপ মজুমদার, ও তস্য পুত্র জে, এন, মজুমদার, ডাঃ উনুন (ইহুদী), চন্দ্রশেখর কালি, কবিরাজ বিজয়রত্ন, রাজেন্দ্র সেন, শ্যামাদাস কবিরাজ বিখ্যাত ছিলেন। শেষোক্তর মত নাড়ীজ্ঞানী নাকি বহুকাল হয় নাই।

আত্মীয়স্বজন, প্রায়ই চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিতেন দেশ হইতে। আর, এল, দত্ত ও রাজেন্দ্র সেনকেই বেশী দেখাইতাম। সেকালে ডাক্তার কবিরাজ বহুক্ষণ ধরিয়া রোগী দেখিতেন। রোগীর সংখ্যাধিক্য থাকিলেও টাকার লোভে তাড়াহুড়া করিতেন না। আর, এল, দত্তর বাড়ীতে প্রায় দিনই রোগী ফেরৎ যাইত। পরদিন ইহাদের প্রথম দেখিতেন। শ্রীহট্টের "স্যাণ্ডো" করুণা চৌধুরী, নীলরতন সরকার তাড়াতাড়ি করিলে ডাক্তারের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল, "৮ টাকা ভিজিট নিয়া দুমিনিটেই সারবেন নাকি?" তাহার বপু দেখিয়া ডাক্তার বোধহয় ভয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দেন।

স্টেট মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স ভিন্ন গতি নাই। আর, এল, দত্ত ও হ্যারিস সাহেবের মধ্যে এত বিরোধ ছিল যে, একসঙ্গে 'কল' দিলে হ্যারিস ইচ্ছা করিয়াই পরে আসিতেন। মধ্যশ্রেণীর ৮ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ছিলেন, বিপিন ঘোষ, প্রাণধন বসু, পুলিন আতথী, মৃগেন মিত্র। অনেকে ছাত্রাবাসে ২ টাকা ভিজিট নিয়া পশার জমাইয়া নাম করিতেন।

আর, এল, দত্ত ডাক্তারদের পলিটিক্স করা পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, 'জীবন-মরণ এদের হাতে, এদের পলিটিক্স করার অবসর কোথায়?'

আমার বিবাহে ডাক্তার আর, জি, কর তাঁহার স্কুলের জন্য গ্রামভাটি১২ আদায় করেন।

শতাবধানী ও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট

১৯০৩ ইংরাজীতে আমাদের পঠদ্দশায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে এক মাদ্রাজী পণ্ডিত শতাবধানী দেখিয়াছি। কুড়ি-পঁচিশ জন দর্শক একসঙ্গে চতুর্দিকে নানান শব্দ, ধ্বনি, অঙ্ক উচ্চারণ করেন। শতাবধানী সবগুলি ঠিক ঠিক বলিয়াছিলেন। তখন ইনস্টিটিউট ছিল সংস্কৃত কলেজের পূর্বভাগে। লর্ড কারমাইকেলের সময় বর্তমান নূতন বাড়ী হয়। জে. সি. ব্যানার্জি কণ্ট্রাক্টার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই গৃহ শেষ করেন। ইহা প্রায়ই দেখা যায় না। লর্ড কারমাইকেল ব্যানার্জিকে বলিয়াছিলেন "Prince of Contractors". ইনি রয়েল এক্সচেঞ্জও নির্মাণ করেন।

সহুরে সভ্যতা

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। কিন্তু সহরে যাহাদের বাস তাহারা প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত হয় না বলিয়া মায়ের প্রতি টান নাই। গর্ভধারিণীর প্রতিও অনুরূপ অবস্থায় তাই হয়। মাটি হইতে মানুষ জন্মায় মাটিতেই থাকে। মাটিতে গড়াগড়ি না দিলে আত্মাকে ভুলিয়া যাইতে হয়। লণ্ডনবাসী কিন্তু এমত নহে। ছুটির দিন হইলে সহর খালি করিয়া তাহারা যায় দূর সমুদ্রে, পাহাড়ে বা প্রান্তরে। সিনেমা, বল নাচ, অন্যদিন। কলিকাতাবাসীর ছুটির দিনই সভাসমিতি, সিনেমা, জলসার দিন—বলনাচেরও বটে! এ বোধহয় শরীর নিস্তেজ বলিয়া, যেন সেই গোয়ালবাড়ী ও গৃহস্থবাড়ীর বাছুরের গল্প। এ বলে, 'চল ভাই দৌড়াই'—অপরে বলে 'না ভাই, শুয়ে শুয়ে কান নাড়ি।' দার্জিলিঙের হিমালয়ের সৌন্দর্য অপেক্ষা শিলংএ মানুষের সাজানো বাগান, গল্‌ফ্‌ লিঙ্ক, মোটর রাস্তা, ঘরবাড়ী, ঘোড়দৌড় বেশী ভালবাসি। রবিবাবুর প্রতিভার বিকাশ হয় শিলাইদহে পদ্মার উপর বাস করিয়া। আমরা পুঁথি পড়িয়া প্রকৃতির কথা সব বলিতে পারি যদিচ দেখিবার আগ্রহ নাই। সাহেবেরা কিন্তু এদেশে শিকারে যায়।

১৯১২ ইংরাজীতে বোসপাড়ায় আমরা কয়েকজন এক ছুটির দিনে কোম্পানীর বাগানে১২ যাওয়া স্থির করি। আউটরাম ঘাট হইতে জাহাজে ফেরীতে। যথাসময়ে নারায়ণবাবুর বাড়ীতে গিয়া জানিলাম তিনি রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার জন্য ঘাটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জাহাজে বাগানে পঁহুছিয়া দেখি তিনি আগে আসিয়া বসিয়া আছেন অর্থাৎ নদী লঙ্ঘনের ভয়ে হাওড়া হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছেন। তখনও শিবপুরের ট্রাম হয় নাই। যদি বা দায়ে পড়িয়া অনেকে জাহাজে যায়, নৌকায় পাড়ি দিবার সাহস খুব কম কলিকাতাবাসীর আছে। আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষায় বালী গিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেও গিয়াছি নৌকায়। ১৯১৩ ইংরাজীতে একখানা মোটর-বোট করাই। নূতন বোটে প্রথমেই দক্ষিণেশ্বর যাই বাড়ীশুদ্ধ লোক নিয়া। (ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে পরিবারের সবাই তখন কলিকাতায় ছিলেন) খুড়ামহাশয় যান নাই। বাড়ীতে ছিলেন। আমাদের ফিরিতে রাত্রি আটটা হওয়ায় খুড়ামহাশয় বিপদ হইয়াছে নিশ্চিত হইয়া আমার ছোট ভাইকে বিষয়সম্পত্তি দান করিয়া বৃন্দাবনবাসী হওয়ার কথা ভাবিতেছিলেন। ছোট ভাই-এর পরীক্ষা ছিল বলিয়া বিবাহে আসে নাই। সেদিন বাস্তবিকই দুইটা ফাঁড়া কাটিয়াছে। প্রথমে, খালের গেট দিয়া বাহির হওয়ার সময় ক্ষুদ্র মোটরবোট বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় প্রায় চাপা পড়িয়াছিল। আবার, ফিরিবার পথে রাত্রের অন্ধকারে হঠাৎ মাঝ নদীতে আলো দেখিয়া চালক ক্রেগহর্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করে ইহা

স্টীমারের আলো কিনা। আমি উত্তর দিবার পূর্বেই স্টীমার একেবারে প্রায় উপরে! ক্লেশহর্ন মুহূর্তমধ্যে বোট সরাইয়া লওয়ায় বাঁচিয়া গেলাম।

আমাদের সময় সাময়িক-সহরিয়ার অনেকের জন্ম ও বাল্যকাল গ্রামে। সহরে জন্ম এইরূপ লোকের কথা দূরে থাকুক গ্রামে যাদের জন্ম তাহারাও গ্রামে দশদিন থাকিলে অস্বস্তিবোধ করেন, কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো, ভালো ডাক্তার, সিনেমার অভাবে। মেয়েরা শিয়ালডাকে এবং ব্যাঙ ও কেঁচো দেখিয়া ভয়ে জড়সড়। রবিনসন ক্রুশোর মত জনহীন দ্বীপে না পড়িলে ইহারা মানুষ হইবে না।

যাহাদেব বাহিরে যাইবার ইচ্ছা আছে তাহারাও দ্রুত যানবাহনের অভাব বোধ করে। কলিকাতা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে না গেলে গ্রাম ও প্রান্তর দৃষ্ট হয় না। এইটুকু পথ যাইতে ঘণ্টা তিন লাগে। অবশ্য ব্যোমযান আছে, কিন্তু ব্যয় কেবল ক্রোড়পতির আয়ত্তে।

আমরা যখন কলেজে তখন ঘটীদের কাপুরুষ বলিয়াই জানিতাম। কলিকাতার লোকের অপবাদ ছিল ঘটীচোর। এর উদ্ভব কোথায়, কখন—জানি না। আমরা ছিলাম গোঁয়ার বাঙাল। মেসের বাঙাল ছাত্রদের সংগে পাড়ার গুণ্ডাদের প্রায়ই মারামারি হইত। ৬৪নং হ্যারিসন রোডের (মেস) একটি সিলেটের ছাত্র, ভুদি, ভুনি, ভুদা নামক তিন গুণ্ডার হস্তে ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া হাসপাতালে মারা যায়। তিব্বত অভিযানকারী শরৎ দাসের পুত্র চাটগেঁয়ে প্রবোধ দাস কলেজ প্রাঙ্গনে একা হেয়ার হিন্দু স্কুল-আগত একদল বখাটে ছেলেকে লাঠিপেটা করে। নেশাখোর গোপালের সময় হইতে সহরে কুস্তির আখড়া কয়েকটি হয়। এর ফলে কলিকাতার ছেলেরা কতক সাহসী হইয়াছে এবং অনেকে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়াছে। শিবপুর জেটী ডুবায় অনেকে জলমগ্ন হইয়া মারা যায়। ডাঃ আর. এল. দত্তের একমাত্র পুত্র এবং প্রোফেসর ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মনে হয় রিপন কলেজের) পুত্র মারা যায়। পুত্রশোকে ললিতবাবুর মুখে কেহ আর হাসি দেখে নাই। কিন্তু তাঁহার তামাকুতত্ত্ব, ব্যাকরণ সমস্যা প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক রচনা অবাক হইবার বিষয়। দুঃখের চাপ অসহ্য হইলে নাকি হতাশের হাসির আরম্ভ। তৎপর গোলদীঘি, হেদোয় উলম্ফ—সন্তরণ কাষ্ঠের১৩ উদয় হয়। বছর কুড়ি পূর্বে (১৯৩৪-৩৫) এই সকল পুকুরে অবিরাম সন্তরণের নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিয়া ক্লিষ্ট হইয়াছি। অবসন্নতার ঘুম হইতে পিস্তল-এর আওয়াজ করিয়া জাগাইয়া রাখা হইত। 'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্'। Extremist—সাহস পাশ্চাত্য চরিত্র। হিন্দু মিতাচারী ছিল প্রত্যেকটি বিষয়ে—অতি দান, অতি সঞ্চয়, অতি লোভ, অতি ক্রোধ নিন্দনীয় ছিল। এখন রাজনীতি, সমাজনীতিতে extremist হওয়া গৌরবের বিষয়।

সন্তরণ পটুতায় পূর্ববঙ্গের ছেলের সমকক্ষ বিরল। মেয়েরাও সাঁতার জানে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মেঘাচ্ছন্ন মাঘ মাসেও মেয়েদের নিয়া ভিতরের আঙ্গিনার পুকুরে সাঁতার শিক্ষা দিয়াছি। যে বাঙ্গালী পদ্মা পাড়ি দেয় নাই এবং যে পদ্মাবক্ষে সূর্যাস্ত দেখে নাই, বিরাট নির্জন জলরাশি মধ্যে ইলিশ-মৎস্য সন্ধানী গেরুয়া রং-এর পালতোলা জেলে ডিঙি না দেখিয়াছে, তাহার জীবন বৃথা। পত্রিকা সম্পাদকগণ ইলিশ মৎস্যের অভাবে নিত্য অশ্রুপাত করিয়াছেন। পদ্মা দর্শন করিলে শোকের কিঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে। "বাংলার বায়ু, বাংলার জল", "এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে" —এই সব গান পূর্ববঙ্গবাসী স্বদেশী ও বিপ্লবী গ্রামবাসী একদিন গাহিয়াছে —সঙ্গে সঙ্গে সহরেও গাহিয়াছে। গ্রাম না দেখিয়া গাওয়া, অশ্বত্থামার দুগ্ধ ভাবিয়া পিটুলিগোলা পান। স্মরণ রাখিবেন বিপ্লবীরা অধিকাংশ আনকোরা গ্রাম হইতে সহরে যুবকমহলে আগত। ঢাকা জিলা চিরকালই বলের কেন্দ্র স্বীকৃত হইয়াছে পাঠান আমল হইতে। বর্তমানে সহুরে সভ্যতাভিমানী পশ্চিমবঙ্গ "বঙ্গই" নহে, ইহা রাঢ়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ খৃঃ পূর্বাব্দের রাঢ়ী-দের 'গঙ্গার দুর্দান্ত রাঢ়ী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই শৌর্য আজ কোথায়?

বাঙালমেসের ছাত্ররা দল বাঁধিয়া ধর্মতলায় কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে যাইত —উদ্দেশ্য গোরাদের সঙ্গে মারপিট করা। ত্রিপুরার সরাইল গ্রামের নিকুঞ্জ দত্ত ছিলেন এ বিষয়ে ওস্তাদ। সিলেটে যাত্রাগানে ছাত্রপুলিশ সংঘর্ষ ছিল নিত্য-কার ঘটনা। সুনামগঞ্জে, সার্ভিসের স্টীমার আসিলে ছাত্ররা দেখিতে উঠিত। ইহাতে সারেং ও খালাসীদের সহিত সংঘর্ষ বাঁধিত।

বাঙ্গালীর তিনটি গৌরব

আর. জি কর কলেজ, মূকবধির বিদ্যালয় ও অন্ধ বিদ্যালয়, বাঙ্গালীর তিনটি গৌরবের জিনিষ। সবগুলিরই সূত্রপাত আমাদের প্রথম বয়সে,—অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে। রাধাগোবিন্দ কর কিরূপে চাঁদা আদায় করিতেন বলিয়াছি। মূকবধিরদের প্রথম শিক্ষক যামিনী ব্যানার্জি (বাড়ী ঢাকা) আমাদের সঙ্গে কিছুকাল ৪২নং হ্যারিসন রোডের মেসে ছিলেন। অন্ধ বিদ্যালয়ের দরিদ্র এম. এল. সাহা কয়েকটি দরিদ্র অন্ধ বালকের হাতের কাজ শ্রীহট্ট সম্মিলনী ত্রিপুরা হিতসাধিনী প্রভৃতি সভায়, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেখাইতেন। সভার প্রোগ্রামের সঙ্গে খাপ খাইত না বলিয়া অনেকে বিরক্তি বোধ করিতেন। কিন্তু সাহা মহাশয় নাছোড়বান্দা। এখন অন্ধ, হাইকোর্টে ওকালতী পর্যন্ত করিতেছেন।

১৯০০ সালের কলিকাতা

কলিকাতা সহরের ঘরবাড়ী, জনসংখ্যা সম্বন্ধে প্রসঙ্গাধীন কিছু কিছু বলিয়াছি। তখন মিউনিসিপ্যালিটির বিস্তৃতি ছিল শ্যামবাজার খাল হইতে সার্কুলার খাল বেষ্টিত স্থানমাত্র (আলিপুর সহ)। পার্শ্ববর্তী মানিকতলা নারিকেলডাঙা বেলেঘাটা প্রভৃতি কয়েকটি পল্লীসহ মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। কাশীপুর তখন পৃথক ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। বালিগঞ্জ তখন ছিল মাত্র স্টোর রোড ও স্যানি পার্কের দিকটা। এরপর ত্রিশ বৎসরে বালিগঞ্জ চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। হিন্দুস্থান রোড ছিল ধানক্ষেত। এখন ঐ দিকে রাস্তাঘাট, চিনিতেই পারি না! এণ্টালীতে পূর্বদিকে এত বিস্তার হয় নাই। এণ্টালী ও বর্তমান পার্ক সার্কাসের দিকটায় ছিল চর্মকারের ব্যবসা --দুর্গন্ধে চলা দায় ছিল, ফিয়ার্স লেন প্রভৃতি বহু বাজার অঞ্চলে, চীনা-পাড়ায়ও। ফিয়ার্স লেন ও মেছোবাজারে গুণ্ডার আড্ডা ছিল। দিনের বেলায়ও ভয়ে ভয়ে যাইতে হইত। 'চাইনীজ গ্রাস১৪ কিনিবার জন্য দুইচারবার গিয়াছি। চীনাদের বাঁশের কাঠিদ্বারা চপাচপ্ ঝোল আহারের দৃশ্য উপভোগ করিয়াছি। বেণ্টিক স্ট্রীটে ছিল চীনাদের জুতার দোকান, দোকান, বাস, কারখানা একই ঘরে। বার্ণিস করা চীনা জুতা তখন বাবুয়ানা ছিল। চীনারা দামে না বনিলে গালাগালি দিত। ধর্মতলায় ছিল কাটা কাপড়ের দোকান। চৌরঙ্গীতে সাহেবদের ফেল্‌প্‌স, হোয়াইটওয়ে লেড্‌লো ইত্যাদি। হোয়াইটওয়ে লেড্‌লো সচিত্র ক্যাটালগের সাহায্যে ডাকে কেনাকাটা, মফঃস্বলে ডাকে অর্ডার জোগাইয়া ব্যবসায় উন্নতি করার প্রথম দৃষ্টান্ত। অল্পমূল্যের জিনিষও রাখিত, প্রায় ধর্মতলার দরে। স্বদেশীর সময়ে বহুবাজারে স্বদেশী কাপড়জামার দোকান প্রথম। মানচেষ্টারের বাজার মারোয়ারী দোকানে। কয়েকটি বাঙালী দোকানও ছিল। তাঁতের কাপড় হাওড়ার হাট, বড়বাজার ও বিশেষভাবে জোড়াসাঁকো ও চিৎপুরে। তখন omnibus store১৫ ছিল না। প্রত্যেকটি জিনিসের পৃথক দোকান ছিল। এতে মূল্য কম পড়ে তবে ঘুরিতে হয়। এখন বাঙালী কিন্তু চোখ বুজেই "স্টোরে" ঢুকে। ১৯০২-এ বিজলীর ট্রাম হইবার আগে ঘোড়ার ট্রাম ছিল। চিৎপুর, শ্যামবাজার, ধর্মতলা, কালীঘাট, বহুবাজার, সবগুলি চৌরঙ্গীতে বা ডালহাউসী স্কোয়ারে আসিত। ট্রামের রাস্তা ১৯ হইতে ৪০ মাইল। যাত্রী সংখ্যা বাৎসরিক এক কোটি হইতে ত্রিশ কোটি হইয়াছে পঞ্চাশ বৎসরে। জনসংখ্যা এখন (১৯৫৪) চব্বিশ লক্ষ, তখন ছিল দশ লক্ষ মাত্র। নামজাদা বড়লোকের অঞ্চলগুলিতে বড় বাগানসহ বাড়ী ছিল। এদের বাগান আর বড় নাই। বিক্রি হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ী হইয়াছে। মূল বাড়ীও বোধহয় সাবেক মালিকের হাতে নাই। অধিকাংশ বাড়ী ভাঙিয়া নূতন বাড়ী হইয়াছে। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। নূতন ধনীরা কিন্তু বড় বাড়ী ও

বাগান করিতে কৃপণ। গতি এখন ঊর্ধ্বদিকে। চারতলাই সাধারণ নিয়ম। ছয়-তলা দুই একটি হইতেছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্যবহারিক জীবনসামগ্রী

১৯০০ ইংরাজীতে কলিকাতার রাস্তায় ও বাড়ীতে গ্যাসের আলো দেখিয়াছি। কেবল হ্যারিসন রোডের মধ্যস্থলে গোল বড় ডোমযুক্ত বিজলীবাতি ছিল। তাহা ফিলামেণ্টযুক্ত বাল্ব নহে, তাহা কারবন আর্ক ল্যাম্প। কিছুদিন পরে বৈদ্যুতিক আলো ও ট্রাম হয়। রাস্তা পীচ করা ছিল না। শহরের অভ্যন্তরে অধিকাংশ গলির বাড়ীতে খাটা পায়খানা ছিল। হ্যারিসন রোডে ড্রেন পায়খানা। হ্যারিসন রোড নূতন রাস্তা, এই সময়ের দশ বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। শহরের অভ্যন্তরে অধিকাংশ বাড়ীতে জলের কল ছিল না। পূর্বে নাকি রাস্তার পাশে গঙ্গাজলের নালা ছিল স্নানাদির জন্য। খাবার জল গঙ্গা হইতে ভারীরা আনিত। মেসে আমরা পড়িতাম ডিট্‌মার্ক কোম্পানীর ল্যাম্পে, মোমবাতিতে। খরচ বাঁচাইবার জন্য কেহ কেহ হ্যারিকেন ল্যাম্প বা কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করিত। ক্যান্ডল স্ট্যান্ডে ব্যবহার্য অর্ধেক সাইজের (৫ ইঞ্চি লম্বা) প্রাইস কোম্পানীর মাছের তেলের মোমবাতি ছিল। কিছু পরে ডিগবয় অয়েল কোম্পানী অনুরূপ বাতি করে। স্বদেশীযুগের পর তাহা ব্যবহার করিতাম দেশী বলিয়া। আমাদের আসবাব ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীট-বহুবাজার সঙ্গম হইতে কেনা সুন্দরী কাঠের তক্তাপোষ ও পাতলা সেগুন কাঠের চেয়ার ও ডেস্ক। মূল্য তিন, সাড়ে চার ও সাড়ে তিন টাকা। মেস ছিল চাঁপাতলা অঞ্চলে। বাজার ছিল মাধববাবুর বাজার যেখানে এখন আশুতোষ বিল্ডিং। মাছের সের ছিল আট আনা, দুধ টাকায় চারি সের। বিধু গোয়ালিনী গা-ভরা সোনার গহনা। প্রৌঢ়া, ফর্সা, সুন্দরী। জলো দুধের জন্য দাম কাটিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। অস্ট্রিয়া হইতে আসিত বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন এবং স্টীল ট্রাঙ্ক। বাজার রাধাবাজার। তখন চামড়ার স্যুটকেশ কেবল সাহেব মহলে। স্বদেশীর পর ক্রমশঃ দেশী চামড়ার স্যুটকেশ ও ট্রাঙ্ক বাজারে আসে। ধুতি ছিল প্রধানতঃ রেলীর লাট্টু মার্কা এক টাকা বারো আনা জোড়া ৪৯ নং; আড়াই টাকা জোড়া বাবুদের জন্য। কলিকাতার ধনী বৃদ্ধরা রেলীর ৪৯ নং লংক্লথ, আদ্দি ও ড্রিল বা আলপাকার কোট ব্যবহার করিতেন। কাঁচির ধুতি ফ্যাসান ছিল। কম্বুলিয়া টোলার বিপিন ঘোষ ডাক্তারের বুড়ো বয়সেও কাঁচির ধুতি, আলপাকার কোট, কোঁচানো চাদর, কোঁচা হাতে ধরা ছবি মনে হইলে এখনও হাসি পায়। অসলার ছিল দামী বেলোয়ারী দোকান। বিদ্যুৎ সরবরাহের পর অনাথ দেব প্রভৃতি অনেক ধনী বেলোয়ারী ঝাড় বিক্রয় করিয়াছেন।

সৌখীন খাট ছিল কোঁদা পায়া ও কারুকার্যময়। যেমন বাড়ী নির্মাণে আর্কি-টেকচার ছিল ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের, প্রাচীন লুই ইত্যাদি স্টাইলের আদর ছিল। বড়লোকের বাড়ীতে এইটিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরী, নাইন্‌টিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরীর বড় বড় শোবার কোচ ও বড় গোল পাথরের টেবিল থাকিত। মেপল্‌স্‌ ছিল নাম-জাদা কোচ-মেকার, বোধহয় ইটালিয়ান কোম্পানী। ল্যাজারাস ছিল একমাত্র নামজাদা ফার্ণিচার কোম্পানী যেখানে শিখিয়া চ্যাটার্জী বোধহয় ১৯০৬-এর পর চ্যাটার্জী কোম্পানী করেন। আশু চৌধুরী জজ নিলামে পিউ সাহেব ব্যারিস্টারের একখানি মেপলের সোফা ১৫০০ টাকায় কেনেন।

ফনোগ্রাম প্রথম শুনি সিলেটে। কলেজের প্রিন্সিপাল প্রমোদ বসু এক সভায় প্রদর্শন করেন ১৮৯৫ ইং-তে। ইহা গ্রামোফোনের পূর্বপুরুষ। রেকর্ড ছিল সিলিণ্ডার। গহরজান ছিল বিখ্যাত বাইজী। প্রথম যখন গ্রামোফোন উঠে তাহার দরাজ গলা অনেকে শুনিয়াছেন। গহরজানের পর কলিকাতায় বাইজীর নাম আর শুনি নাই। লক্ষ্ণৌ-এ মাহ্‌মুদাবাদে মুসলমান রাজার বাইজী ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা।

সিলেটে প্রাচীনপন্থী প্রৌঢ়ারা জামা পরিতেন না। কলিকাতায় হাতকাটা জ্যাকেট ছিল। ব্রাহ্ম মহিলারা পুরুষ মহলে বাহির হইতেন বলিয়া পুরাহাতা জ্যাকেট গায়ে দিতেন। পাঞ্জাবীর ব্যবহার কম ছিল। বৃদ্ধরা কোট গায়ে দিতেন। যুবকরা শার্ট পরিত। মোজার ব্যবহার ছিল বেশী বিশেষতঃ শীতকালে। চুনীলাল বসু তাঁহার পুত্রকে লিখিয়াছেন শীতকালে সর্বদা মোজা পরিবে। ১৯১৪ ইং যুদ্ধের ঠেলায় সাহেবরা প্যাণ্ট, হাফসার্ট ধরিলে এবং মোজা ছাড়িলে অনুকরণকারী বাঙ্গালীবাবু অনুসরণ করেন, খালি পাও হন। আগে শিক্ষিত মহলে খালি পা ছিল অসভ্যতা।

গান্ধী আনেন স্যাণ্ডাল। ১৯০০ ইং-তে ছিল তালতলার বিদ্যাসাগরী চটি; বাবুদের কে. এম. দাসের চটী, সাহেবদের গ্রীসিয়ান শিলপার। বুট গোরারা পরিত। বুট পরার অর্থ ছিল গুণ্ডামী। সুটের সাথে বুট পরা বাধ্যতা-মূলক ছিল। আবার জুতা ও প্যাণ্টের ফাঁকে পা দেখিলে মেমসাহেবেরা নাকি মূর্চ্ছা যাইত। হায়রে ফ্যাসনের দাসত্ব! বানর অপেক্ষাও মানুষ অধম হয়।

বৈদ্যুতিক পাখার পূর্বে ছিল কাঠের ঝোলানো বরগায় আঁটা ক্যানভাস বা মাদুরের টানা পাখা। আমাদের সময়ে ১৯০৬ ইং পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে মাদুরের টানা পাখা ছিল।

শীতকালে সাহেবদের সার্কাস আসিত। গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলিত। আমরা যাইতাম। একবার বাঙ্গালীবাবুর সার্কাস আসে। বাঙ্গালী মেয়ে খেলা দেখাইত। আমরা যেদিন যাই সুরেন্দ্রনাথ সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যারা চিকের আড়ালে বসেন। প্রত্যেক বাড়ির মেয়েদের বারান্দায় চিক

থাকিত। নববিধান ব্রাহ্মসমাজেও মনে হয় চিক ছিল। গৃহস্থ ঘরের বাঙ্গালী মেয়েরা—চল্লিশ বৎসর পূর্বেও (১৯১২-১৩) পেটিকোট পরিত না। মনে পড়ে একবার শিয়ালদহ স্টেশনে কালো ফিরিঙ্গিনী ইন্‌স্‌পেক্টার পেটিকোটের উপরে এত পাতলা শাড়ী পরিয়াছিল যে ঘেন্না হয়। এখন ঘরে ঘরে এই দৃশ্য।

কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি

ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় না থাকিলেও যাঁহাদের দুই একবার দেখিয়াছি তাঁহাদের কথা লিখিতেছি ঃ—

রাসবিহারী ঘোষ—টাউনহলে রাজনৈতিক সভায় ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি। একটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহার বক্তৃতায় মিল্‌টন, সেক্‌সপীয়রের প্রভাব খুব বেশী। তাঁহার কেরাণী ছিলেন সিলেটের একজন। তিনি বলিয়াছেন, বিকালে আফিস হইতে আসিয়া বিপত্নীক রাসবিহারী কেরাণীকে বলিয়া দিতেন আইনের, বে-আইনের কি কি পুস্তক তাঁহার টেবিলে রাখিতে হইবে। সন্ধ্যার পর খানসামা একটি ছোট টেবিলে খাবার ও মদ্য রাখিয়া যাইত। সমস্ত রাত্রি কোচে শুইয়া রাসবিহারী পড়িতেন। সঙ্গে খাদ্য ও মদ্য চলিত। এর মধ্যে কখনও কোচে ঘুমাইতেন। তাঁহার জুনিয়র উকীল হওয়া এক বিপদ ছিল। তর্ক করিবার সময় জুনিয়রকে কোন তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইতে দেরী হইলে তাড়াতাড়ি করিবার জন্য জুনিয়রের পাঁজরায় ঘুসি দিতেন দেখিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতায় আইনের জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ তো থাকিতই আবশ্যক বোধে থিয়েটারী ঢং-এ অপর পক্ষের প্রতি ক্রোধ, ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য দেখাইতেন। দুর্বল জজরা ধোঁকায় পড়িতেন। বন্ধকী আইনের তিনি নাকি ছিলেন পৃথিবীতে একমাত্র বোদ্ধা। বন্ধক (Mortgage) idea টি বিশ্লেষণ করিলে কি দাঁড়ায় বোঝা শক্ত। ইহা ধারও, বিক্রিও। একবার একটি বন্ধকের মোকদ্দমায় তিনি পূর্ববর্তী এক মোকদ্দমায় যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন ঠিক তাহার উল্টা যুক্তি যে সঙ্গত তাহা দেখাইতেছিলেন ; জজ বলিলেন, "আপনার যুক্তি অকাট্য দেখিতেছি, অথচ আপনি অপর মোকদ্দমায় যে উল্টা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহা এতদিন অকাট্য ছিল, আজ কাটা গেল আপনার হাতেই। এখন বলুন দেখি কোনটা সত্য?" রাসবিহারী উত্তর দিয়াছিলেন, "সত্যাসত্য শ্রোতার কাছে, আপনার যাহা সত্য মনে হইবে তাহাই সত্য। অপর জজের কাছে যাহা মনে হইয়াছিল তাহাও সত্য।"

র‍্যাম্‌পিনির (নূতন সিভিলিয়ান জজ) এজলাসে এক মোকদ্দমায় রাসবিহারীর আর্দালী বহু নজীরের পুঁথি টেবিলে রাখে। র‍্যামপিনি বলেন, "আপনি যে লাইব্রেরী সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন।" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল,

"আপনাকে তো আইন শিখাইতে হইবে, ধর্মাবতার।" বলিয়াই ক্রোধে রাসবিহারীর অন্তর্ধান। সিনিয়র জজ কেরানীকে বলিলেন, "এই মোকদ্দমা লিস্টের নীচে ফেল।" টিফিনের ছুটিতে সিনিয়র জজ র‍্যামপিনিকে বলেন, "তুমি কাহাকে অপমান করিলে জান? তোমায় আমায় আইন শিখাইবার শক্তি ইঁহার আছে।" পরে রাসবিহারীকে ডাকাইয়া র‍্যামপিনি দুঃখ প্রকাশ করিলে পর রাসবিহারী ঐ আদালতে যান।

রাসবিহারী একবার কংগ্রেসের সভাপতিও হন যদিও কংগ্রেস মঞ্চে তাঁহাকে বড় দেখা যায় নাই। আইন ও সাহিত্যপাঠেই ছিল তাঁহার আসক্তি।

ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত—ইঁহাকে দেখিয়াছি ১৯০১ ইংরাজীতে: অতি বৃদ্ধ; ব্যারিস্টারী ছাড়িয়াছেন। তাঁহার হার্টের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে ডাক্তাররা বলিতেন, এরূপ লোক বাঁচিতে পারে না। তখন কলিকাতায় দুই চারি খানা মোটরগাড়ী আমদানী হইয়াছে মাত্র। মোটরে রাস্তায় সর্বক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভ্রমণ করিতেন। বন্ধুরা বলিতেন, এই আকর্ষণেই তারক বাঁচিয়া আছে। মাথাও কিছু খারাপ ছিল। লাঠি নিয়া রাস্তায় বিড় বিড় করিতে করিতে চলিতেন। উইলে ইউনিভারসিটিকে বহু টাকা দেন। সেই উইলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পুত্র লোকেন পালিত মামলা করেন। পরে ইহা আপোস হয়। শিমুলতলায় রিজে সর্বশেষ সাদা বৃহৎ বাড়িটি ছিল তারক পালিতের। পরের বাড়িটি শ্যামপার্কের ভবনাথ সেনের। তিনি বারোমাসই তথায় থাকিতেন। এর কাছে স্যার রাজেন মুখার্জীর বাড়ী ছিল।

উত্তর কলিকাতার জনৈক জমিদার তাঁহার সম্পর্কিত ভ্রাতার বিধবাকে ঘরের বাহির করিয়া তাহাকে লইয়া শিমুলতলা স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে এক পার্মানেন্ট্ ওয়ে ইন্স্পেকটরের বাংলো কিনিয়া তথায় বাস করিতেন। বিধবার স্বামীর সম্পত্তি নিয়া হাইকোর্টে মামলা হয়। তখন বিদ্যাসাগরী বিধবাবিবাহ আইন বলবৎ। তজ্জন্য এই বিধবা পতিতা গণ্য হন। নীচের বাড়ীগুলির বাসিন্দারা রীজওয়ালা ধনীদের হাউস্ অব্ লর্ডস্ বলিত।

পাইকপাড়ার বিখ্যাত জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ—ইঁহাকে দেখি নাই। ইঁহার সম্বন্ধে বহু গল্প কলিকাতায় প্রচলিত ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে লেখার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ শ্রীহট্টিয়া সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ওরফে গুড়গুড়ি ভট্টাচার্যকে ধরিয়া দূর জমিদারী কাছারীতে এক বৎসর কয়েদ রাখেন। মহামান্য হাইকোর্টের সপিনা-ও কার্যকরী হয় নাই। ইঁহার বিলাসিতা, তেজস্বিতার কথা এবং চৌঘুড়ীর কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিত। ইনি নাকি কোন রক্ষিতা ইহুদী বেশ্যাকে খুন করিয়া ঘোড়ার ডাকের মত ব্যবস্থা করিয়া রাতারাতি এতদূর চলিয়া যান যে পুলিশ ইঁহার বিরুদ্ধে মামলা করিয়া হতবুদ্ধি হয়। বৃদ্ধ বয়সে বালিকা মৃণালিনীকে বিবাহ করেন। পরে বিধবা রাণী মৃণালিনী

কেশব সেনের পুত্রকে বিবাহ করেন। ইনি আমাদের সময়ে একজন বিখ্যাত মহিলা কবি। অপরা বিখ্যাত কবি মানকুমারী বসু।

উত্তরপাড়ার জমিদার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক সভায় এক মঞ্চে দেখিয়াছি। ইনি এক সভায় সভাপতিও ছিলেন। তীক্ষ্ম বুদ্ধি, তেজস্বী ও কর্মঠ জমিদার বলিয়া ইঁহার সুনাম ছিল। তখন ব্যবসায়ী ভাগ্যকুলের সীতানাথ রায়ও রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতেন। বর্ধমানের কুমার বাহাদুর ও রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী যৌবনে সুরেন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণে দুই একটি বক্তৃতা দেন। এই সকল যুবকদের এই সখ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

ঠাকুর পরিবার—মহর্ষিকে দেখি নাই। ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় আমার সতীর্থ সুপ্রকাশ গাঙ্গুলী প্রদত্ত প্রবেশপত্র নিয়া ১৯০২ ইংরাজীতে ঠাকুরবাড়ীতে আদি সমাজের মাঘোৎসবে একবার গিয়াছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বৃদ্ধ বয়সে দেখিয়াছি। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের এক সভায়। দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ কিন্তু শক্ত এবং তেজীয়ান। সত্যেন্দ্রনাথের মুখে রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চনদের তীরে" কবিতাটির আবৃত্তি শুনিয়াছিলাম। ১৯১২ ইংরাজীতে রাঁচীতে ইঁহার পত্নীকে ফিটনে বেড়াইতে দেখিতাম। মোরাবাদী পাহাড়ে টিলার উপরে ইঁহাদের সুন্দর বাড়ী ছিল। তথায় নির্জনে উপাসনার জন্য একটি ছোট মন্দিরও ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথকে মাঘোৎসবে আচার্যের বেদীতে দেখিয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে দুই তিনবার সভাসমিতিতে দেখিয়াছি। স্টার থিয়েটারে অনুরুদ্ধ হইয়া বিখ্যাত গান "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না" গানটি গাহিতে শুনিয়াছি। জেনারেল এসেমব্লি কলেজ হলে দুইটি প্রবন্ধ পাঠও শুনিয়াছি। একবার সিলেট গিয়াছিলেন। আমার ভগ্নীর শ্বশুর গোবিন্দনারায়ণ সিংহ মজুমদারের অতিথি ছিলেন, তথায় আমার এক শিশু ভাগিনার নামাকরণ করেন শুভব্রত। আমি তখন গ্রামে। আমার সতীর্থ দেবব্রত মুখার্জী রবীন্দ্রনাথের নাতজামাই। তাহার বিবাহে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি। নাতিনীর ডাক নাম রাণী, বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথ নাম দেন অংশুরাণী।

পাদটীকা

পূর্ববর্তী "জন্ম" পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট

৮। জাতি বলতে এখানে "বর্ণ" বুঝতে হবে।

৯। "গাবর" শব্দটি ঐ অঞ্চলে আবর্জনা অর্থে ব্যবহার হয়।

১০। শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল"।

১১। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা।

"কলেজে কলিকাতায়" এর পাদটীকা

১। কোনো প্রকার লক্ষ্মীছাড়া।

২। ত্রিশের দশকে।
৩। Key।
৪। এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা বলা হইতেছে।
৫। একটী দৃষ্টান্ত, বিক্রম সারাভাই-এর "প্রাকৃতিক মৃত্যু" (Natural death) —আকাশবাণী)
৬। তখনকার লোকেরা কার্জনকে "কুর্জন দুর্জন" বলিতেন।
৭। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র শ্রীহট্টসংলগ্ন কাছাড়ের শিলচরে বাংলাভাষা শুনে বলেছিলেন, 'আপনারা অসমীয়ারা তো বেশ বাংলা বলেন"।
৮। তখনকার ক্ষয়রোগ-আতঙ্ক, এখনকার ক্যানসার—আতঙ্কের সহিত তুলনীয়।
৯। প্রকাশ্য রাস্তায় ভদ্র-অভদ্র, পুরুষমহিলা নির্বিশেষে প্লেগ পরীক্ষার নামে উলঙ্গ করার প্রতিবাদে কৃত।
১০। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন নেতা ছিলেন।
১১। গ্রামভাঁটি=সামাজিক চাঁদা (মেয়েদের শয্যাতোলানীর অনুরূপ, ছেলেদের প্রাপ্য।)
১২। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন।
১৩। Diving Board.
১৪। জেলিজাতীয় খাদ্যে ব্যবহৃত জিলাটিনের প্রকারভেদ।
১৫। Departmental store (Super market.)

গ্রাম্য-জমিদার
(১৯০৭—১৯২৫ ইং)

১৯০৬ ইংরাজীর নভেম্বরে বি. এল. পরীক্ষার পর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আমার বিবাহ হয়। আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর কাকা, মা, বড় পিসীমা কলিকাতায় আসিলেন। তখনকার রীতিমত, স্ত্রীর বয়স চোদ্দ বৎসর, আমার ছাব্বিশ। স্ত্রী বেথুন স্কুলে তিন-চার বৎসর পড়িয়াছেন। ঘর সংসারের কাজে, কি কোন বিষয়ে স্ত্রীর শিক্ষার অভাব বোধ করি নাই। বিদ্যার দরকার রোজগারে। শিক্ষা ও বিদ্যা এক নহে।

আমার ভাবী ভায়রাভাই বিলাত ফেরৎ ব্যারিস্টার। আমরা ইহা ধর্তব্যই মনে করি নাই। কিন্তু আমার এক প্রাচীন আত্মীয় আপত্তি করিলেন। তিনি প্রাচীনপন্থী ; দেশে বাবাকে জানাইয়া উস্কাইলেন। বাবা অমত করিলেন। কিন্তু মা ও কাকা শক্ত রহিলেন। এত অগ্রসর হইয়া পিছানো যায় না। পিসীমা ও আমার অন্তরঙ্গ পিসতুতো ভগ্নীও সহায়ক হইলেন। প্রাচীনপন্থী আত্মীয়টি দেশে চলিয়া গেলেন।

বিবাহের পরদিন কনেপক্ষ আমার ভগ্নীপতি সূর্যবাবুকে বলিলেন এত গোলমালের পর তাঁহাদের নানা আশঙ্কা হইতেছে। সূর্যবাবু উত্তর দিলেন—'পাত্র দেখিয়া সম্বন্ধ করিয়াছেন, জমিদারী দেখিয়া নহে। পাত্রের উপর নির্ভর করুন।" তাঁহাদের আশঙ্কা দূর হইল। খুড়ামহাশয় বাবাকে চিঠি লিখিয়া শান্ত করিলেন। বাবা বধূকে প্রীতভাবেই গ্রহণ করিলেন। কেবল 'সমাজপতি' হিসাবে নিজ মর্যাদা রক্ষার্থ উপযাচক হইয়া অন্য গ্রামের সমাজ ডাকাইয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহা করা হইয়াছিল। এম. এ. পাঠকালে ভাসা ভাসা জ্ঞান হয় যে, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব গভীর এবং ঐ সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। স্কুল কলেজের "সর্ফার ফরফরায়তে১"—এই জ্ঞানের পরখ করা আবশ্যক বুঝিয়াছিলাম। এই কারণে আমি সংস্কার—বিবাহের অনুষ্ঠানে রাজী হইয়াছিলাম। এখন হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগিতা, অধিক অনুভব করি। তবু জ্ঞান যে খুব স্পষ্ট তাহা বলিতে পারি না। হয়ত সকলেরই অস্পষ্ট থাকে। **The Eternal Search. !**

কয়েক মাস পরে শ্রীহট্ট 'বার'এ ভর্তি হইলাম। কয়েক মাস মাত্র ওকালতী করিয়াছি। নিজেদের দুইটি দেওয়ানী মোকদ্দমা (সিনিয়র সহযোগে) এবং মক্কেলের দুই-তিনটি মোকদ্দমা করিয়াছিলাম। প্রাচীন উকীল নবকৃষ্ণ ব্যানার্জি —বাড়ী কৃষ্ণনগর—একদিন ঠাট্টা করিয়াছিলেন, "তোমার দাদামহাশয়ের ('ব্রজনাথ চৌধুরী) মত তোমার আরজি অতি সংক্ষিপ্ত ও non-commital."।

অতি সংক্ষেপ করা, এমন কি মধ্যপদলোপ—Suspended Middle এর জন্য বন্ধুমহল অনুযোগ করেন। পাঠক তাহার প্রমাণ নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পাইয়াছেন। বোধহয় আমার মনের গতি হাতের চেয়ে দ্রুত।

একদিন একজন নামজাদা উকীলকে এক আইনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। তিনি বিশেষ না ভাবিয়াই একটা উত্তর দেন, খেয়াল করেন নাই প্রশ্নটি জটিল। অনেকগুলি নজীর ঘাঁটিয়া তাঁহার ভুল বাহির করিয়া দেখাইলে পর খুড়া মহাশয় বলিয়াছিলেন, হয়ত কালে ভালো উকীল হইতে পারি। "হতে পারতুম, ইচ্ছে করলে"—আলোচনা নিষ্ফল। এইটুকু জানি—Law and politics are hard taskmasters.—আমার constitution দুয়েরই অযোগ্য।

বছরখানেকের মধ্যে বাবা হঠাৎ স্ট্রোক-এ মারা গেলেন। ইতিমধ্যে হাই-কোর্টে প্র্যাকটিস করিব মনে করিয়া আমি সিটি কলেজে ইকনমিক্সের লেকচারার পদও লইয়াছিলাম। বাবা মারা যাওয়ায় আমার মাস্টারী ও ওকালতী, কোনটাই হইল না। আবার চলিলাম গ্রামে,—প্রজা ঠেঙ্গাইতে। সকলের দৃষ্টি আমার দিকে! ছাব্বিশ বৎসরের বালক জমিদার—ছোঁড়া করবে কি?

তখন সিলেটের জমিদার শ্রেণীতে নামকরা গ্র্যাজুয়েট কেহ ছিল না। Fame preceded me.। এটা ছিল আমার পক্ষে সুবিধা। ইতিমধ্যে লাট ফুলার সাহেব কাকাকে বলিয়াছিলেন, আমাকে ভালো চাকুরী দিবেন। লই নাই। এও একটা যশ।

১৮৯৭ ইংরাজীর ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ বাড়ীটি, কলেজে পঠদ্দশায় আমার তত্ত্বাবধানে ও পরিকল্পনায় নির্মাণ করাইয়াছিলাম। এই কাজে আমার একমাত্র সম্বল ছিল, Roorkee Treatise in Buildings and Materials. আর Molesworthe's Engineering Formulae। অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু কাহারও পরামর্শ লই নাই। একটী অট্টালিকার ডিজাইন ভালো হয় নাই। তবে একটির গঠন প্রশংসা লাভ করিয়াছে। একটি মধ্যবৃত্তি পড়া তীক্ষ্নবুদ্ধি রাজ-মিস্ত্রী (বাড়ী সরাইল) বহু বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। নাম ধনঞ্জয়, গেঁজেল ছিল।

পাঠ্যাবস্থায় সমগ্র জমিদারী জরিপের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলাম। অবসরপ্রাপ্ত কানুনগো এক আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে, পনেরো-ষোলজন আমিন নিযুক্ত করিয়া ছয়-সাত বৎসরে সমগ্র জমিদারী জরিপ শেষ হয়। তাহা ব্যয়-বহুল হইলেও খুব কার্যকরী হইয়াছে। আসামের তৎকালীন ডি. এল. আর. আমার জরিপ-প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন।

দাদামহাশয়ের আমলে তহশীলদারগণ পরগণার জমিদারীতে বৎসরে দুই এক মাস গিয়া খাজনা আদায় করিত; বাকী সময় আমাদের বাড়ীতেই বসিয়া

খাইত। কিন্তু পরে ইহাদের সদরে থাকা কমিয়া যায় ; নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিত। ইহাতে তাহাদের কাজের উপর দৃষ্টি রাখা কঠিন হয়। রীতিমত নিকাশ না দেওয়া ও সামান্য অর্থ তছরূপ চলিতেছিল। এক বৎসরের মধ্যে অকর্মণ্য অর্ধেক সংখ্যক তহশীলদার বরখাস্ত করিয়া নূতন লোক নিয়োগ করিলাম এবং পরগণাকে ডিহিতে বিভক্ত করিয়া স্থায়ী কাছারী-বাড়ী স্থাপন করিলাম। অবশ্য দূরস্থ দুইটি কাছারী বাড়ী পূর্বাপরই আছে। ইহাতে ব্যয় বাড়িল বটে, তবে কাজের শৃঙ্খলা ও ভালো আমদানী হইতে লাগিল।

আত্মীয়স্বজনগণ ও পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারীগণ একটু ভীতই হইয়াছিলেন ;—going too fast.। দীর্ঘসূত্রিতা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। দৈনিক আট ঘণ্টা পরিশ্রমে পাক্ষিক রিটার্ণ (জরিপ ইত্যাদি) পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন এবং নামমাত্র ত্রুটীতে কড়া বকুনি—ইহাতে "প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার" আখ্যায় Prestige লাভ করিয়াছি। ১৯৩২ ইংরাজীতে সুভাষবাবুর সুনামগঞ্জ সফরকালে মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকেল বোর্ড তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও একটী মানপত্র লাভ ঘটে। ইহাতে আমাকে এককালের "প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার" বলায় সুভাষবাবু হাসিয়াছিলেন। বিদেশী শাসকের Prestige-এর ধুয়াকে কংগ্রেস যতই ঠাট্টা করুক না কেন, Prestige ভিন্ন, কেবল চুলচেরা ন্যায়যুক্তিতে শাসন চলিতে পারে না। আসাম কাউন্সিলে কংগ্রেস দলের নেতা হইয়াও কাউন্সিলে ইহা আমি স্বীকার করিয়াছি। বর্তমান কংগ্রেস শাসকগণ এখন স্বীকার করিবেন।

সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা আমাদের পরিবারের মজ্জাগত। খুড়ামহাশয় ছিলেন নিখুঁত। আমাদের দেশের লোক এখন "ঢিমে তেতালা"। পূর্বে এরূপ ছিল না। প্রপিতামহের দলিলাদির শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। দেরী বা ভুলভ্রান্তি দেখিলে মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। ডাঃ বিধান রায় বলিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সকলেরই nerves high strung ; স্ত্রী ঠাট্টা করেন,"তোমার বিলাতে জন্মানো উচিত ছিল।"

আমাদের পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা ও ব্যাপারস্যাপারে সংগঠন শক্তির খ্যাতি আছে। কোনও হৈ চৈ, গোলমাল হইবে না। সকলে চুপচাপ যে যার নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইবে। সাত আট হাজার লোক খাইয়াছে, ১০০।১২৫ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত বিদায়—কলের মত কাজ চলিতেছে, কোনও হাঙ্গামা নাই। একটী বিবাহে কন্যাপক্ষের এক চাকর অভিযোগ করে, একবেলা জলখাবার পায় নাই। তখনি তদন্ত করিলাম। পাইয়াও "না" বলিতেছে বিশ্বাস হইল। আবার খাওয়াইতে বলিলাম ; তখন সে সত্যকথা স্বীকার করে।

প্রথম হইতে বৃহৎ খামার করিয়া আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার উপর তত্ত্বাবধান অর্পণ করি। গ্রামের যে সব জমি পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমানেরা পূর্বে ক্রয়

করিয়াছে, ক্রমশঃ সেইগুলি ক্রয় করা ছিল বাবার প্রথম জীবনের পলিসি, যাহাতে অপর গ্রামের কোনওরূপ প্রভাব আমাদের গ্রামে না ঢুকে। এই সকল জমি এবং বাদশাহ হইতে প্রাপ্ত খাস আরাম জমিকে মূলজমি করিয়া বাবা নিজে কয়েক বৎসর চাষবাস করেন। পরে ঐ সব জমি ভাগী পত্তন করেন। ভাগের ধান্য আদায়ের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য আমি পুনরায় খামার পত্তন করি।

সংলগ্ন একটী মৌজায় আমরা ১০।১৫ বৎসর ষোলআনী মালিকরূপে ভোগদখল করিবার পর পূর্ববর্তী মালিকের (যাহার "দেন ডিক্রি", আমরা নিলামের খরিদ্দারগণ হইতে ক্রয় করি) কোনও উত্তরাধিকারীর প্ররোচনায়, সমস্ত প্রজা খাজনার নালিশে আমাদের স্বত্ব দখল সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বসে। এই সব নিরক্ষর প্রজারা জানিত না যে, ঐরূপ অস্বীকারে তাহাদের প্রজাস্বত্ব লোপ পায়। আমি মোকদ্দমা দায়ের করিলে প্রজারা মোট ৮ হাজার বিঘা জমির অংশ, আড়াই শো বিঘার একটি প্লট আমার খাসখামারে ছাড়িয়া দিয়া আপোষ করে।

তিন মাইল দূরবর্তী আমার এক মৌজায় কতক পতিত জমি ছিল। ইহা ঘনকণ্টাকাকীর্ণ থাকায় কেহ পরিষ্কার করিয়া আবাদ করাইতে সাহস করে নাই। আমি হাতী ভাড়া করিয়া হাতী দিয়া মাড়াইয়া ঐ জমি পরিষ্কার করাই।

ঐ সমস্ত জমিতে আমাদের খামারের জমির মধ্যে মোট ৭/৮ শ বিঘা ছিল —আমন ও বুরো ফসল। নদী হইতে মোটর পাম্প সাহায্যে জমিতে জলসেচ আমিই প্রথম করি। এখন বহু গ্রামে সরকার হইতে ঐরূপ পাম্প ভাড়া দেওয়া হয়।

নদীর প্লাবনে প্রায়ই বন্যা হইয়া ফসল ভাসিয়া যায়। আমাদের গ্রামে গড়ে পাঁচ বৎসরে তিনটি ফসল পুরা পাওয়া যায়। ১৯২৩ ইংরাজী হইতে, যখন আসাম কাউন্সিলে ছিলাম, বন্যানিবারণার্থে বহু প্রয়াস পাইয়াছি। ইঞ্জিনীয়ারের স্কীম প্রস্তুত ও খোদ লাট সাহেবের পরিদর্শন সত্বেও আট বৎসরেও ইহার প্রতিকার হয় নাই। এই বিফল চেষ্টায়ও কৃষক বন্ধু বলিয়া পরগণাবাসী হিন্দুমুসলমানের প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম।

একটি নদীর অপর পারে খামারের জমি। মুলীবাঁশের ভেলায় Floating Waggon Ferryতে গাড়ী বোঝাই ধান্য পার করা হয়। আমাদের অঞ্চলে গরুর গাড়ীর প্রচলন নাই। ভৌগোলিক অবস্থা অনুপযোগী। তথাপি পথের কর্দমাক্ত স্থানগুলিতে কাঠের শ্লিপার ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া মোষের গাড়ী চালানো হয়। আমাদের দেশের গরু দুর্বল ও খর্বকায়, গাড়ি টানিতে পারে না। মোষের পালে আবার প্রায়ই মড়ক হয়। আমার ৪০টি মোষ ছিল।

তবে জলাদেশে মহিষ পোষা খুব সহজ, খরচ নাই বলিলেই চলে। ইহারা জলে সাঁতরাইয়া জলজ উদ্ভিদ খায়।

খামারটি ৪৫ বৎসরের। জোতের মূল্যে ও Capital Expenditure ইত্যাদির সামিলে মূলধনের উপর শতকরা বৎসরে ৬ টাকা হইতে ৮ টাকা লাভ নিশ্চিত। ফসল অনিশ্চিত না হইলে খামার যে খুব লাভের তাহাতে সন্দেহ নাই। আসল কথা, সব ব্যবসায়ে পরিচালনার উপযুক্ততাই মূলকথা। বহু দেশী গরু ছাড়াও গোশালে একটি ষাঁড় ও ২।৩টি সিন্ধী গাভী ছিল। দেশী গাভী দৈনিক এক সেরের বেশী দুধ দেয় না। মূল্য বেশী হইলেও সিন্ধী গাভীর বেলাও ঐ একই ব্যাপার। দেশের লোকের কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা নাই। ঘাস জন্মিবার জন্য পতিত জমি সংকীর্ণ হইয়াছে, ফলে দেশে ক্রমশঃ গরুর সংখ্যা কমিতেছে—দুধও কমিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর আগের তুলনায় এখন গ্রামে অর্ধেক দুধ হয় মাত্র। ঘি প্রচুর ছিল, দাম এক টাকা সের ; এখন তাহা ৬ টাকায়ও দুষ্প্রাপ্য!

বিষয় হাতে নিয়াই দেখিলাম বাবার আমলের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—দুইশত হইতে পাঁচশত টাকার—তমসুকের পাওনা বহুকাল যাবৎ জমিয়াছে। বাপের দেওয়া ঋণ পুত্র আদায় করিতে পারে না, কারণ খাতকের আর্থিক অবস্থা ও চরিত্র, সাধারণতঃ, পুত্রের জানা থাকে না। সেজন্য তাড়াতাড়ি অনেক সুদ ছাড়িয়া ঋণ আদায় করিলাম। গড়ে বৎসরে ৬ টাকার বেশী সুদ পাই নাই। তারপর বড় বড় খতগুলির টাকা ১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধের পূর্বেই আদায় করিয়া ফেলিলাম। সেই যুদ্ধের পর হইতেই মহাজনেরা আর প্রাপ্য আদায় করিতে পারিতেছেন না। দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে, তদুপরি আছে দেনা আদায়ের৪ কর্তব্যবোধের লোপ। নূতন নূতন আইন এবং নানান ফন্দী আবিষ্কৃত হইতেছে। বাংলার কোনও মন্ত্রী Agriculturist Debtor Act-এ (যাহা ক্ষুদ্র চাষীর সুবিধার জন্য) Relief প্রার্থী হইয়াছিলেন! সালিশীগণ, প্রাচীন হিন্দু আইনে সুদ আসলের অতিরিক্ত হইবে না, এই ধুয়া তুলিয়া অনুরূপ আইন পাশ করান। আমি জানি, বাংলার এক বড় ধনী, এক বড় জমিদারকে টাকা দিয়াছিলেন মাত্র ৬ টাকা সুদে। ঐ খত সত্তর বৎসরের ঊর্ধ্বে—অর্থাৎ মহাজন আর সুদ পাইবেন না। তিনি খাতকের স্বার্থে এতদিন জমিদারী নিলাম করিয়া টাকা আদায় করেন নাই। এইরূপ আইন হইলেও, ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে, দীর্ঘমেয়াদী ঋণে ও ব্যবসায়ে, ইহা চলিতে পারে না। সালিশীদের মনের কোণে আছে কম্যুনিজম্। "মহাজনদের ঋণ আদায় করার দাবী নাই", সাহস করিয়া তাহা বলিবার সময়ও আসে নাই। ফল,—দেশের সর্বসাধারণের চরিত্র নাশ। ভীরুতা, দুর্বলতা আসিয়াছে। চোরের চরিত্র অপেক্ষা সাহসী ডাকাতের চরিত্র ভাল।

দেখিতে পাইলাম, বাবার দুইটি মহাজনী তহবিল ছিল। এক "সরকারী" অপরটি "নিজ"। একটু আশ্চর্য হইলাম যে, যৌথ পরিবারে বাবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে! দাদামহাশয় তাঁহার নামে একটী মৌজার অংশ দানপত্র করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহা যৌথ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। সরকার কাকার নিকট ইহার ইতিবৃত্তের খোঁজ নিলাম।

বাবা অল্পবয়সে পড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে গৃহস্থালী তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সময় তিনি তিনটি মেষ ক্রয় করেন। ইহাদের সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পাইয়া বেশ একটি বড় দল হয়। দাদামহাশয় যখন সহর হইতে বাড়ী আসিলেন তখন বাড়ী ময়লা করে বলিয়া এই মেষগুলি অপছন্দ করেন। তখন ঐগুলি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা বাবা "নিজ" তহবিল নামে লগ্নী করেন। ইহা বিচক্ষণতায়, লেনদেনে বৃদ্ধি পাইয়া একটি বৃহৎ অঙ্কে পরিণত হইয়াছিল। পিতার ঋণ, পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি না থাকিলেও আদায় দিতেই হইবে--ঋণ আদায়কালে সাধারণ হিন্দু প্রজার এই ধর্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছিলাম। বহু ক্লেশে ইহারা অন্ততঃ আসল টাকা আদায় দিবেই। সি. আর. দাশ বাংলায় আশ্চর্য ব্যক্তি নন, সহরবাসী ইহা জানিয়া রাখুন! আজ চল্লিশ বৎসর পরে সবই একাকার। এখন অবশ্য নাগরিক, গ্রাম্য, সবই সভ্য!

আমার দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় স্ত্রী ৬ মাস পিত্রালয়ে ছিলেন। এই সুযোগে রাত্রি জাগিয়া জমিদারীর সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। ছয় মাস রাত্রি নয়টা হইতে বারটা, একটা পর্যন্ত জাগিতে হয়। সমস্ত আমার কণ্ঠাগ্রে ছিল।

একটী হাটে আমার যোলআনা দখল অস্বীকারে মোকদ্দমা হইল। তখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লেখা এক দারোগার ক্ষুদ্র একখানা চিঠি আদালতে দাখিল করিয়া মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছিলাম।

অপর একটী "দেনডিক্রি-নিলামী সার্টিফিকেট"-এর সর্বশেষ তপশীলে লেখা ছিল—বিল গাঙ্গনী ১নং তাং—আর কোন বিবরণ নাই, মৌজা উল্লেখ নাই। প্রাচীন কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা আমার দখলে নাই কেন?" একজন বলিলেন যে, রেজিস্টারীর সুবিধার জন্য মূল খতে নিরর্থক ইহা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। খবর লইলাম, বিল গাঙ্গনী ও চর গাঙ্গনী নামে বিল ৬০ মাইল দূরবর্তী মশাসুলি মৌজায় বিদ্যমান। মোকদ্দমা করিয়া গাঙ্গনী বিল মাত্র পাইয়াছি ; বিলের ধানী জমি পাই নাই, চর গাঙ্গনীও পাই নাই। বিলটি বেশ মূল্যবান।

বাইসপেটিয়া নামে আমার জমিদারীর একটি বিল নিয়া বহু সরিকের মধ্যে দাঙ্গা হওয়ার আশঙ্কায় হাকিম ক্রোক করেন। সেই সময় পার্শ্ববর্তী মৌজার কৈবর্তগণ হাকিমের নিকট আবেদন করে যে, ঐ বিল তাহাদের

জলকাঠাও নিয়া মাছ মারিবার জন্য স্থানে স্থানে জোত দখল আছে। জমা—জোতপ্রতি দুই টাকা মাত্র। হাকিম ঐ দাবী মঞ্জুর করেন। বিল ক্রোকমুক্ত হওয়ার পরও দশ বৎসর ঐ প্রজারা ঐরূপ দাবী করে। তখন উকীলের শরণাপন্ন হইলাম। পরিষ্কার কিছু কেহ বলিতে পারিলেন না। জলে জোতসত্ব হয় না,—এই দাবীর সাহসে মোকদ্দমা করিয়া ঐ জোতদারদের দাবী উচ্ছেদ করায় বিলের জমা বাড়িয়াছিল।

একটী মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পর্যন্ত হারিয়া মনঃক্ষুন্ন হইয়াছি, যদিও মোকদ্দমার হারজিতে মনে কখনও বড় লাগে নাই।

আজমিরিগঞ্জ বাজারের মধ্যস্থলে পুলিশথানা স্মরণাতীত কাল হইতে। পুলিশ কোনও খাজনা দিত না। লাইসেন্সী বলিয়াই গণ্য করিতাম। সরকার তখন সব থানার দখলীয় জমি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়া আজমিরিগঞ্জ থানার জন্য জমিদখল-সংক্রান্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হাকিম জমির মূল্য সত্তর হাজার এই হিসাব দেওয়ায় সরকার জমিদখল সংক্রান্ত আইনানুগ ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এরপর আমি, তমাদি মেয়াদ বার বৎসর মধ্যে বৎসরে সাতশত টাকার খাজনার দাবী করিয়া, অন্যথায় পনেরো দিনের মধ্যে স্থানত্যাগ করিবার নোটিশ দিলাম। সরিক রায় বাহাদুর খুড়ামহাশয় ও অপর দুই রায় বাহাদুর এই নোটিশে স্বাক্ষর করেন। ডি. সি. ডসন নোটিশ পাইয়া উত্তর দিলেন, —"Is it in serious soberness that three Rai Bahadurs ask me to remove the thana within a fortnight?" ইহার উপযুক্ত উত্তর মোকদ্দমা জিতিয়া দিব মনে করিলাম। পরদিন সরকারী উকীলের নিকট ডসন আমাদের নোটিশের কথা উল্লেখ করায় তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন "অত চটিতেছ কেন? তমাদি নিকটবর্তী। পনেরো দিন সময় দেওয়া ওকালতীকায়দা।"

মোকদ্দমা দায়ের করিলাম। আমি তখন এম. এল. সি.। লাট কার সাহেব ঐ স্থান পরিদর্শনে গিয়া আমার দলের এম. এল. সি. গোপেন্দ্রলাল দাস চৌধুরীকে বলেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে টেলি করিতে। গোপেন্দ্রবাবু লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর টেবিলে বসিয়া টেলিগ্রাফ লেখেন—"His Excellency has asked me to inform you to see him."—

প্রাইভেট সেক্রেটারী আপত্তি করেন—"এতে হবে না। লিখতে হবে to seek an interview."

গোপেন্দ্রবাবু তখন টেলির খসড়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। আমরা স্বরাজ্য দলের লোক, ডাকিলে যাইব—কিন্তু interview seek করি না।

এক বন্ধু সবজজের নিকট বিচার। মোকদ্দমা ধীরে ধীরে চলিল। আমি বিরক্ত হইলাম—বিশেষতঃ যখন শুনিলাম সরকারী উকীল হইতে আদালত

নোট নিয়াছেন। আদালতের বিরুদ্ধে জিলা জজের নিকট এফিডেবিট দিতে আমমোক্তারকে নির্দেশ দিলে আমার উকীল প্রথমে জজ বি. এন. রাও-এর সহিত দেখা করেন। বি. এন. রাও নথি নেওয়াইয়া দেখিলেন সত্যই অপর পক্ষের নোট নথিতে আছে। ইহা বিধিবহির্ভূত। তিনি মোকদ্দমা নিজ ফাইলে নিলেন এবং হাইকোর্টে টেলিগ্রাম করিয়া সবজজকে অকালে রিটায়ার করাইলেন। বি. এন. রাও আমার দাবী তমাদি সাব্যস্ত করিলেন। হাইকোর্টও 'তথাস্তু' বলিলেন। সরকার আমার দাবী পূর্বে স্বীকারপূর্বক জমি গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরে মূল্য দেখিয়া পিছু হটিলেন। এই বিচার ন্যায্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। সবজজ কিন্তু আমার স্বপক্ষে রায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—তথাপি তাঁহাকে সরানোর জন্য আমি দুঃখিত নহি।

পাইলগাঁওয়ে আমার দৈনন্দিন কর্মতালিকা নিম্নলিখিতরূপ ছিল ঃ—

প্রাতে ৭টায় জলযোগান্তে কাছারীবাড়ী। তথায় বারটা-একটা এমনকি প্রয়োজনবোধে দুইটা পর্যন্ত কাজ। একদিন এক খাতকের কাছে, খতের সুদ মাসিক শতকরা এক টাকা স্থলে দশআনা ধরিয়া একশত প'য়ষট্টি টাকা দাবী করিলে সে খুসী হইয়া রাজী হয়। কিন্তু টাকা দিবার সময় ভগ্নাংশ পাঁচ টাকা সে কিছুতেই দিবে না। সামান্য রেয়াৎ কৈবলৎ চাওয়ার এই যে বদস্বভাব তাহা আমার বিরক্তিকর। এর বহুগুণ দাবী ইতিপূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছি। আমি দরাদরি পছন্দ করি না। এরূপ স্থলে দৃঢ় হইলে কাজের ও জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হয়। ছেঁচড়া স্বভাব সংশোধন হয়। আমি জেদ ধরিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বেলা তিনটার সময় সে পাঁচ টাকা দেয়, তখন আমি স্নানাহারে যাই।

দ্বিপ্রহরে অন্দরমহলে বিশ্রামান্তে (প্রায়ই নিদ্রা যাইতাম) আবার চারিটা, সাড়ে চারিটায় কাছারী বাড়ীতে ; সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করিতাম। সন্ধ্যায় আধঘণ্টা পুকুরপাড়ে পায়চারী করিয়া আবার নাজিরখানায়। রাত্রি আটটায় হিসাব তহবিল দেখিয়া নাজিরের হাতে পাঁচশত টাকার বেশী জমিলেই তাহা Reserve Treasury৭-তে নিয়া ব্যাঙ্কে পাঠাইতাম। অনেকদিন নাজির আপত্তি করিত, পরদিন খরচ কি করিয়া চলিবে ? আপত্তি নিতাম না, আদায়ের তাগিদে পেয়াদা পাঠাইবে। সচ্ছল হইলে, হাতে টাকা থাকিলে উপার্জনের চেষ্টা মানুষমাত্রেরই কমিবে! এইটি সঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। এই বিশ বৎসরে মোট নীট আয়ের অর্ধেক এইরূপে সঞ্চয় করিয়াছিলাম।

প্রজারা জমিদারের সঙ্গে বা নিজেদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ নিয়া প্রায়ই আসিত। সদর নায়েব ইহাদের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ টুকিয়া পেশ করিলে পর সাক্ষীদের ডাকিয়া জেরা করিয়া, নিরর্থক ভূমিকা ও অনাবশ্যক বর্ণনা এড়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমার ফয়সালা করিতাম। বিচারে প্রজা সন্তুষ্ট

হইত এমনকি আমার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়েও। স্বজন নহে এরূপ কৃষক ও তালুকদারদের সালিশী বিচার করিতাম। অকারণে মামলা এড়াইবার জন্য নিয়ম ছিল—প্রজাদের মধ্যে বিরোধে মাত্র এক টাকা ফিস্ দিতে হইবে। কর্মচারী যাহাতে কোনও পক্ষের ওকালতী করিয়া রোজগার না করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতাম। সদর নায়েব ভিন্ন অপর কোন কর্মচারীকে পারত-পক্ষে সামনে রাখিতাম না। এবং আমি যে কর্মচারীদের উক্তির প্রতি একেবারেই মনোযোগী নহি তাহা সাক্ষীদের বুঝিতে দিতাম।

খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই দুই মুসলমান প্রজার বাড়ীর মধ্যস্থিত বাঁশ-ঝাড় জমিদারী জরিপে খুড়তুতো ভাই-এর অংশে দৃষ্ট হয়। এই বিরোধে গ্রামের মাতব্বরগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া উভয় পক্ষেই সাক্ষ্য দেন। ভাল লোকের মৌখিক সাক্ষ্য উভয় দিকেই। অগত্যা 'আইনজ্ঞানী জমিদার' জরিপে দলিলের প্রাধান্য দিয়া রায় দিলেন।

জ্যাঠতুতো ভাই তখন বলিয়া গেল "বাবু, বিচার ঠিক হয় নাই। হক আমার।" আমি শঙ্কাতুর হইলাম। রাত্রে অনেকক্ষণ কথাটা ভাবিতেছিলাম। পরদিন শুনি জোর করিয়া বাঁশ কাটাইতে গিয়া বাধা পাওয়ার ফলে জ্যাঠতুতো ভাই খুড়তুতো ভাইকে খুন করিয়াছে। বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এই বিষয়টি বহুদিন মনকে তোলপাড় করিয়াছে। প্রবোধ দিয়াছি খুড়তুতো ভাই আমিনকে ঘুষ দেওয়ার পাপের ফল পাইয়াছে কিন্তু জ্যাঠ-তুতো ভাই-এর অপরাধ কি?

অপরের পাওনা যেমন কড়াক্রান্তি তৎক্ষণাৎ শোধ দিতাম নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ কড়া ছিলাম। শিথিল সমাজে অবশ্য ইহাতে বদনাম হয়। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত আইনের ছাত্র। আইনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উচ্চধারণা ছিল। তদনুযায়ী কয়েকটি বিরোধে কড়া, নির্মম ব্যবহার করিয়াছি আমার হকের দোহাই দিয়া। এখন ভাবি ন্যায়বিচার অপেক্ষা করুণা বড় কি না। কিন্তু বৈষয়িক ক্ষেত্রে করুণা সব সময়ে বড় হইলে সংসার চলিবে কি না তাহাও বিবেচ্য।

আমার জমিদারীর এক নির্জন প্রান্তরে একটি নূতন গ্রাম বসে। গ্রামে আট দশ ঘর লোক। ইহারা ডাকাতি করিয়া খাইত। উঠাইবার ফন্দি পাই না। সর্দার গরীবউল্লা একবার ডাকাতি মামলায় বহুদিন জেলে থাকায় খাজনার নালিশ করিয়া ইহাকে উচ্ছেদ করিলাম। তখন গ্রামটি উঠিয়া যায়।

আমার একটি কর্মচারীর পূর্বপুরুষ আমার পিতামহ হইতে কতক পতিত ভূমি চাষের লীজ নিয়া কিছু নিজে চাষ করে, কিছু প্রজাবিলি করে। জমি সামান্য। কর্মচারীটি কাজের গাফিলতি এবং তহবিল তছরূপ করিত। তাহার লীজের মেয়াদ অতীত হইলে খাসদখলের মোকদ্দমা করি। তাহার খাস-

জমি আমি পাইলাম কারণ সে জোতস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা নহে। ইহা তাহার বড় ক্ষতির কারণ হইয়াছিল এবং আমার জিলাব্যাপী অখ্যাতিও হইয়াছিল।

সমাজসভা—আমার সময়ে পূর্বকথিত পরগণা সমাজের সভা আমার বাড়ীতে দুই তিনবার বসিয়াছে। একটি বিষয় ছিল—যদিচ আমরা মাহিষ্য দাস চাকরদের জলাচরণ করি (অর্থাৎ তাহাদের হাতে জল খাই) তথাপি আমাদের পুরোহিতগণ দাসের পুরোহিতগণের সঙ্গে একঘরে বসিয়া খান না—ইহা অসমঞ্জস।

ব্যবস্থাপক পণ্ডিতপ্রধান প্রবীণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শাস্ত্রের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন—বর্তমানে ব্রাহ্মণের ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত, আমাদের জলাচরণ অশাস্ত্রীয়। তথাপি রাজার স্থানাধিকারী আমরা, যদি সমাজ পরিচালনার সৌকর্য্যার্থে জলাচরণ করিতে থাকি তো তাঁহারা সামাজিক প্রয়োজন বোধে মানিয়া লইবেন কিন্তু ব্রাহ্মণকে দাস পুরোহিতের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আহারের ব্যবস্থা দিতে পারেন না। তথাপি আমাদের প্ররোচনায় পুরোহিত যদি ঐ রূপ আহার করেন তখন শক্তি বুঝিয়া সমগ্র কি খণ্ড ব্রাহ্মণসমাজ যথাসম্ভব বিহিত করিবেন।

যদিও আমার ইচ্ছার বিপরীত বিধান দিয়াছেন তথাপি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্ঞান ও চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হইয়াছিল। শেষ জীবনে এই সাত্ত্বিক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ অভাবের পীড়নে আশী বৎসর বয়সে আমার চা-বাগানে তাঁহার দৌহিত্রের বাসায় মারা যান। দৌহিত্র বাগানের লরী ড্রাইভার। তাহাকে সকলেই 'ঠাকুরমহাশয়' সম্বোধন করে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবন বর্তমানে বিলীয়মান হিন্দুসমাজের প্রতিবিম্ব মাত্র।

আমার সময়ে গ্রামের ভিতরে দলাদলি খুব কম হইয়াছে। জ্ঞাতিরা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রামের দলাদলির "একঘরে"—প্রকাশ্যভাবে একত্র ভোজন নিষেধমাত্র—অন্য কিছুতে বাধা নাই। নাপিত ধোপা বন্ধ হয় না কারণ উভয় দলের পৃথক নাপিত ধোপা আছে। গ্রামের বাহিরে নিমন্ত্রণে একত্র খাওয়ার বাধা নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা নীতিগত প্রতিবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু ইঙ্গবঙ্গ সমাজ ইহাকে ফেনাইয়া, 'অকল্পনীয় অত্যাচার' আখ্যা দিয়াছেন। (বিপিন পালের জীবনীতে তাঁহার প্রতি পিতার ব্যবহারই আমার কথার প্রমাণ।)

রাত্রে সময় সময় অনঙ্গবাবু দ্বারিকাকাকার সহিত তাসপাশা খেলিয়া একত্রে আহারাদি করিতাম। গ্রামে উচ্চশিক্ষিত অন্য কেহ না থাকায় আড্ডা ছোট ছিল। দুই একজন কর্মচারী পাশায় যোগ দিত। একদিন একটি কর্মচারীর

নিকট খেলায় বার বার হারিয়া জিদে বাজী রাখিয়া হারিয়াছিলাম। ঐ টাকায় ঠাকুরের প্রসাদ খিচুড়ী, পায়েস, মালপোয়া খাওয়া হয়।

গৃহবিগ্রহের সাজসজ্জা নিজের তত্ত্বাবধানে করাইতাম। মাঝে মাঝে বিশেষ ভোগও দেওয়া হইত। পার্শ্ববর্তী হিন্দু প্রজা অপ্রজা সময় সময় দেবতার ভেট আনিত। ক্ষেতের নূতন চাল, নূতন গাভীর দুধ, বাড়ীর নূতন ফলাদি, প্রজারা মামলায় আসিলে কলা কমলা ইত্যাদি ভেট আনিত। দুর্গাপূজার সময় মাতব্বর মুসলমান প্রজারাও কলার ছড়ি আনিত। ইহা সামাজিক যোগব্যবস্থা। এখন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গেই যোগ কমিতেছে।

বাবা বর্তমানে যখন ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাটী পুনর্নির্মাণে হাত দেই তখন বাড়ী বিস্তারের ইচ্ছা করি। মাটী ভরাট করিয়া বাড়ী করিতে হয় কারণ মাঠে বর্ষাকালে তিনচার হাত জল হয়। সেকালের ধরণে তিন মহল বাড়ী ; বাহির ও মধ্যখণ্ডের মধ্যে পুরাতন পুকুরের মধ্য দিয়া সড়ক নির্মাণ করিয়া যোগাযোগের পথ হয়। এই পুকুর ভরাট করিতে হইবে। জ্ঞাতিদের দখলী সাবেক পুরান বাড়ীর বৃহৎ পুকুর (বারো বিঘা) তখন প্রায় ভরাট। প্রস্তাব করিলাম আমাদের ব্যয়ে এই পুকুর পুনরায় কাটাইয়া রীতিমত পাড় ভরাট করিয়া অবশিষ্ট মাটী আমার বাড়ীর জন্য নিব। অপমানবোধে এক জ্ঞাতি রাজী হইলেন না। এরপর পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে ঐ পুকুর সংস্কার হয় নাই। একবার সামান্য পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল।

ওরেন্টাইন ও কোপেটের—একটি সচিত্র ক্যাটালগ গ্রামের একটি কলমিস্ত্রী ভারত দে আমার হাতে দেয়। Light tramway সম্বন্ধে ঐ ফার্মকে পত্র দিয়া ½ মাইল ট্রামের লাইন ও চারখানা টিপ্‌লিং ওয়াগন আনাইয়া মাঠে পুকুর কাটাইয়া মাটী আনাই। খুব কম খরচ পড়িয়াছিল।

একবার (সম্ভবতঃ ১৯০৯) বন্যার সময় আমাদের থানায় টেস্ট রিলিফের কাজ শুরু হয়। আমার অনুমতি না লইয়া এবং নোটিশ না দিয়া নূতন সব-ডেপুটী সুরেন্দ্র চৌধুরী আমার জায়গা দিয়া সড়ক কাটাইতে আরম্ভ করিলে আমি নোটিশ দিই যে পনেরো দিন মধ্যে সড়ক ভাঙিয়া পূর্বাবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এস. ডি. ও. এবং ডি. সি. খবর পাইয়া শঙ্কিত ; বে-আইনী করিয়া ফেলিয়াছেন। ডি. সি. কাকা (সুখময় চৌধুরী)-কে ধরিলেন। এস. ডি. ও. আমাদের বাড়ী আসিলেন। কাকার সাক্ষাতে তাঁহার সহিত একটা আপোষ হইল।

আজকালকার রাজপুরুষগণ ভুলভ্রান্তির জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক বরং আমাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সময় আমার ট্রামওয়ে দেখিয়া এস ডি. ও. কনকলাল বড়ুয়া অনুরূপ উপায়ে সুনামগঞ্জ শহর ভরাট করেন।

শ্রীহট্ট জেলার জমিদারগণ বেশী প্রজা উৎপীড়ন করেন নাই বরং প্রজাই শরিকী বিরোধের সুযোগ নিয়া জমিদারদের উপর উৎপীড়ন করিয়াছে—তাহার প্রমাণ হাওরের নতুন আবাদী বহু জমির বহুকাল করই ধার্য হয় নাই। শরিকী মহাল ছাড়াও ষোলআনী মহালে প্রজা বৎসর বৎসর খাজনা আদায় দেয় না। শ্রীহট্টে গড়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের খাজনা বকেয়া থাকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ওকালতীতেও যখন জমিদারদের প্রতারক ও অত্যাচারী এই দুর্নাম দূর হয় নাই সেখানে আমার উক্তি ধৃষ্টতা গণ্য হইবে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অদ্যকার প্রধান জমিদারদ্বেষীগণের পূর্বপুরুষ এককালে জমিদার ছিলেন। জ্ঞাতিহিংসা তাঁহাদের মনস্তত্ব কি না নিজেরা চিন্তা করিবেন।

নিজে জমিদার হইয়াও আমিই সর্বপ্রথম ১৯২৩ ইংরাজীতে রাজস্বসচিব স্যার উইলিয়াম রীডসাহেবের নিকট জমিদারী বিলোপের প্রস্তাব করি। এর পূর্বে কেহ এরূপ প্রস্তাব করেন নাই। বলিয়াছিলাম "You are pouring new wines into old bottle."

সাম্যবাদ ডিমোক্রেসীর সঙ্গে জমিদারী খাপ খায় না। আমার প্রস্তাব ছিল চল্লিশ বৎসর এনুয়িটী (তৎকালীন আয় অপেক্ষা সামান্য কম)। বৎসরে ২—২½% কমাইয়া দেওয়া যাইবে।

এতদিনে ব্যাপার প্রায় শেষ হইয়া যাইত। জমিদারদেরও ক্লেশ হইত না। একই প্রস্তাব ১৯৪৭ ইংরাজীতে ঢাকায় তফজ্জুল আলীর নিকট করিয়াছিলাম। উত্তর দিলেন—'প্রস্তাবটি ভাল। কিন্তু দেরী হইয়া গিয়াছে'।

গার্হস্থ্যনীতি—আমার অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি গৃহস্থের এই তিনটি নীতি স্মরণ রাখা কর্তব্য—

১। Golden mean is the law of life, সর্বমত্যন্তগর্হিতম্।
নিঃশেষে দান,—চরমপন্থা—পরিত্যাজ্য।

২। Do today whatever you can do to-day. Never put off.৮

৩। A place for everything and every thing in its place.

বৈষয়িক জীবনে এই তিনটি ভিন্ন নীতি নাই। দরকারও নাই। স্মরণশক্তি দুর্বল হইলে বিশেষ দিনের করণীয় কাজের নোট রাখিবে। তাহা সর্বদা সঙ্গে রাখিবে। অন্ততঃ প্রাতে একবার দেখিবে। অতি সোজা কথা—সর্ত উপদেশের প্রয়োজন নাই। পোষ্য আত্মীয়স্বজন পরিজনবর্গের দরকারের দিকে আগে দৃষ্টি দিবে—নিজের দিকে দিবে কিন্তু সর্বশেষে। আগের বর্গ ডিঙ্গাইয়া পরের বর্গে যাইবে না। মাকে খাইতে দেয় না—অথচ দেশোদ্ধারী! কর্মযোগী গৃহস্থের প্রধান গুণ শৌর্য, বীর্য, ঐশ্বর্যের উপাসনা। ধনং দেহি, জনং দেহি, বলং দেহি। আরও চাই, জন চাই, শক্তি চাই, যশ চাই। জন্মনিরোধের স্থান নাই। ইহাতে শৌর্যের অভাব, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন

হইতে ভীতি, প্রমাণিত হয়। মুসলমান বা নিম্নশ্রেণীব হিন্দু তত ভীত নয় যতটা ভদ্রলোক। অথচ সন্তানের সংখ্যার উপর দারিদ্র্য বা সাচ্ছল্য নির্ভর করে না তাহা স্পষ্টই দেখিতেছি। প্রজননশক্তি ও আর্থিক ক্ষেত্রে শৌর্যবীর্য একই শক্তির বিকাশ। অল্পবয়সী বিপত্নীক পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন অন্যথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

প্রসিদ্ধ জমিদারগণ

আমাদের সময়ে মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত, রাজা জগতকিশোর, কলিকাতার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যতীন্দ্রমোহন ও প্যারীমোহনকে সভাসমিতিতে সুরেন্দ্রনাথের সহিত হাত মিলাইতে দেখিয়াছি। মহারাজা সূর্যকান্ত বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশীতে অগ্রণী ছিলেন। এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জিদ করিয়া তাঁহার সহরের নদীতীরস্থিত মনোরম বাগানবাটী অন্যায়ভাবে একুই-জিশন করে। রোষে ক্ষোভে নাকি মহারাজা তদবধি মৈমনসিংহ সহরে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার ঐ প্রাসাদ পূর্ববঙ্গে অতুলনীয়। বর্তমানে ইহা পূর্ব-বঙ্গ সরকার নিয়াছেন।

রাজা জগতকিশোরের পুত্র শশীকান্তকে সূর্যকান্ত দত্তক নেন। যখন বিলাতফেরতা ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তখন শশীকান্তের জন্মদাতা পিতা পূর্ববঙ্গের সমাজপতি জগতকিশোর তাঁহাদের 'একঘরে' করেন। কয়েক বৎসর পর মিটমাট হয়।

রাজা জগতকিশোরের সঙ্গে তাঁহার কাশীর বাটীতে ১৯২৪ ইংরাজীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার হাতে সিলেটী মোটা বেতের লাঠিটা দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হয়। লাঠিটি তাঁহার হাতেই ছিল। চলিয়া আসার কালে বলিলেন "আপনার লাঠি নিয়ে যান।"

বলিলাম "লাঠিটি রাজার পছন্দ হইয়াছে।" তিনি বলিলেন "পছন্দ হইয়াছে ঠিক কিন্তু আমার একটিতে চলিবে না। চাই এক আঁটি।" তাঁহাকে এক আঁটি বেত পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার শিকারের এবং ছড়ি প্রভৃতি খুঁটি-নাটি জিনিষের শখ ছিল। শ্রীহট্টে লাউড় পাহাড়ের সানুদেশে প্রতি বৎসর পাখি ও বাঘ শিকারে যাইতেন। সেই উপলক্ষ্যে ভাটিয়ালা৯ জমিদারদের সহিত সখ্য হয়। কাশীতে যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই তখন সকাল সাতটা। তিনি নাতির সহিত বালিতে মল্লযুদ্ধরত। খবর পাঠাইলেন—কিছু দেরী হইবে।

আই. সি. এস. সাহেব প্রায় সকলেই শিকারপ্রিয়। কিন্তু বাঙালী আই. সি. এস. কয়জন শিকারী আছেন? অথচ ইঁহারাই ছিলেন ১৮৯০—১৯২০ পর্যন্ত বাঙালীর আদর্শ: অর্থ প্রতিপত্তিতে অগ্রণী ছিলেন, দেশসেবার বড়াইও করিতেন। মফঃস্বলবাসী আই. সি. এস.-দের শিকারের বহু সুবিধা ছিল বলিয়াই বিশেষভাবে ইঁহাদের উল্লেখ করিলাম। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ সাহেব-দের সব দোষ অনুকরণ করিয়াছেন গুণগুলি পান নাই। মদ-মাংসাশী সাহেব যে গতর খাটাইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করে সে খেয়াল ইঁহাদের ছিল না।

মহারাজা সূর্যকান্তের পরিবারের মৈমনসিংহে একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। ১৯২০ ইংরাজীর গান্ধী-আন্দোলনে এই প্রভাব নষ্ট হয়। তাঁহাদের বাড়ীতে এক বিবাহের দিন অসহযোগের হরতাল ছিল। কংগ্রেস নেতা বিপিন পালকে ধরিয়া তাঁহাদের বরযাত্রীর জন্য কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহ করিতে হয়। ১৯০৫ ইংরাজীর স্বদেশীতে জমিদাররা অগ্রণী ছিলেন। প্রজার উপর প্রভাবও বাড়িয়াছিল। কিন্তু ১৯২০-তে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যোগ না দেওয়ায় প্রভাবপ্রতিপত্তি গেল। পরোক্ষে অনেকে সাহায্য করিতেন। অন্ততঃ বিরুদ্ধা-চরণ, হিন্দুজমিদারদের মধ্যে দুই একজন Black-sheep—ভিন্ন, কেহ করেন নাই। অনেক উকীল প্রথমে কংগ্রেসে যোগ দিয়া নাম করিয়া পরে মন্ত্রীত্ব, সরকারী চাকুরীর প্রলোভনে সরকারপক্ষে গিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। বড় জমিদারের সেই প্রলোভন ছিল না। কিশোরীগোবিন্দ প্রভৃতি কলিকাতার দুই একজন জমিদার মাত্র এইরূপে প্রলোভিত হইয়াছেন।

মফঃস্বলের জমিদাররা লাট-বেলাটের সহিত বড় একটা সাক্ষাৎ করিতেন না, তা উচ্চশিক্ষার (?) অভাবেই হউক বা যে কোনও কারণেই হউক। বাগ-বাজারের পশুপতি বসু, কাশিমবাজারের মণীন্দ্র নন্দী, সাহিত্যিক ও খেলোয়াড় নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ রায় সন্তোষের কবি প্রমথনাথ, হালিম গজনবী প্রভৃতি দৃষ্টান্ত। মণীন্দ্র নন্দী দাতা ছিলেন। স্বদেশী কারবার করিবার জন্য অনেককে টাকা দিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর, সুবোধ মল্লিক প্রভৃতির নাম অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। উকীল ব্যারিস্টার অপেক্ষা জমিদার-দের সরকারের বিপক্ষে যাওয়ার বিপদের ঝুঁকি বেশী! খাজনা আদায় কঠিন হইত, এমনকি জমিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও যে না ছিল তাহা নয়। জমিদার যে সরকারের ইজারাদার—তাহা অনেকে ভুলিয়া যান।

সরকার থানা, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, লোকেল বোর্ড ইত্যাদি প্রবর্তন করেন জমিদারদের প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য। সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি মনে করিতেন, ইহা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতার প্রথম ধাপ। পুলিশ কিন্তু রহিল ইংরাজের হাতে—বিলাতে যেমন কাউন্টি কাউন্সিল ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে। পুলিশ হাতে না থাকিলে লোকেল বোর্ডের দায়িত্বজ্ঞান হয় না—আমার এই

যুক্তি কর্ণেল Smiles (পরে এম. পি.) আসাম কাউন্সিলে সমর্থন করেন। একবার সুনামগঞ্জের হাকিম অভিযোগ করেন, "আপনার থানা জনবহুল কিন্তু সেখান হইতে মোকদ্দমা বড় আসে না, আপনার এলাকা হইতে একেবারেই না" ; আমি বলিলাম, "সরকারের ইহাতে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।" তিনি স্বীকার করিলেন।

গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে বিচার ক্ষমতা দিবার কথা উঠিয়াছে। ইহাতে কিন্তু ফল ভালো হইবে না ; কারণ এইসব পঞ্চায়েত প্রকৃত নেতা নহে (যেমন বি. পি. সি. সি. নেতা নহে) জনগণের মতামতেই নেতা জন্মান, জাল ভোট দ্বারা নয়। কিছু কিছু জমিদার অত্যাচারী হইলেও স্বাভাবিকভাবেই নেতা ছিলেন। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এই প্রসঙ্গে বলিতেন "পেটে খেলে পিঠে সয়", জমিদার-শ্রেণী বর্তমান রাজপুরুষ অপেক্ষা অত্যাচারী ছিলেন না। বাংলার সমাজপতি জমিদাররা যত জনহিতকর গঠনমূলক কাজকর্ম করিয়াছেন তার তুলনায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি কমই করিয়াছেন। বাংলার পণ্ডিত সমাজ, হিন্দু সভ্যতা, মন্দির, মসজিদ, সঙ্গীত চর্চা, শিল্পী, কামার, কুমার, দর্জি, মুচীকে ইহারাই রক্ষা করিয়াছিলেন। "ম্যাজিষ্টর" সভাপতি পরিচালিত লোকেল বোর্ডে জমিদার সভ্যদের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ায় অর্থ, যশ ও বিলাসিতার মোহে জমিদার-তনয় কলিকাতা অভিমুখী হইলে বাংলার গ্রামসভ্যতার অবনতি আরম্ভ। ১৮৯০ ইংরাজী হইতে ইহার সূচনা, ১৯১৪ ইংরাজীতে গ্রাম প্রায় জমিদারশূন্য—all absentee landlords। সাধারণের জমিদারী বিদ্বেষের ইহাই প্রধান কারণ। সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ইহারা তো সমাজের কোন কাজ করেন না, ইহারা খাজনা বা বৃত্তি পাইবেন কেন? অল্প-সংখ্যক লোক গ্রামকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এখন বিষাদগ্রস্ত!

১৯২০-তে লর্ড চেম্‌সফোর্ড Natural leaders জমিদারদের কাউন্সিলে ঢুকিবার পরামর্শ দেন। অনেকে ঢুকিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের অনেকেই কলিকাতাবাসী—অর্থাৎ absentee। সমাজপতি বলিয়া নহে, জমিদার বলিয়া এবং প্রচুর আমলা, কর্মীর এবং টাকার জোরে নির্বাচনে পার হন। জমিদারগণ একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হন। শুনিয়াছি এক এক জনের ত্রিশ হাজার হইতে লাখ টাকা ব্যয় হয়। Natural leaders হইবেন প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। বিধান রায় উদ্বাস্তু জমিদারদের সমবায় কৃষিক্ষেত্রে কর্মচারী করিয়া গ্রাম্যনেতা বানাইতে চাহেন! আজ আর গ্রামে উপযুক্ত ভদ্রশ্রেণী নাই—সব সহরে,—'হাভাতের দলে'। যাহারা আছে তাহারা কাজে অকর্মণ্য। জমিদার মরিয়াছে বহুপূর্বেই—থানা, লোকেল বোর্ড স্থাপনার পর। বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ববলে কয়েকজন ছলে বলে আইন-আদালতকে ফাঁকি দিয়া,—পুলিশ-আদালতভীত সরল প্রজাকে হাতে রাখিয়া টিঁকিয়া ছিলেন। এখন প্রজাই জমিদার চাহে না। গ্রামও এখন

শ্লোগানশাহী দলের দ্বারা পরিচালিত হইবে। বাঙলার জমিদারগণ এককালে, কৃষির উন্নতি, রাস্তাঘাট, পুকুর, করিয়াছেন। গৌরীপুরের জমিদারের একটি পরীক্ষামূলক কৃষিফার্ম ছিল। আমরাও বন্যার রোধের জন্য এক মাইল দীর্ঘ বাঁধ করিয়াছি। সে যুগের ইঙ্গবঙ্গ নেতারা অনেকেই ৫৫ বৎসরের বেশী দীর্ঘজীবী হয়েন নাই। এখন বাঙালী অনেকেই ৬৫।৭০ আয়ু পাইয়া থাকেন।

আমার শিকারের সখ ছিল। কিছুকাল ভ্রাতার বন্দুক ব্যবহার করি। পরে বন্দুকের পাশ চাহিয়া পুলিশ রিপোর্টের দরুণ পাই নাই। তদবধি বন্দুক ধরি নাই।

আসাম গৌরীপুরের জমিদার প্রভাত বড়ুয়া প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন। বাঙলা ভাষাভাষী গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট জিলার বঙ্গভুক্তি বিষয়ে ইঁহার সহিত অনেক পরামর্শ করিয়াছি। ইঁহার পুত্র প্রমথেশ বড়ুয়া বি. এ. পাশ করিয়াই গোয়ালপাড়া প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার জন্য সরকার কর্তৃক জমিদারপক্ষে কাউন্সিল সদস্য মনোনীত হন। পরেশ সোম ও আমি প্রমথেশকে সাহায্য করিতাম বলিয়া স্বরাজ্য দলের 'প্রজাবন্ধু' সদস্যগণ বিরক্ত হইতেন। দল হিসাবে স্বরাজ্যদল প্রজাজমিদার কোনও পক্ষে হেলিবেন না—এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। অসমীয়া সভ্যরা সবই জমিদারবিরোধী, এর কারণ আসামে কোথাও চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা না থাকা এবং জমিদারদের বঙ্গ-ভুক্তি সমর্থন। আমি আবেগের আধিক্যে বক্তৃতায় বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—"Goalpara Zamindaries have been the happy hunting ground for designing Assamese". ইহাতে তরুণ ফুকনের পূর্বপুরুষের কীর্তির প্রতি ইঙ্গিত ছিল। ফুকন গ্যালারীতে ছিলেন। পরে আমাকে বলিলেন "ব্যক্তিগত আক্রমণটা ভাল হয় নাই।" আমি লজ্জিত হইলাম।

প্রমথেশ তীক্ষ্নবুদ্ধি বিষয়ী ছিল। রাজনীতিতে থাকিলে কালে হয় তো ভাল নেতা হইতে পারিত কিন্তু ভাগ্য তাহাকে অন্যপথে পরিচালিত করে।

পূর্বে বলিয়াছি, পূর্ববাঙলার হিন্দু জমিদারদের ন্যায় মুসলমান জমিদার, ক্ষুদ্র মিরাশদার এমন কি বিত্তশালী কৃষকও ঘোড়া ও শিকারপ্রিয় ছিল। সাধারণতঃ হিন্দুরা নিরীহ, রক্তপাতে আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। সিলেটে চল্লিশ বৎসব পূর্বেও ইদগার ময়দানে পালোয়ানের কুস্তি হইত। মুসলমান-দের পাড়ায় পাড়ায় ডনকুস্তির আখড়া ছিল। হিন্দুদের ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও (১৯০০-২) সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধেরাও মনুষ্য প্রমাণ বড় বড় ঘুড়ি লইয়া ঘুড়ির খেলায় যোগ দিতেন। বড় বড় রাস্তার এক দিকের লোক 'রায়-নগরের' দলে, অপর পার্শ্বের লোক 'ধরমপুরী' দলে; তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। শীতকালে সহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ে জাল দিয়া বাঘ আটকাইয়া বর্শা

দ্বারা শিকার হইত। মৃত ব্যাঘ্রের স্বত্বস্বামিত্ব নিয়া দুই জমিদার বা গ্রামের মধ্যে দাঙ্গা, মোকদ্দমাও হইয়াছে। ব্রিটিশ আইনে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট বিধি আছে।

ভ্রমণ

পাইলগাঁও থাকার সময় মধ্যে মধ্যে পুরী, কার্সিয়াং, দারজিলিং, শিমুলতলা, বৈদ্যনাথ, রাচী, পুরুলিয়া ও শিলং গিয়াছি, স্বাস্থ্যলাভ বা বিশ্রামের জন্য। তখন প্রাতে দৈনিক ৬ মাইল হইতে ১০/১৫ মাইল বেড়াইতাম। আমি পর্বত আরোহণপ্রিয়।

দারজিলিং-এর হাওয়া সব চেয়ে স্নিগ্ধ বিশেষভাবে মস্তিষ্কজীবী এবং শিশুদের পক্ষে। দৃশ্য মহান। শিলং-এর দৃশ্য সুন্দর, ছবির মতো। সাহেবেরা ইহাকে uplands বা downs বলেন, hills বলেন না। শীত—গরম কম, আরামদায়ক ; কিন্তু লোক বাড়িয়া সহর নোংরা হওয়ায় এখন আর তত স্বাস্থ্যকর নহে। শুনিলাম যুদ্ধের পর দারজিলিংও নোংরা হইয়াছে। নোংরামি এখন জাতিগত স্বভাব। ৫০/১০০ বৎসর পূর্বে জাতি স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে এত উদাসীন ছিল না।

একদিন দারজিলিং-এর জল-বিদ্যুৎশক্তি কল দেখিতে সাইডারপং (৩ হাজার ফুট নীচে) গিয়া বিপদে পড়িয়াছিলাম। ৬ মাইল খাড়া রাস্তা দৌড়াইয়া নামিলাম। চা বাগানের ভিতর দিয়া শর্টকাট করিয়া নামিলাম মাত্র চল্লিশ মিনিটে। কিন্তু ফিরিতে (উপর দিকে) চার ঘণ্টা লাগিল। হৃৎপিণ্ড বন্ধ হইবার উপক্রম, যেন মৃত্যুর পূর্বাভাস পাইলাম! এক পেয়ালা কড়া চা খাওয়ার পর তন্দ্রা আসিল এবং সুস্থ হইলাম ; হাওয়ার গুণ! সিমলা দারজিলিং-এর সমান উচ্চ হইলেও আবহাওয়া নিকৃষ্ট।

শিমুলতলায় পাহাড়ে ভ্রমণকালে অতি নিকটে বাঘের গন্ধ পাইয়া তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরাইয়া নিঃশব্দে প্রাণ নিয়া ফিরিয়াছিলাম। আর একদিন রেল লাইন পার হইতে দুই-তিন সেকেণ্ডের জন্য দূরপাল্লার মেল ট্রেন-এ চাপা পড়া হইতে বাঁচিয়াছিলাম।

পুরুলিয়া খুব শুকনা, ম্যালেরিয়ার পক্ষে ভালো। "সাহেব বান্ধ" তিন মাইল পরিধি বিশিষ্ট কৃত্রিম এবং সুদৃশ্য হ্রদ। এই সকল বাঁধ দ্বারা আগে পশ্চিমবঙ্গে পানীয় জল ও কৃষির জল সরবরাহ হইত এবং মাছের চাষ হইত।

পুরীতে সমুদ্রে সাঁতরাইতাম। পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ এক বাঙ্গালী সমুদ্রমধ্যে ভাসিয়া সূর্যস্তব করিতেন। পুরীর সমুদ্র-সৈকতে শুইয়া চক্রবৎ ঢেউয়ের গতি দেখিয়া পুনরায় অনুভব করি, "রথস্থং বামনং দৃষ্টবা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"।

পুরীতে এবং দারজিলিং-এ সূর্যোদয়-দৃশ্য ভুলিবার নয়! বর্ণনা করিব না। "The Sunrise১১ (sunshine) is a glorious birth"—না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। নভেম্বর মাসে রাত্রি দুইটার সময় হাঁটিয়া টাইগার হিল-এ গিয়া প্রত্যূষে সূর্যোদয় দেখিয়া সকাল সাতটায় বাড়ী ফিরি। "ওমর খৈয়াম"-এর অনুবাদক কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ আমার প্রতিবেশী ছিলেন। আমি টাইগার হিল হইতে ফিরিতেছি—এ কথা বিশ্বাস করিলেন না কারণ আমার পরণে ছিল ধুতি, গরম গেঞ্জি, ও টুইড কোট, পায়ে পাম্পস্ ও হাফমোজা। বলিলেন "কম্বল ও মদ ছাড়া সেখানে তিষ্ঠানো যায় না।" মদ্যপায়ীদের শীত বেশী!

ভারতের স্বাস্থ্যকর স্থানগুলির জলবায়ু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা না থাকায় ডাক্তাররা নিজ নিজ পছন্দ মতো স্থানে রোগীকে এখানে ওখানে পাঠান। কাহারও টান কাশীর দিকে, কাহারও কার্সিয়াং ইত্যাদি। ডিসপেপ্‌সিয়া রোগীকে ডাক্তার বৈদ্যনাথ যাইতে বলেন কিন্তু স্থানীয় লোকই প্রায় সব ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত!

স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বিশ্রাম, আরাম, আমোদ উপভোগ করিয়াছি; কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক একবার বিভিন্ন স্থানের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আষাঢ়-শ্রাবণে কলিকাতা সবচেয়ে ভালো এবং পূজার ছুটীতে ছুটাছুটি না করিয়া কলিকাতায় দক্ষিণ বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া উপন্যাস পাঠই সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রাম। সম্পাদকের ছুটী পাওয়া কঠিন বটে!

১৯৩৮ ইংরাজীতে রেলে কাশী, প্রয়াগ, এবং মোটরে আজমীর, জয়পুর, বিঠুর, হলদীঘাট, গোয়ালিয়র, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, ডেরাডুন, মুসৌরী, হরিদ্বার, লছমনঝোলা, পর্যন্ত এবং মীরাট হইয়া হস্তিনাপুর গিয়াছি। হিমালয়ের কোলে হৃষীকেশ ক্ষুদ্র, নির্জন, তপস্যার স্থান বটে! ডেরাডুন স্থায়ী বসবাসের উপযোগী। দিল্লী শীতকালে ভালো—বর্ষায় অস্বাস্থ্যকর।

দারজিলিং-এ এক জাপানী আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, "But you could not have made Darjiling like this"। লর্ড কারমাইকেল (বাংলার লাট) বলিতেন, "Leave out 'ji'" অর্থাৎ "Darling" বলিতেন।

আলাপ-পরিচয় প্রসঙ্গে

১৮৯০-তেও গ্রামে তো কথাই নাই সহরেও অপরিচিত কাহারও সঙ্গে বাড়ীতে বা মজলিসে সাক্ষাৎ হইলে আমরা ঔৎসুক্যে উপযাচক হইয়া নাম,

গোত্র, ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। রাস্তায় অবশ্যই সকলের সহিত পরিচিত হওয়া অসম্ভব। বিশেষ কারণে ঔৎসুক্য জন্মিলে জিজ্ঞাসা করা হইত। আমার বয়স তখন নয় বৎসর—গ্রামে আমাদের বাড়ীর সামনা দিয়া "সরে আম"১২ রাস্তার পথিকমাত্রকেই পরিচয়, গন্তব্যস্থান, সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত। এই প্রথা সামাজিক মনের পরিচায়ক—মানব মাত্রেই আমার গোষ্ঠি—আমি interested। আজকাল নাকি মজলিসেও introduction ব্যতীত কথা বলা বেআদবী। আবার introduction শুধু 'রাম' বা 'গোপাল' মাত্র। অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইবার আগ্রহ লোকের কম। তবে যাহারা ধনী বা প্রতিপত্তিশালী তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য অনেকে লালায়িত। আবার ধনীরা অর্থ ও পদমর্যাদায় সমতুল্য ব্যতীত কাহারও সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছুক নন। সামাজিক বৈঠকও এখন কারবারের exchange; মতলব—সাবধানতা, diplomacy—দিল খুলিয়া কেহ কথা বলে না—চলে like beasts of prey roaming in forest—হিংস্র জন্তুর মত শিকারের অন্বেষণে থাকে। মানবাত্মার কি শোচনীয় অধঃপতন! ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করা যেন অপরাধ—কারণ আর্থিক অবস্থা গোপন রাখিতে হইবে! দারিদ্র্য মহাপাপ! আমাদের স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় বঙ্গবাসী প্রেস S. N. Bose প্রণীত Visit to Europe নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তাহাতে একটি অধ্যায় ছিল—In England poverty is a crime. আমরা তাহা পড়িয়া শকড্ হইয়াছিলাম। সেই আমরাই আজ 'দারিদ্র্য' অপরাধ গণ্য করি। পরস্পর নমস্কার একরকম উঠিয়াই গিয়াছে। গান্ধীর দৃষ্টান্তে কংগ্রেসে নমস্তেটা খুবই চলিত—এখন উঠিয়া গিয়াছে—তবে সভায়, প্রসেশনে নেতারা করজোড়ে অবস্থান করেন বটে। ১৯২০ ইংরাজীতেও গ্রামে মজলিসের সভায় প্রবেশমাত্র সভ্যদের সমবেতভাবে নমস্কার করার রীতি ছিল। সুনামগঞ্জের রায়বাহাদুর অমরনাথ রায়ের ভদ্রতা নিখুঁত ছিল। সাক্ষাতে কেহই তাঁহাকে অগ্রে নমস্কার করিতে পারে নাই।

কলিকাতায় বা জিলা শহরে নিকট আত্মীয়ের সঙ্গেও বড় কেহ দেখা সাক্ষাৎ করে না। একমাত্র বিবাহ বা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে সাক্ষাৎ হয়। দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়রা কলিকাতায় নিমন্ত্রিত হইলেও উপহার ও রাস্তা খরচের ভয়ে অনেকে আসেন না। দূরত্ব মিলামিশার অন্তরায় বটে তবে জলসা বা বৈষয়িক চা-পার্টিতে দূরত্ব অন্তরায় গণ্য হয় না! গ্রামে আশীর্বাদ ১ টাকা কি ২ টাকা দিবার রীতি ছিল, দাতা যত ধনীই হোন না কেন। অপর পক্ষকে পাল্টা দিতে হইবে বুঝিয়াই সমাজপতিগণ এই নিয়ম করিয়াছিলেন। সাহেবদের অনুকরণে সহরে উপহার প্রথার উদ্ভব। নিকট আত্মীয়েরা বিবাহে ও শ্রাদ্ধে কাপড় দিতেন। উপহার এখন টি সেট, বৈদ্যুতিক আলো। ইহা মর্কট

মনের পরিচায়ক। মধ্যবিত্ত সমাজের যে বিলাসিতার সামর্থ্য নাই ইহা ইংরাজী শিক্ষিতরা ভুলিয়া যায়। অথচ নিত্য অসন্তোষ—'আয়ে কুলায় না'। উপহার দ্রব্যাদি আবার দাতার নামসহ নিমন্ত্রিতদের সমক্ষে প্রদর্শিত হয়। snobbery আর কাহাকে বলে! এই জঘন্য রীতিও কলিকাতা হইতে সিলেটে মাত্র বছর ২০ পূর্বে (১৯৩৩-৩৪) আমদানী হয়।

সন্তানদের শিক্ষা

অল্পবয়স হইতে শিক্ষা বিষয়ে আমার মতবৈশিষ্ট্য ছিল তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বানান শুদ্ধাশুদ্ধি গ্রাহ্য করিতাম না, কারণ দোষ বর্ণ-মালার। পরের কথা আওড়ান, যথা 'সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, নেপোলিয়ন বলিয়াছেন' দুই কর্ণে শুনিতে পারিতাম না। পড়, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা কর, ইহাই আদর্শ। সর্ব বিষয়ে নিজস্ব মত থাকিবে।

কলেজ ছাড়ার পর কলেজী শিক্ষার উপর ভক্তি রহিল না। আমাদের চার পাঁচ বৎসর পূর্বে যে ছেলেটি এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম হয় সে কয়েকমাস ক্রমাগত সারারাত্রি পড়িত ও চেয়ারে শুইত। দেখিয়া ঘেন্না ধরিত। নিজে ছাত্রাবস্থায় দৈনিক দুই ঘণ্টার বেশী পড়ি নাই। সন্তানদেরও বেশী পড়িতে দিতাম না। রাত্রে না পড়ার আদেশ ছিল। ছেলেদের বিজ্ঞান পড়াইয়াছি। কিন্তু হাতে কলমে শিক্ষা না হইলে কলেজী-বিজ্ঞান, গবেষণা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে লাগে না। বিশ বৎসর পূর্বে (১৯৩২-৩৪) কার্নেগীর পরামর্শ অনুযায়ী বারো বৎসরের একটি ছেলেকে দোকানে শিক্ষানবীশ করার প্রস্তাবে খুড়া-মহাশয় ও অন্যরা হাসিয়াছিলেন। বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এখন সকলেরই মত বদলাইয়াছে। বিশেষভাবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজপুরুষগণ এবং ধনী কারবারীরা বিদেশী কারিগরি শিক্ষা অত্যাবশ্যক মনে করিতেছেন। এও একটা বাড়াবাড়ি, পরাধীনের হীনমন্যতা মাত্র ; জগতের সহিত পাল্লা দেওয়া Fall in with the world—সোজা কথা অনুকরণ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিতেন "অল্পবয়েসে ছেলেরা (এখন মেয়েরাও) বিলাতে গিয়া উপকৃত হয় না। এখানে কারখানায় কয়েক বৎসর শিক্ষার পর বিশেষ শিক্ষার্থে বিলাত পাঠাইবে"।

বর্তমানে বিলাতে লোকের অভাব। মাসিক আড়াইশ'/তিনশো মাহিনায় ভারতীয়দের কারখানায় কাজ মিলিয়া যায়। এই সুযোগে বহু বালক বিলাত যাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে নাইট স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে। দুই এক জন এ দেশে ইংরাজ কোম্পানীতে ভাল চাকুরী লইয়া ফিরিতেছে বটে কিন্তু মরশুম কতদিন থাকিবে। হিন্দু সভ্যতার দিক হইতে ইহা ভয়ানক ক্ষতিকর। হাবভাব, চিন্তায় এই বালকেরা সাহেব বনিয়া যাইবে। ধর্মের বালাই এখন দক্ষিণ

কলিকাতায় বড় নাই। চালচলন অনেকটা বিদেশী, নাস্তিক ভাবাপন্ন। বিলাত ফেরৎ যুবকদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমগ্র ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজটাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। Citizen of the world হইয়া যাইবে। প্রেসিডেন্সী কলেজের পি. কে. রায়, মুরারি চাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ সতীশ রায় মাঝে মাঝে ক্যাথলিসিজমের কথা আওড়াইতেন—সার কথা পৃথিবীতে এক সভ্যতা এক আচার হইবে। কলেজের অধ্যাপকদের অনেকের মুখে শুনি culture is universal.। সামাজিক কাল্চার বেশভূষা লোক-ব্যবহার সব সমাজের এক হইতে পারে না—ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইঁহারা বোধ-হয় ইকনমিক্সকে Materialistic culture বলিতে চাহেন। কিন্তু culture মনের, matter-এর নহে। matter-এর অপরিবর্তনীয় নিয়ম আছে। তাহা চর্চা বা কর্ষণ করিতে হয় না।

আমার পুত্রকন্যারা বাড়ীতে পড়িয়া ম্যাট্রিক দিয়াছে। ফল বোধহয় ভাল হয় নাই। তবে পাইকারী শিক্ষার দোষ এড়াইয়াছি। কেহই না বুঝিয়া মুখস্থ করা শিখে নাই। কেহ কেহ লোক সমাজে মেলামেশায় লাজুক। সব কয়টি নহে।

সিলেটে মুরারিচাঁদ কলেজে পড়া, মেয়েদের পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় সিলেটে উইমেন্স কলেজ১৩ খুলি। কনিষ্ঠা ও তাহার উপরের কন্যাটি এই কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পাশ করে।

পিসিমা, মা-খুড়ীদের প্রাইমারীর বেশী শিক্ষা ছিল না। স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ, ভগিনীরা কেহ কেহ দুই এক বৎসর গার্লস স্কুলে পড়িয়াছেন ও বাংলা বই পড়িতে পারেন। ইহাদের শিক্ষার অভাব সম্বন্ধে স্বামী বা আত্মীয়স্বজন কোন অভিযোগ করেন নাই। লেডী রানাডে প্রভৃতি বহু মহীয়সী নারীর শিক্ষা ইস্কুল-এর বেশী ছিল না। মেয়েদের বিবাহ দেওয়া দুরূহ। তাহাদের রোজগার করিয়া খাইতে হইবে তজ্জন্য অভিভাবক মেয়েদের এখন কলেজে পড়ান। আবার অনেক বরপক্ষ এম. এ. পাশ মেয়েও চান। নামের জন্য না রোজগারের জন্য? মেয়েদের নাম করার বাতিক বাড়িয়াছে। হিন্দুনারীর আদর্শ আত্মবিলোপ—আত্মজাহির নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্লই হিন্দুনারীর আদর্শ। মেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষার কদর বিবাহের পর একমাসও থাকে না। তবে কোন কোনও স্বামী, স্ত্রীকে সিনেমা রেডিওতে গান করিতে দিয়া নাম করিতে চাহেন বটে! সহরে স্কুল কলেজে শিক্ষিত মেয়েরা এবং অভিভাবকরা পাড়া-গাঁয়ে বিবাহে অনিচ্ছুক। বিবাহসমস্যা জটিলতর হইয়াছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরুষ গৃহশিক্ষক (বিশেষতঃ সঙ্গীতের) এমন কি প্রৌঢ়, সন্তানের জনক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ক্ষেত্রে পর্যন্ত কন্দর্পের কারসাজিতে সঙ্কট উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে।

বিবাহ-সংস্কার১৪

হিন্দুর বৈদিক বা ব্রাহ্ম বিবাহ-সংস্কার, ধর্মাচরণার্থে সংস্কার অর্থাৎ চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে। বৈদিক মন্ত্রগুলি ব্রাহ্ম সমাজের বিবাহেও আবৃত্তি হয়। কোন কোন হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের পথ খোলা রাখার জন্য এখন বৈদিক আচারে বিবাহের পর রেজিস্টারীও করেন। শুধু রেজিস্টারী করিয়া বিবাহ এখন নাস্তিক ভিন্ন কেহ করেন না। অধুনা বিবাহে বর কন্যা আত্মীয়স্বজনের ধর্মকর্মোচিত গাম্ভীর্য দৃষ্ট হয় না। বিরসবদন হইবার কোনো কারণ নাই, বিবাহ অবশ্যই আনন্দ উৎসব, কিন্তু গুরুতর দায়িত্বমূলক। আমাদের বিবাহে সাতপাকে, সম্প্রদানে এবং যজ্ঞে গাম্ভীর্যের পবিত্র নীরবতা ছিল। যদিও স্ত্রী-আচারের সময় বাসরঘরে রঙতামাসায় ছ্যাবলামির চূড়ান্ত হইত। একটা অভূতপূর্ব অজ্ঞাত আনন্দের ভিতরও একটা গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকিতাম। আধুনিক বিবাহ উৎসবগুলি যেন একটি সিনেমাদৃশ্য। বোধহয় ইহা সিনেমা দেখার প্রভাব। জাগ্রতে, শয়নে, স্বপনে সিনেমা-স্টারের অনুকরণই যেন জীবনের লক্ষ্য! আস্তিক ভিন্ন বৈদিক বিবাহে কেহ অধিকারী নহে। বর্তমান পুরুষ অন্তরে নাস্তিক। বৈদিক বিবাহ পদ্ধতি একেবারে পরিত্যাগ করিলে ইহাদের মনোবল ও চরিত্রের প্রশংসা করিতে পারিতাম। হ্যাঁ, ইহারা নাস্তিক হইলেও খাঁটি!

গ্রামে নিমন্ত্রিত সকলেই বিবাহ দেখিয়া গৃহে ফিরিত, অন্তত সাতপাকটা তাহারা সকলেই দেখিত। আত্মীয়-কুটুম্বের সম্প্রদানে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। তখনই আশীর্বাদ দেওয়া হইত। সহরে আমাদের সময়ে দেখিতাম সপ্তপ্রদক্ষিণে আত্মীয়স্বজন উপস্থিত থাকিতেন কিন্তু সম্প্রদান পর্যন্ত অনেকেই থাকিতেন না। কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম বিবাহে সাক্ষী কেবলমাত্র বরের অন্তরঙ্গ যুবক বন্ধুগণ এবং বাড়ীর মেয়েরা। বিবাহ কি ফুলশয্যা মাত্র? গ্রামে আমার এক কন্যার বিবাহে পরগণাব্যাপী হিন্দু মুসলমান ভদ্রলোক ও প্রজার নিমন্ত্রণ ছিল। রাত্রি একটায় সপ্তপ্রদক্ষিণ দেখিয়া ইঁহারা বাড়ী ফিরেন। হয়ত অনেকে যাত্রাগানের আকর্ষণে এত রাত্রি পর্যন্ত বসিয়াছিল। সহরে রাত্রি নয়টার বিবাহেও কেহ থাকিতে চান না। ভোজের পরেই অন্তর্ধান। আত্মীয় ও বরযাত্রীরাও অপেক্ষা করেন না। আমাদের কালে বিবাহের পূর্বে কেহ খাইতে বসিত না। গ্রামে বিবাহকে গৌণ জ্ঞানে এইরূপ অবহেলা অপমানগণ্য—অমার্জনীয়। অজ্ঞাতকুলশীলা সিনেমা-স্টারের বিবাহে কিন্তু বিশিষ্ট অধ্যাপক সাহিত্যিকগণ উপস্থিত থাকেন। তবে আর ছাত্রদের চরিত্রের উন্নতির কি আশা করিতে পারি? এখন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য অকলঙ্ক চরিত্র আর কেহ প্রয়োজন মনে করে না।

শ্রীহট্ট সহরে সপ্তপ্রদক্ষিণের সময় দর্শকের দণ্ডায়মান থাকা ছিল পূর্বের রীতি। এখন নূতন অভিজাত হাকিম, সাবজজ, নেতা ইত্যাদির জন্য বিবাহ-কুঞ্জের চতুর্দিকে চেয়ার, সোফা রাখা হয়। ননীর পুতুলেরা অর্ধঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না! সেকালে বয়োবৃদ্ধ অভিজাত ব্রাহ্মণরাও কিন্তু শূদ্রের সঙ্গে ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের পবিত্র গাম্ভীর্য রক্ষা করিতেন। সপ্তপ্রদক্ষিণের সময় ঘন ঘন প্রেমধ্বনি (হরিধ্বনি) দেওয়া হইত। কংগ্রেসীরা আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বন্দেমাতরম ধ্বনি দিত। এখন সেসব বালাই নাই। এইসব দেখিয়া আমাদের মনে হয় ইহা বৈদিক বিবাহ নহে, বিবাহের প্রহসন মাত্র। সেকালের কুলীন দ্বিতীয়, তৃতীয় বিবাহকে আঙ্গিরস বলিত। তাহাও ধর্মীয় সত্যিকার ব্রাহ্ম বিবাহই ছিল। গান্ধর্ব বিবাহ, স্বয়ম্বর বিবাহ বটে কিন্তু মাল্যদানের পর রীতিমত সম্প্রদান হইত। দ্রৌপদীর অর্জুনকে মাল্যদানে বিবাহক্রিয়া শেষ হয় নাই। দ্রুপদ পরদিন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে উলুধ্বনি, পশ্চিমবঙ্গে কেবল শঙ্খধ্বনি এখনও চলে। ইংরাজী শিক্ষিতরা মনে করেন উলুধ্বনি অসভ্য আদি মানবের উল্লাসধ্বনি। যুবতীরা উলুধ্বনি দিতে বড় উৎসাহী নহেন। গীতাবিলাসীরা শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য স্মরণে শঙ্খধ্বনির কিছুটা সম্মান করেন।

ফলিত জ্যোতিষ

আবহমান কাল হইতে সভ্য অসভ্য সব দেশই ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী। দিল্লীর বাদশাও প্রত্যহ হিন্দু দৈবজ্ঞকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। বৈজ্ঞানিক যুগ এখন অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিতেছে বটে তবে সব দেশেই কমবেশী বিশ্বাসী এখনও রহিয়াছে। অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিলে জ্যোতিষে কমবেশী বিশ্বাস করিতে হয় আবার পুরুষকার বশে কর্ম ক্ষয়ও হয় স্বীকার করিলে জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র সম্ভাবনাতেই আসিয়া দাঁড়ায়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করি নাই। কিছুদিন বিদেশী পদ্ধতিতে Cheiro-র 'করকোষ্ঠি' চর্চা আলোচনা করিয়াছি। অনেক হাত দেখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। প্রখর স্মৃতিশক্তির অভাবে ছাড়িয়া দিয়াছি। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় খুব ভীত নহি এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকায় ভবিষ্যৎ জানিবার আগ্রহ বিশেষ নাই। এই হাত দেখার ব্যাপারে সাধারণ লোকের চরিত্র বেশ বোঝা যায়।

গ্রামের বাড়ীতে কৌলিক গ্রহবিপ্র ১লা বৈশাখে এখনও নবপঞ্জিকা নকল করিয়া নববর্ষের ফলাফল ঘোষণা করেন।

কখনও পীর বা সাধুসন্ন্যাসীর কাছে ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য যাই নাই অথচ দেখি বিজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় বহুব্যক্তি গিয়া থাকেন।

১৯০০ ইংরাজীতে, দিন ক্ষণ দেখিয়া যাত্রা অবশ্য কর্তব্য ছিল। ১৯৫২-তে সাধারণতঃ দিনক্ষণ দেখা হয় না, তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজে, যাত্রায়, ধর্মকর্মে ও বিবাহাদিতে দেখা হয়। কাজের গতি এখন এত দ্রুত যে দিনক্ষণ দেখা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। কালবেলা, বারবেলা এড়ান চলে যদি সেই দিন যে কোন সময়ে যাত্রায় অসুবিধা না হয়। কিন্তু রেলগাড়ীর নির্দিষ্ট সময় আছে।

আবহাওয়া অফিসের ঝড়েব পূর্বাভাসকে যদি যাত্রায় মান্য করি তবে মঘাকে আর বাদ দেই কেন?

সাধুসঙ্গ

সাধুদের কাছ ঘেঁষি না। পরিচিত সাধুসঙ্গী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করিতেছি, নাম গোত্র গোপন করিয়া।

বিখ্যাত এক সাধুর শিষ্য আমার এক বিজ্ঞ ও বিদ্বান বন্ধু বলেন, "গুরুজীর আশ্রমে কয়েকমাস থাকিয়া বুঝিয়াছি, অধিকাংশ চেলারই জীবন বিফল হইয়াছে। একাংশ গাঁজাখোর, প্রায় উন্মাদ। অতি সামান্যসংখ্যকই ভগবানের নিকটবর্তী হইয়াছে।" হোমরাচোমরা কোনও শিষ্যের বাড়ীতে স্বামীজী আস্তানা গাড়িলে তাঁহার অনুচরবৃন্দ দলে দলে মন্ত্র নেয়। পরে ইহাদের মধ্যে অনেকেরই কুচরিত্রের কোন উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। 'গুরুভ্রাতা' একটা স্টেটাস, কম লোভনীয় নহে। ৩০ টাকার কেরাণী বা ৬০ টাকার সাব-ইন্‌সপেক্‌টার বড়কর্তা বা পুলিশ সাহেবের সহিত একাসনে বসিবে, এক পঙ্‌ক্তিতে খাইবে! আরে! কৌলীন্য ব্যবস্থায় সামাজিক উৎসবে নিরন্ন ব্যক্তির সাক্ষাতেও বর্ধমানের মহারাজাকে গললগ্নীকৃত-বস্ত্র জোড়হস্ত থাকিতে হয়।

উত্তর আসামে কোনও সহরে এক স্বামীজীর আধিপত্যকে পুলিশও ভয় করিত। স্বামীজীর জ্বালাতনে উত্যক্ত এক ব্যক্তির অনুরোধে আসাম কাউন্সিলে ঐ বিষয়ে এক প্রশ্ন উত্থাপন করিলে লবীতে চিফ্ সেক্রেটারী আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার নেতাই তাহার অনুরক্ত।" কোনও বিখ্যাত জমিদারের পৌত্রী ও তাহার স্বামীকে (তিনিও জমিদার, একেবারে অপ্রসিদ্ধ নহেন) ভেল্কি দিয়া আটকাইয়া রাখার জন্য মামলা মোকদ্দমা হইয়াছিল। পশ্চাৎ ইঁহারা ছাড়া পান। জামাতাটি বিদ্বান এবং স্বামীজীর কাছে হিন্দুদর্শন বেশ ভালই শিখিয়াছেন দেখিলাম।

*তারাকিশোর চৌধুরীর (সন্তদাস বাবাজী) এক জ্ঞাতি শিলচরে অরুণাচল আশ্রম খুলিয়া দয়ানন্দ নাম ধারণ করেন। তাঁহার অহোরাত্র "প্রাণগৌর-

নিত্যানন্দ" কীর্তনে একদল নরনারী আশ্রমে স্থায়ী আস্তানা গাড়েন। সমাজ-পতিগণ ভীত হইলেন। প্রধানতঃ "অপহরনের" অভিযোগে পুলিশ হস্তক্ষেপ করিল। পুলিশ গারদে কতিপয় যুবক স্বামীজীকে কিছু উত্তমমধ্যম দেয়।

মৌলবীবাজারে জগৎসী গ্রামে মহেন্দ্র দে (নামজাদা ছাত্র এম. এ. বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট) ও তদীয় ভ্রাতা নিজ বাড়ীতে এক শাখা আশ্রম খুলেন। অপ-হরনের অভিযোগে পুলিশ তদন্ত করিতে গেলে আশ্রমবাসীরা বলপ্রয়োগ করেন। ফলে দুর্দান্ত এ. এস. পি., বোমন্ট ও যতীন্দ্র বসু ডি. এস. পি-র নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালায়। মন্ত্রপূত ত্রিশূলসহ আশ্রমবাসী নরনারী পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশের গুলিতে মহেন্দ্র প্রাণত্যাগ করে।

বহু পরে এক আত্মীয়সহ দেওঘরের আশ্রমে দয়ানন্দকে দেখিতে যাই। এক ঘণ্টা বসিয়া স্বামীজীর দেখা পাই নাই। তিনি সন্ধ্যাপূজায় ছিলেন। আশ্রমের ম্যানেজার পাবনার এক উকীল, নাম মনে নাই। দেখিলাম, লোকটী জ্ঞানী। তাঁহাদের একটী পত্রিকার সম্পাদক। বিশ্বশান্তি ও একীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। লোকটি স্বাস্থ্যবান, আমাদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কুয়া হইতে জল তোলা ইত্যাদি নানান্ কাজও করিলেন। আমার আশ্চর্য লাগিল এবং দুঃখও হইল যে, জ্ঞানী ও কর্মীলোকও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনার আলেয়ায় আকৃষ্ট হয়।

আমার অতি নিকট আত্মীয় এক পরিবার নামজাদা এক সাধুর শিষ্য হ'ন। তাঁহাদের বাড়ীতে ঐ সাধুর সমাগম হইলে আমাকে প্রণাম করিতে বলা হয়। তখন আমার বয়স ৩০। বলিলাম, "সংসারী হইলে সামাজিক রীতিতে প্রণাম করিতাম। সাধুর প্রতি যদি ভক্তি না হয় তবে প্রণাম করিতে পারি না।" 'রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু সাক্ষাৎ ছিলেন।

কর্ম পরিত্যাগ ভিন্ন সন্ন্যাস হয় না। আবার কর্মপরিত্যাগ করিয়া গৃহীও থাকা চলে না। পরস্পর বিরোধী দুই নৌকায় কি করিয়া পা দেওয়া চলে, বুঝি না। গৃহস্থের ইহাতে কোনো লাভ দেখি না। গার্হস্থ্য ধর্মই আমার পেশা। সন্ন্যাসের অনধিকারচর্চা করিনা। গুরুমন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এখনও বোধ করি নাই। আমাদের কুলগুরু (শ্রীহট্ট যুগলটীলা) উদাসী। ভাইয়েরা মন্ত্র নিয়াছেন, আমি নেই নাই। গুরু পাইলগাঁও সফরে গেলে দুর্গা-পূজার পূর্বেই চলিয়া যান—কারণ ইঁহারা শক্তিপূজা বিদ্বেষী। শাক্তরা আবার বৈষ্ণবদের ব্যঙ্গ করিয়া ছড়া কাটে "হস্তীশুণ্ডের মাতার গ্রামে, তিনফরিঙ্গার তলে/প্রভুরে বানাইয়া থইছে, কস্ পড়ে ধারে।" (হস্তীশুণ্ডের মাতার গ্রাম = দুর্গাপুর। তিনফরিঙ্গার তলে = বেলগাছের তলে। প্রভুরে বানাইয়া থইছে = গোঁসাইকে কাটিয়া রাখিয়াছে। কস = রক্ত)।

প্রাচীন বাক্য আছে—গৃহী উদাসী গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবেন না।

তাহাতে গৃহস্থের কর্তব্যে বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা। রাধাবিনোদ দাস (যিনি পরে ভেক নিয়া বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন) বলিয়াছিলেন যে বৈষ্ণব-সমাজের সর্বভারতীয় নেতা এক সাধুকে তিনি বৃন্দাবনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে গৃহস্থের আধ্যাত্মিকতা নাই।

১৯৩৬ ইংরাজীতে শ্রীহট্টের মাসিক বলাকা পত্রিকায় ঐ বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখি। ঐ লেখাটির তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল।১৫

আহার শুদ্ধি

ষাট সত্তর বৎসর পূর্বে প্রাচীন পন্থীরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ হইলে হোটেলে দোকানে খাইতেন না। বিদেশে আবশ্যক বোধে ইহারা ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ কিনিয়া খাইতেন। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগেন্দ্র বসু এই উদ্দেশ্যে এক ঠাকুর-বাড়ী করার জন্য দুইলক্ষ টাকা চাঁদার প্রার্থী হন। প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেন "দুলাখ রুপেয়া দেলায় ধরম, একটি বাড়ী দেলায় ধরম"—এই শিরোনামায়। আপিসেও এই শ্রেণী জলযোগ করিতেন না। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে গ্রীষ্মেও জলপান পর্যন্ত করিতেন না। কলিকাতায় চা-এর দোকান ১৯০৭ ইংরাজীর বহু পরে।

দ্বিপ্রহরে দিনের প্রধান ভোজন বাড়ীতে খাওয়া অত্যাবশ্যক। রাত্রে লঘু ভোজন কর্তব্য—ডিনার অবৈজ্ঞানিক। হোটেলে, দোকানে রান্না পরিবেশন কখনও পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। অতি বৈজ্ঞানিক আমেরিকা-ও স্বীকার করে হোটেলের চাকরদের ছোঁয়াচে রোগের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাও পুরা ইনসিওর নহে। তদুপরি ব্যবসাদার মালিক, ম্যানেজার চক্ষুর অন্তরালে সস্তায় অখাদ্য পরিবেশন করিবেই। হোটেলের পাঁঠার মাংস প্রায়ই পাঁঠার নয়। তজ্জন্যই শাস্ত্রব্যবস্থা, গৃহে দরদী আত্মীয়া বা নিকট কুটুম্ব ভিন্ন কাহারও রন্ধন ও পরিবেশন গ্রহণ করিবে না। রেলে, স্টীমারে প্রথম শ্রেণীর রান্নাঘর দেখিয়াছি। খানসামাদের নোংরামি ন্যক্কারজনক। বিপিন পাল বলেন, "Hindu is the cleanest animal on earth". আমাদের বাল্যে ও যৌবনে দেখিয়াছি গ্রামে জ্ঞাতিদের ভিতরও সকলে সব বাড়ীর মেয়েদের রান্না খাইত না। কেহ কেহ অকুলীনে বিবাহ করিয়া যে সকল বধূ আনিতেন তাহারা সত্যই রান্নায় অপটু ও অপরিচ্ছন্ন ছিল। কৌলীন্যের আভিজাত্য কেবল রক্তের নহে, সঙ্গে সঙ্গে সভ্য আচারেরও। আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি কুললক্ষণ। আচারই প্রথম। এক গ্রাম্য জমিদার মাতাল হইয়া তাহার এক ভাণ্ডারী পরিবারের উপর অত্যাচার করিলে ভাণ্ডারী বর্গ বিদ্রোহ করে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য গ্রামে গেলে পর ঐ ভাণ্ডারীর স্ত্রীর রান্নাই খাইয়াছিলাম। একটু একটু ঘেন্না করে নাই তাহা বলিতে পারি না। আত্মীয়

বাড়ী ভিন্ন অন্যত্র বা হোটেলে অন্ন বড় খাই নাই। নোংরামি বর্জনীয়, ইহা স্বীকার করিয়াও নবীনগণ অবহেলায় স্বেচ্ছাচার করেন আলস্যবশে, সামান্য অসুবিধা এড়াইবার জন্য। ইহাও আমাদের চরিত্রের অধোগতির ইঙ্গিত দেয়। পথেও অপরের রান্না আহার অপরিহার্য নয়। ১৫ বৎসর আগেও মাড়ওয়ারী ছাতু খাইয়া ভারতময় ভ্রমণ করিত। এখনও রেলে স্টীমারে সহস্র সহস্র হিন্দু ভাত খায় না। কুলীনের ছেলে কুলীন হওয়ার সম্ভাবনামাত্র, পতিতও হইতে পারে। আবার ক্রমশঃ সদাচারে অকুলীনও কুলীন হয়—শাস্ত্র ইহাই বলে। লোক ব্যবহারও তাহাই। কুলীন কায়স্থদের অনেকেই সাধারণ শ্রেণীর ছিলেন। সদাচারী শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণেরও গ্রহণীয়—ইহা মনুর নির্দেশ। আমাদের নিমন্ত্রণ খাওয়া ছিল দ্বিপ্রহরে—গ্রামে এখনও আছে। সহরে আফিসের ঠেলায় এখন রাত্রে হইয়াছে। ইহা অবৈজ্ঞানিক। ডাঃ বিধান রায়ের কি মত ছিল জানি না।

বালাধন ও অপর কয়েকটি খুনের মামলা

আমরা যখন সিলেট স্কুলে পড়ি তখন কাছাড়ের বালাধন চা-বাগিচার সাহেব ম্যানেজার ও তাহার উপপত্নীকে খুন করার অভিযোগে জজ লেনসন ছয়জন মণিপুরীর ফাঁসির হুকুম দেন। এর আগে গ্রীভস্ সাহেব বহু বৎসর জজ ছিলেন। তাঁহার আমলে একটি ফাঁসিও হয় নাই। জিলার লোক, একসঙ্গে ছয়জনের ফাঁসির হুকুম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কামিনী চন্দ নূতন উকীল, এ মোকদ্দমায় আসামী পক্ষে ছিলেন। তিনি কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহায্যে চাঁদা তুলিয়া 'বাঘা' জ্যাকসন সাহেবকে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার দেন। জ্যাকসন মোকদ্দমা পুলিশ ইন্‌স্‌-পেক্‌টর জয়চন্দ্র ভদ্রের সাজানো প্রমাণ করিয়া বলেন "...and the rascally Jaichunder still wears the uniform of Her Majesty..."।

প্রায় কুড়ি বৎসর পরে ঐ ঘটনার অপহৃত অলঙ্কার ডিব্রুগড়ে এক পাঠানের কাছে পাওয়া যায়। ডাকাতির মাল রাখার জন্য পাঠানের জেল হয়। সাহেবের উপপত্নী সিমাক মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে বলিয়াছিল পাঠান তাহাকে আক্রমণ করে। সেই জবানবন্দী মণিপুরী আসামীর সপক্ষে যাইবে বলিয়া পাবলিক প্রসিকিউটার রাধাবিনোদ দাস উকিলের পরামর্শে গোপন করা হয়। সকলেই তাহা জানিত। আমি যখন উকিল তখন রাধাবিনোদ দাসের বয়স্য উকিলগণ তাঁহাকে খোঁচা দিতেন "বাবাজী, একদিন তোমার নরকদর্শন আছে। ছয়জনকে ঝোলাবার ব্যবস্থা করেছিলে"।

রাধাবিনোদ পরে বৈষ্ণব হইয়া বৃন্দাবন গিয়া অন্তিম শয্যায় অযত্নে বহু-কাল ক্লেশ পান।

এই মোকদ্দমায় কামিনী চন্দ কাছাড়ের মণিপুরীদের "দেওতা" হইলেন। আমরা তাহাদের কাছে ভোটপ্রার্থী হইয়া গেলে বলিত "কামিনী জানে"। কামিনীবাবু ছিলেন দ্রুত লিখিয়ে ও বক্তা। তাঁহার বক্তৃতার অনুলিখন শক্ত ছিল।

১৩১৭ বাংলায় শ্রীহট্টে আর একটি চাঞ্চল্যকর খুন হয়। এক ভদ্রলোকের মূর্খ পুত্র পাহাড়ী মেয়েদের সহিত আমোদপ্রমোদ করিত। তাহার জন্য কয়েক মাতাল অনুচরের সহিত পাহাড়ীয়াদের ঝগড়া হয়। ইহারা ঐ চারজন পাহাড়ীয়াকে লতাদ্বারা বাঁধিয়া জীবন্ত কবরস্থ করে। ঐ ভদ্রপুত্রের ডাক নাম "বোকা" (fool) এই তথ্য এবং একটি আসামীর স্ত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে তীব্র জবানবন্দীর সুযোগে উকিল আদালতকে প্রভাবান্বিত করিয়া আসামী খালাস করেন। একইরূপ মোকদ্দমায় ইউরোপীয়ান ডিফেন্স এসোসিয়েশনের ভদ্রমণ্ডলীর যেনতেনপ্রকারেন স্বশ্রেণীর লোক খালাস করাইবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছি। দাম্পত্যজীবনে অসুখী এক জজ "নারীঘটিত" ইঙ্গিত করিলে প্রায়ই আসামী খালাস দিতেন।

তুবড়ী অপহরণ মামলা

১৯২৩ ইংরাজীতে আমি কোনো কার্যোপলক্ষে সুনামগঞ্জ যাই। সহরে খুব চাঞ্চল্য। সুনামগঞ্জের স্টীমার এজেন্ট এক কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহিতা চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যা তুবড়ী হঠাৎ উধাও হইয়াছে দুইদিন আগে। অনেকের অনুমান সে নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশও তাহাই বলিতেছে।

উকীল দ্বারিকানাথ বসু আমায় জানান ইহা আত্মহত্যা নয়। এর ভিতর রহস্য আছে। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় পুলিশ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। কলিকাতা নিবাসী এম. বি. পাশ সরকারী ডাক্তারের উপর সন্দেহ পড়ে। কিন্তু গ্রেপ্তারের পূর্বেই হঠাৎ ডাক্তার ফেরার হয়। বৎসরাধিক কাল পরে তুবড়ীকে পশ্চিমবঙ্গের কোনো সহর হইতে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু তাহার তত্ত্বাবধায়ক, ডাক্তারের চাকর রামচন্দ্র পালাইয়া যায়। মেয়েটিকে তাহার বাপের বাড়ীতে রাখা হয়। একজন পুলিশ দিবারাত্র পাহারা দিত। এর বহু পরে ডাক্তার ধরা পড়ে। বিচার হয় জজ আদালতে।

মামলার সময় আদালতে লোকারণ্য হইত। এমন কি চা বাগানের সাহেবরাও উপস্থিত হইত। ইহারা কি একটি চিত্তাকর্ষক প্রেমাভিনয়ের কাহিনী শুনিতে আসিত, না কালাদের স্ত্রী চরিত্রের সমালোচনার খোরাকের জন্য আসিত?

প্রমাণ হয় যে ডাক্তার চিকিৎসক হিসাবে মেয়েটির সহিত পরিচিত হয়। সরকারী উকিল রায়বাহাদুর সতীশ দত্ত অধ্যবসায়ের সহিত দেখাইয়াছিলেন যে ডাক্তার কর্তৃক মেয়েটির চরিত্র নষ্ট করিবার প্রণালী হুবহু একটি বাংলা উপন্যাসে বর্ণিত প্রণালীর অনুকরণ। ক্রমশঃ ডাক্তার এবং সহরে গণ্যমান্য তাহার দুই একজন বন্ধু মেয়েটির কাছে যাইতেন। তাহাকে অপহরণ করিবার পর চাকর রামচন্দ্রের সহিত মেয়েটিকে নৌকাযোগে এক গ্রামে পাঠান হয়। পরদিন রাত্রে ডাক্তারের এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকিয়া পরে স্টীমারে কলিকাতায় আসে। কিছুকাল ফেরারী ডাক্তারের সঙ্গে বাস করার পর পুলিশের ভয়ে রামচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মেয়েটিকে কলিকাতার আশেপাশে নানাস্থানে লুকাইয়া রাখা হয়। অর্থাভাবে রামচন্দ্র মেয়েটিকে মারপিট করিয়া বেশ্যাবৃত্তি করাইত।

দুঃসাহসী ডাক্তার এই সময় তাহার এক মদ্যপ বন্ধু, সরকারী বড় ডাক্তারকে আমার কাছে শ্রীহট্টে মোকদ্দমা আপোষ করিয়া দিবার জন্য পাঠায়। ব্যাপার শুনিয়া বন্ধুটির সহিত সাক্ষাৎ করিতেই অস্বীকার করি।

ডাক্তারের চার বৎসর কারাদণ্ড হয়। স্বভাব যায় না মরলে। জেলারের নিকট শুনিয়াছি জেলে ডাক্তার যখন দ্বিতল হাসপাতালে রোগী দেখিত তখন পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলির দিকে উকিঝুঁকি দিত।

স্বামীর দিক হইতে ঘটনাটির পর মেয়েটির কোন খোঁজ নেয় নাই। কয়েক বৎসর বাপের বাড়ী থাকিয়া মেয়েটি বোধহয় বর্মায় কোনও বাবুর উপপত্নী হইয়া বাস করে। বর্মায় এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। ডাক্তারের বরাত মন্দ যে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। কলিকাতার একশ্রেণীর প্রেসিডেন্সি ম্যাজি-স্ট্রেট হয় তো বলিবেন—মেয়েটির কল্যাণে আমার উচিত ছিল মোকদ্দমা আপোষের চেষ্টা করা। হয় তো আমার প্রদত্ত এই দৃষ্টান্তই হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সপক্ষে দাঁড় করান হইবে!!

মনুর ব্যবস্থা—দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারিবে না—কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া শাসনে রাখিবে।১৬ অন্ধ গোঁড়া মনুবিদ্বেষীদের চক্ষু খুলিবে কি? বঙ্কিমবাবু চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ঐ নিয়মেই শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋতুস্নানের পর ভ্রষ্টা নারী শুদ্ধা হয়।

ইদানীং মন্ত্রী চারু বিশ্বাস নূতন বিবাহ আইন প্রণয়নের প্রস্তাবে একটি অদ্ভুত বিবাহ চুক্তির কথা বলিয়াছেন। ইহাতে আছে জাত সন্তানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের—স্বামীস্ত্রীর নহে।

ইংরাজী পড়িয়া মগজ গোবর হইয়াছে ; স্বাধীনতা পাইয়া মাথা গুলাইয়া গিয়াছে—"...আমি কি হনু রে"—সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার আর বেশ্যাবৃত্তিতে তফাৎ কি? এর উপর সহজে বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষে ওকালতিও আছে। বেশ্যাসহবাসও তবে অল্পদিনের বিবাহ গণ্য করা যাইতে পারে!! মোটাবিবাহ

নামে সাময়িক বিবাহ কোনও কোনও সম্প্রদায়ে আছে। কথায় বলে A sailor has a wife in every port.

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা

১৯০৯ ইংরাজী ঘটনা। ঢাকার ভাওয়াল জমিদারীর এক কুমার ছিল অশিক্ষিত—রেস এবং বেশ্যাসক্ত, ছোটলোকের ইয়ার। দারজিলিং-এ তাহার মৃত্যু হয়। তাহার স্ত্রীর আত্মীয়রা তাহাকে ঔষধের সঙ্গে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে বলিয়া ইঙ্গিত করা হয়। লাশ নাকি পুড়ান হয় নাই। এক সন্ন্যাসী কুমারকে বাঁচাইয়া তাহার চেলা করে। বহু বৎসর পর কুমার সন্ন্যাসীবেশে রাজবাড়ীর আশেপাশে দর্শন দেন। তাহার এক আত্মীয়া তাহাকে চিনিতে পারেন। রানী দেখিতেই অস্বীকার করেন।

সম্পত্তি তখন সরকারের হাতে। কঠোর সরকারী জমিদারী শাসন হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় আমলা এবং মাতব্বর প্রজারা আন্দোলন উপস্থিত করে যে, "ইনিই কুমার"। "ফকীর বেশে প্রাণের রাজা" ইত্যাদি পুস্তক ও কবিতার প্রচার হয়। সরকার স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। বিষয়টি যদিও কুমারের আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কাহারও মাথা ঘামাইবার কিছু নহে তবু আকার ধারণ করিল যেন একটা রাজনৈতিক লড়াই!

শেষে জজ পান্নালাল বসুর আদালতে ফকীরই কুমার বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। দেশে জয়ধ্বনি উঠিল। হয় তো বিচার ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু একটি লোকও জন্মদুঃখিনী রাণীর কথা ভাবিল না। সে যে "ভারতশ্মশানমাঝে আমি রে বিধবা বালাব" চেয়েও দুঃখিনী, দুর্ভাগিনী। আদালত ভগবান নহেন আদালতের বিচার নির্ভুল না হইতে পারে। রাণীর নিজের বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত ফকীরকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। আর স্বামী বিশ্বাস হইলেও সহবাস না করাই সঙ্গত মনে করিয়া থাকিবেন। অশিক্ষিত, লম্পট যাহার প্রীতি প্রেম অংকুরিত হইবার কোন সুবিধা বা সম্ভাবনা ছিল না. এরূপ স্বামীকে স্বীকার না করাই স্বাভাবিক। প্রগতিবাদীরা হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ আইনের জন্য ব্যগ্র অথচ এই অনাথা নারীর প্রতি সমবেদনাটুকু প্রকাশ করেন নাই। রাণীর ভরণপোষণের জন্য সম্পত্তির একটা অংশ ন্যায়তঃ তাহার প্রাপ্য—কিন্তু আইন তাহা স্বীকার করে নাই।

বহুপূর্বে জাল প্রতাপচাঁদ মৃত ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন কাহিনী দ্বারা বর্ধমান রাজ্যের দাবী করেন। সাধারণতঃ এইরূপ মোকদ্দমায় নিঃস্ব দাবীদার পক্ষে উকীল ও ধনীরা অর্থ সাহায্য করেন। এও আন্দোলনের একটা কারণ। অশিক্ষিত লম্পট হস্তে জমিদারী দিয়া দেশের কি উপকার হইত?

শ্রীহট্টে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান

শ্রীহট্ট জিলায় অনেকগুলি বড় বড় বৈষ্ণব-আখড়া আছে। শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে যুগলটিলা আমাদের পরিবারের গুরুপাট। এই আখড়ার বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে যাহা শিষ্যদের দান। আয় বৎসরে আট দশ হাজার টাকা হইবে। কৈবর্তদের বিথঙ্গলের আখড়াও প্রসিদ্ধ। স্থাপয়িতা রামকৃষ্ণ গোঁসাই এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন। শ্রীহট্ট সহরে আরও চার পাঁচটি আখড়া আছে।

শ্রীহট্টে মণিপুরের রাজার স্থাপিত ঠাকুরবাড়ী বিখ্যাত। নূতনকালে, আমার সময়ে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ভোলাগিরি আশ্রম, সন্তদাস বাবাজীর আশ্রম, স্থাপিত হইয়াছে।

সহরের প্রাচীন জমিদার রাসবিহারী দত্তের পুত্র সুরেশবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাহার বৃহৎ বসতবাটী ভোলাগিরি আশ্রমে দান করিয়া যান। ফরেস্ট অফিসার দ্বিজেন্দ্র দেবের সাহায্যে পাকা মন্দির নির্মিত হয়।

বামজঙ্ঘাপীঠ জৈন্তিয়া পাহাড়ের সানুদেশে। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রাজার মন্দির সংস্কার করাইয়াছেন।

গ্রীবাপীঠ, সহর হইতে ৩৩ মাইল দূরে গোটাটিকরে; মন্দির আছে। শিবরাত্রিতে এখানে মেলা হয়।

জৈন্তিয়া (জয়ন্তীয়া) পাহাড়ের উপর জৈন্তিয়া রাজার রূপনাথ মন্দির আছে। পৌষসংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। ইহা বহু প্রাচীন মন্দির। পাহাড়ের ভিতর কারুকার্যময় গুহা, টানেল। বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের কারুকার্য এই মন্দিরে আছে। মন্দিরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। বোধহয় জৈন্তিয়ারাজের রাজ্যচ্যুতির পর কেহ তত্ত্বাবধান করে নাই। জৈন্তিয়া রাজবাটীতে জৈন্তেশ্বরী কালী আছেন। এককালে এখানে নরবলি হইত।

সন্তদাস বাবাজী ছিলেন শ্রীহট্টের বামৈ গ্রামের তারাকিশোর চৌধুরী হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল। ইনি প্রথম যৌবনে নাস্তিক, পরে ব্রাহ্ম, সর্বশেষে দার্শনিক ও ভক্তিমান হিন্দু। তিনি "ব্রহ্মবিদ্যা" নামে ষড়দর্শন সম্বন্ধে একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐশ্বর্য ও যশ ছাড়িয়া ভেকধারণ পূর্বক সন্তদাস বাবাজী বৃন্দাবনে ব্রজবিদেহী ৫২ নং গুরুপদ লাভ করেন। একবার সিলেট গিয়াছিলেন। তখন অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত তাঁহার শিষ্য হন। সিলেট আশ্রম তাঁহাদেরই স্থাপিত। সন্তদাস বাবাজীর বন্ধু বিখ্যাত উকীল রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই, তুমি তো চললে। কিন্তু আমাদের মায়া যে যায় না"।

সন্তদাস নিঃসন্তান ছিলেন।

শ্রীহট্ট সহরের উপকণ্ঠে অতি মনোরম টীলা অঞ্চলে কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটার রমানাথ ঘোষ এস্টেট কর্তৃক বহুকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত দুর্গাবাড়ী আছে। এস্টেট হইতে বাৎসরিক অনুদান দেওয়া হয়। তাহা বর্ধিত না হওয়ায় দুর্মূল্যের দিনে পুরোহিত কষ্টে সহর হইতে কিঞ্চিৎ চাঁদা আদায় করিয়া চালাইতেছে। দেশবিভাগের পূর্বে, পূজার্থী সহরের লোকের এবং নিকটবর্তী কলেজের (মুরারীচাঁদ কলেজ) ছাত্রদের দেওয়া প্রণামী ছিল প্রধান সম্বল। এখন সেবার্থীর সংখ্যা নগণ্য। এই দেবস্থান টিঁকিবে বলিয়া মনে হয় না। দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনে এই স্থানে বহু পূজার্থীর ভীড় হইত।

শ্রীহট্ট মাতৃমঙ্গল প্রসূতি হাসপাতাল ঃ যখন রায়বাহাদুর প্রমোদ দত্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন, (১৯৩৫ ইংরাজীর পূর্বে), সরকারী জমিতে রেডক্রশের আনুকূল্যে এবং স্থানীয় চাঁদার সাহায্যে ইহা নির্মিত হয়। তৎকালীন ভারতে জিলা সহরে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইটি দ্বিতীয়। রেডক্রশের তত্ত্বাবধায়ক স্বয়ং লাট। প্রথমে কমিটিতে মাত্র ২।১ জন নারী ছিলেন। এখন সিবিল সার্জন ব্যতীত সকল সদস্যই নারী।

শ্রীহট্ট টাউনহল ঃ—১। রতনমনি লোকনাথ টাউনহল। ইহা নির্মিত হয় অর্ধশতাব্দী পূর্বে—সহরের বিখ্যাত জমিদার খাদাঞ্চিবাড়ীর অর্থানুকূল্যে। ২। সারদাচরণ মেমোরিয়াল হল উকীল সারদাচরণ শ্যামের স্মৃতিতে স্থাপিত—ইন্দেশ্বর চা কোম্পানীর অর্থে। দুইটি হলই মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে এ যাবৎ সরকারী রিকুইজিশন হওয়া অবস্থায় আছে। যুদ্ধে ও দেশবিভাগে সব ওলটপালট!

প্রথমটির সহিত শ্রীহট্টের শিক্ষাবিদ পাদ্রী প্রাইস সাহেবের নামে এক লাইরেরী সংযুক্ত আছে। তাহাও অর্ধশতাব্দী প্রাচীন। খুড়ামহাশয় বহুকাল সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লাইব্রেরীটি যুবকদের তত্ত্বাবধানে নিকৃষ্ট উপন্যাস-লাইব্রেরীতে পরিণত হয়। যুদ্ধের পর অর্থাৎ হল রিকুই-জিশনমুক্ত হওয়ার পর এই লাইব্রেরীর বহি কোথায় তাহা অজ্ঞাত।

কলেজ প্রিন্সিপাল সতীশ রায়, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, রমনীমোহন দাস, রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সহযোগে প্রথমে মাসিক "কমলা" পত্রিকা এবং পরে কালচারেল ক্লাব খোলা হয়। পত্রিকা বেশীদিন চলে নাই। কালচারেল ক্লাব পরে সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হয়। প্রোফেসার কিশোরী গুপ্তের তত্ত্বাবধানে সরকারী ভূমিতে পাকা বাড়ী নির্মিত হয়। এই বাড়ীও দেশবিভাগের পর রিকুইজিশন করা হয়। অমূল্য গ্রন্থগুলির রাখার স্থান নাই। অচ্যুত তত্ত্বনিধি, বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সাহিত্যিকের তৈলচিত্র ছিল। প্রমোদবাবু বহুকাল সভাপতি ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কিছু-কাল সেক্রেটারী ছিলেন। সাহিত্য সভায় সভ্যতা ও মনঃশাস্ত্র বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করি।

শ্রীহট্টে, প্রধানতঃ হিন্দুর আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান একটিও টিঁকিবে না। কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ধনী মুসলমানের অর্থানুকূল্য অথবা ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানের সহায়তা কোনও কালেই বিশেষ মিলে নাই। মুসলমানেরা স্বভাবতঃই Exclusive.। নিজ সমাজের বাহিরে যাইতে চাহেন না।

শ্রীহট্টে শাহজলাল

আরব (ওমান) হইতে আগত শাহজলাল শ্রীহট্টের মুসলমান বিজয়ে সাহায্য করিয়া সহরেই আস্তানা গাড়েন। ঐ মহল্লা দরগা মহল্লা নামে খ্যাত। একতলা সমান উঁচু চত্বরে বৃহৎ মসজিদ্। পূর্বে তাহাতে একটি উটপাখীর ডিম ছিল। গেট ও বাহিরের একটি অট্টালিকা ছিল পাথরের। জয়ন্তিয়ায় ভাল পাথর পাওয়া যায়। একটি পাথর বাঁধানো পুকুরে অনেক 'গজার' মৎস্য আছে। এদের গায়ে লম্বা চুলের মত কি যেন বাহির হইয়াছে দেখা যায়। দরগার পেছনে বাঁধানো ফোয়ারায় লাল মাছ আছে। জল সুস্বাদু—লোকে ঔষধরূপে ব্যবহার করে। সহরে নবাগত হিন্দুরা প্রথমেই দরগায় সেলাম জানাইতে যায়। হরিহর ছত্রের মেলার পর পশ্চিমা মুসলমান ঘোড়া বিক্রেতা ও আতর বিক্রেতা এই দরগায় থাকিয়া মাল বিক্রয় করে। সহর-তলীতে শাহজ-লালের ভাগিনা শাহপরাণের একটি মসজিদ আছে।

দরগার আশেপাশে দুই চারিটি খর্জুর বৃক্ষ আছে—ফল ভাল হয় না। ছেলেবয়েসে ওখানে একটি উটও দেখিয়াছি। বাল্যকালে সিলেটে কুমারপাড়ায় একটি এক ইটের মসজিদ দেখিয়াছি। ঐটি দুই ফুট উঁচু। মনে হয় কাদা দিয়া মসজিদটি তৈয়ার করিয়া পরে উহা পুড়াইয়া ইট করা হয়।

শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমি

শ্রীচৈতন্যের পিতার বাসভূমি ঢাকা দক্ষিণ শ্রীহট্টে। টীলার উপর বাস্তু-ভিটায় বহুকালের পুরাতন মন্দির আছে। একটিতে বিগ্রহ আছেন। বড় নাট-মন্দির। চৈতন্যের পিতৃবংশ মিশ্রগণ সেবাইত। মিশ্রবংশের একজন পরে অন্যত্র একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন ; ঐ স্থানটি নাকি প্রকৃত বাস্তুভিটা। ইহা ধর্মের আড়ালে ব্যবসাবুদ্ধি। চৈত্রমাসে টীলার নীচে বড় দীঘির পাড়ে মেলা বসে। বহুলোক সমাগম হয়। ত্রিপুরার এক রাণী মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা দিয়াছেন। পুকুরপাড়ে বৃহৎ বাজার আছে।

মন্দিরের বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীচৈতন্য পিতামহীকে দেখিতে সিলেট আসিয়াছিলেন।

সিলেটে কায়কারবার

জিলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, পাট, মাছ ও চুনা। যুদ্ধের পূর্বে ধান রপ্তানী হইত—নৌকাযোগে ভৈরববাজার—তথা হইতে রেলে কাটিহার অঞ্চলে। জিলার মুসলমান কৃষক বর্ষাকালে গ্রাম হইতে পাট কিনিয়া নিজের নৌকায় নিকটবর্তী স্টীমার স্টেশনে সাহেব কোম্পানী বা মাড়ওয়ারী আড়তে বিক্রয় করিত।

পাট—শ্রীহট্টের উঁচু অঞ্চলের মাটি পাটচাষের উপযোগী নয়। নিম্নাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে নদীর ধারে পাট হয়—তবে মৈমনসিংহ, ত্রিপুরার মত অত বেশী হয় না। আমার বাড়ীর নিকটবর্তী "দীঘলবাঁকে"র পাটের বেশ সুনাম আছে বাজারে। আমাদের বাল্যকালে পাট রপ্তানী হইত না। কৃষক নিজের বাড়ীতে নিজ ব্যবহারের অনুপাতে চাষ করিত। তখন পাটকে বলা হইত নালিতা। পূর্ববঙ্গে ইহাকে 'কোষ্টা'ও বলে। নামটা কি সাবেক শিয়ালদহ রেলের শেষ সীমানা কুষ্টিয়া হইতে?

আমাদের ছেলেবয়সে পাটের দর ৫ টা. ১৯১৩ ইংরাজীতে ১০ টা. হয়—চাষীদের জমজমাট অবস্থা। ১৯১৪-১৮ ইংরাজীর যুদ্ধের পর পাটের দর ৩ টাকায় নামিল। এই যে পূর্ববঙ্গের চাষী পড়িল আর এখনও মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

মাছ—নিম্নভূমির নদীগুলিতে ও প্রান্তরের বিলে পাওয়া যায়। কিছু শিলং-এ মোটরযোগে কিছু স্টীমারে বঙ্গদেশে চালান হইত বরফ দিয়া। জিয়ল (অর্থাৎ জীবন্ত) মাছ নৌকায় শিলচরও যাইত। বাকী শুঁটকি হইয়া আসামের পাহাড়ে যাইত। ঐ সকল চালানী কারবার এখন ওলটপালট হইয়া গিয়াছে।

চা—চা হয় ত্রিপুরা পাহাড় সংলগ্ন সিলেটের দক্ষিণের উচ্চ ভূমিতে। কয়েকজন জমিদার ও দেশী কোম্পানীর বাগান আছে। করিমগঞ্জের ভাল ভাল বাগান—যথা শিলুয়া প্রভৃতি হিন্দুস্থানে পড়িয়াছে। দেশবিভাগের পর দুই বৎসর পাকিস্তানী চা অন্ততঃ হিন্দুস্থানী চায়ের সমান দর পায়। কিন্তু পাকিস্তানী (পূর্ব-পাকিস্তান) চায়ের উৎপাদন ব্যয় টাকার অঙ্কে হিন্দুস্থানের অর্ধেক অর্থাৎ একই মূল্যে বিক্রী হইলে লাভ বেশী।

তারপর রপ্তানির সুযোগের অভাবে, এবং কলকারখানা ইত্যাদি মেরামত না হওয়ায় পাকিস্তানী চায়ের অবস্থা হিন্দুস্থান হইতেও খারাপ। পাকিস্তানে সিলেট ছাড়া কেবল চট্টগ্রামে সামান্য চা আছে। আর কোথাও নাই।

চুনা—খাসিয়া পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া ছাতক অঞ্চলে নদীর ধারে নলখাগড়ায় পুড়াইয়া চুনা হয়। ইহাই সিলেট লাইম। এই কারবার সিলেটিয়া-

দের একচেটে ছিল। চাল্লিশ বৎসর যাবৎ কিলবার্ণ কোম্পানী সিলেট হইতে পাথর আনাইয়া কলিকাতায় চুনা পুড়াইতেন। ফলে বেলেঘাটার সিলেটী সাহা আড়তদারদের ক্ষতি হইয়াছে।

কমলা—খাসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জি ইত্যাদি স্থান হইতে কমলা ছাতকের বাজারে আসিত। সেখান হইতে জাহাজে, নৌকায় বেলেঘাটায় আসিত। কলিকাতার লোকে বলিত "সিলেটের নেবু"। এখন কমলা প্লেনে কলিকাতায় আসে।

বাঁশ—ত্রিপুরা পাহাড়ের বাঁশ সিলেটের রেল স্টেশন হইতে কলিকাতায় আসিয়া কাগজ বা ছাতার বাঁট হয়। বনজ সম্পদ সিলেটের কেবলমাত্র উত্তরে মিলে। পাহাড়ের নীচে জলাভূমিতে নলখাগড়া হয়। নলে চাটাই প্রস্তুত হয়। গৃহস্থ কৃষিকার্যের অবসরে বর্ষাকালে নিজ নৌকায় ২০।৩০ মাইল দূরে হইতে কাটিয়া আনিয়া চাটাই বানায়—নিজ ব্যবহার এবং বিক্রয়ের জন্য। ঐভাবে উহা কাছাড়ে যায় ঘর ছাউনীর ছন, বেত, আড়ার জন্য। কাছাড় হইতে ঝুড়ির বেত ও চাম-সুন্দরী, রামডাকু কাঠ জিলায় ব্যবহার হয়, বাহিরেও যায় কলিকাতায়ও যায়। সিলেটে কাকাইলছেও গ্রামে একটি স' মিল ছিল। চাম-সুন্দরী সেগুন হইতে নিকৃষ্ট তবে খাট, চৌকাঠ, চেয়ার হয়। রেল কোম্পানী সেগুন সহযোগে গাড়ী তৈরীতে ব্যবহার করেন। সরকার বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ সেগুন মেহগিনি টিলাভূমিতে রোপন করিতেছেন। ইংরেজ রাজের প্রচারক মুন্সী ছিল না, কিন্তু কাজ হইত। সিলেটে পি ডবলিউ ডি রাস্তার পাশে ১৯৪৭ হইতে বৃক্ষরোপণ করিয়াছে।

দক্ষিণ দিকের উচ্চভূমি রেললাইনের সন্নিকট বাজারসমূহে পশ্চিমা হিন্দু ছিল। ইহারা গরুর গাড়ী চালাইত। সিলেটে গরুর গাড়ীর ব্যবহার আর প্রায় নাই। সব চলাচলই নৌকায়। বিগত ২০ বৎসরে কয়েকটি ট্রাঙ্ক রোড হইয়াছে। তাহাতে বাস, লরী চলে। ১৯২০-তে অনন্ত নাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটরবোট প্যাসেঞ্জার সার্ভিস খোলেন। তাঁহার Mail contract ছিল। লাভ মন্দ করেন নাই।

আমি ১৯১২ ইংরাজীতে নিজের ব্যবহারের জন্য ৩৫ ফুট মোটরবোট করাই তিলজলার ক্লেগহর্ন কোম্পানীকে দিয়া। তখন কলিকাতায় মাত্র দুইখানা মোটরবোট ছিল—একখানা এক সাহেব কোম্পানীর আর একখানা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ধাপার মাঠের। সেক্রেটারী সুরেন্দ্র ঠাকুরের ('সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র) কাছে খবর নিলাম। বলিলেন—ধাপার বোটের কল প্রায়ই বিগড়ায়। শিলাইদহে ঠাকুরবাড়ীর আছে লুনভ্যালী মোটর। ইহা পেট্রল ইঞ্জিন নহে ; কেরোসিন পুড়াইয়া স্টীম ইঞ্জিন। আমার বোট ছিল এ্যালসাক্লেগ পেট্রল ইঞ্জিন—১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধের জন্য সরকার রিকুই-

জিশন করেন। ১৯২৮-এ ৫০ ফুটের বড় বোট করাইয়া বছর দুই সিলেটে সুনামগঞ্জ সার্ভিস চালাই। প্রথমে পেট্রল ইঞ্জিন পরে দুইটা ডিজেল ইঞ্জিন বসাইয়াছিলাম। স্টীমার কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত মেকানিকের অভাবে ক্ষতি হয়। ঐ বোটও ১৯৪১-এ যুদ্ধের সময় সরকার সুন্দরবন পাহারা দিবার জন্য রিকুইজিশন করেন। দুইটি বোটের বেলায়ই সালিশীতে মূল্য সাব্যস্ত হওয়ায় উপযুক্ত মূল্য পাইয়াছিলাম। নাগ কোম্পানীর সার্ভিস এখন নাই। আজমীরীগঞ্জ হইতে ভৈরববাজার পর্যন্ত স্থানীয় আজমান আলীর নূতন সার্ভিস হইয়াছে।

সিলেটের প্রাচীনকালের হস্তিদন্তের পাটী ইত্যাদির কারুকার্যের গল্পই শুনিয়াছি, দেখি নাই। সহরে এই কারিকরদের একটি পাড়া ছিল। এখন কারিকর নিশ্চিহ্ন। মুরশিদাবাদের নবাবপ্রাসাদে প্রায় একফুট দৈর্ঘ একফুট প্রস্থের একটি হাতীর দাঁতের দুর্গাপ্রতিমা রক্ষিত আছে দেখিয়াছি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে (১৯০২) খুড়ামহাশয় মনিপুর হইতে হাতীর দাঁতের দুইটি লাঠি আনাইয়াছিলেন। মনু অঞ্চলে এখনও ভাল শীতলপাটী (মুথোর) হয়। বেশ বিক্রয় হয়। খুব সরু পাটীর জন্য ফরমাইস দিতে হয়। খুব মিহি পাটী লখনৌ কংগ্রেস প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলাম। দুই একটি বৃদ্ধ কারিকর খুব সরু পাটী বুনিতে পারে। নূতন কেহ শিখে নাই।

সিলেট জেলার ভিতর দিয়া কাছাড় সুন্দরবন সার্ভিস প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে (১৮৮২) হয়। ইণ্ডিয়ান জেনারেল স্টীম নেভিগেশন ও রিভার স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী মার্কুলী হইতে সুনামগঞ্জ ছাতক হইয়া সিলেটে টেণ্ডার সার্ভিস খুলার পূর্বে কলিকাতায় আসিতে নৌকায় কুষ্ঠিয়া হইয়া রেল ধরিতে হইত। ১৮৯৫-তে আসামবেঙ্গল রেলওয়ে ছিল। ১৯০২-এ সিলেট ব্রাঞ্চ হয়।

শ্রীহট্টে ডাক্তার কবিরাজ

গ্রামের ডাক্তার কবিরাজের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীহট্ট সহরে যাওয়ার পর প্রথমে ঢাকার মহিম সেন ছিলেন আমাদের কবিরাজ। বড়িই প্রধান চিকিৎসা। প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বর হইত। ১৮৯৭ ইংরাজীতে ভূমিকম্পের পর শ্রীহট্ট সহরে জনসংখ্যা ১২ হাজার হইতে ৮ হাজারে নামে, কালাজ্বরের আক্রমণে। সহরতলী রায়নগর জনশূন্য হয়। এখনও অর্ধেক ভিটা খালি। কালাজ্বর এই প্রথম দেখা দিল ; বলা হইত ম্যালিগ্নান্ট্ ম্যালেরিয়া। তখন ডাক্তার ছিলেন কৃষ্ণ সান্যাল, বাড়ী নদীয়া। তাঁহার একপুত্র প্রবোধ আমার সতীর্থ ছিল, কালাজ্বরে মারা যায়। মিস রবার্ট নামে এক মিশনারী মহিলা

রোগীর সেবা করিতেন। এই মিস্ রবার্ট আমার খুল্লতাত ভ্রাতা সুধীরেন্দ্র-নারায়ণকে সাত মাসে জন্ম হওয়ার পর বহু যত্নে শুশ্রূষা করেন। প্রথম কিছু-কাল সমস্ত শরীর মায় মাথা তুলার ভিতর রাখিয়া কেবল নাসারন্ধ্র বাহিরে রাখিতেন। তিন চার বৎসর পরে আসেন ডাঃ বৈকুণ্ঠ নন্দী, এল, এম, এফ্, পাশ করিয়া। প্রথমাবধিই তিনি আমাদের পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন, আমরা দাদামহাশয় বলিতাম। খুড়ীমাকে কয়েকবার কঠিন প্রসবে রক্ষা করেন। তিনি 'বাবা' বলিতেন। আজীবন সহরে যশের সহিত চিকিৎসা করিয়াছেন। দুর্গা-চরণ কবিরাজ ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ। রঘুবংশ মুখস্থ বলিতে পারিতেন। পাগল গোছের লোক ছিলেন, বাড়ী ঢাকা। পালকী ভিন্ন মফস্বলে যাইতেন না।

১৯২০ ইংরাজীর পর সহরে বহু এম. বি. ডাক্তার আসিয়াছিলেন। সাহেব সিভিল সার্জনরা সাধারণতঃ ভাল ডাক্তার ছিলেন না, বোধহয় অভিজ্ঞতার অভাবে। কারণ কালোরা তাহাদের ডাকিত না। ফি ১৬ টাকা দেওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। খয়রাতী হাসপাতালে বংশী ডাক্তার (সাব এসিস্ট্যাণ্ট সার্জন) পূর্বকথিত দুর্গাদাদীর পায়ের ভাঙ্গা হাড়ের চিকিৎসা করেন। নূতন ঘোড়াকে ট্রেনিং দিবার কালে ঘোড়া ঘাবড়াইয়া যায়। দুর্গাসিংহ গাড়ী চালাইতেছিল। পড়িয়া গেলে তাহার পায়ের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া যায়। ৩ ইঞ্চি হাড়ের টুকরা কাটিয়া ফেলে। চিকিৎসায় বংশী ডাক্তারের খুব নাম হয়। সিভিল সার্জন ক্যাপ্‌টেন উড সহকারী ছিলেন। ইনি বিখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারী। খুড়ামহাশয়ের সহিত মাঝে মাঝে শিকারে যাইতেন। উড শিকারের পুস্তক লিখিয়াছেন। কর্ণেল আইরিশ ছিলেন বিচক্ষণ চিকিৎসক। প্রথম সিভিল সার্জন পাই হেম ব্যানার্জীকে, তাঁহার বাড়ী কলিকাতায়। খুড়ামহাশয় খয়রাতী হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড ঘর করিয়াছেন। এক ট্রাইসাইকেল কিনিয়া কিছুদিন চড়িয়া খুড়ামহাশয় বাইসাইকেল কিনেন। তখন বাইসাইকেল প্রথম আসিয়াছে। সাইকেলের আলো দেখিয়া রাত্রে রাস্তায় 'চোর চোর' বলিয়া লোক ধাওয়া করিয়াছিল।

পরিচিত পণ্ডিতগণ

পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। পণ্ডিত দয়াল-কৃষ্ণ তর্কতীর্থ, বাড়ী বুয়ালজুড়, বালাগঞ্জ শ্রীহট্ট। বিখ্যাত নৈয়ায়িক, নব্য-ন্যায়ের টীকা লিখিয়াছেন। ইহার ভূমিকায় ইউনিভারসিটির পঞ্চম জর্জ প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন 'নব্যন্যায়ের এরূপ বিশদ ব্যাখ্যার দুরূহ চেষ্টা এই প্রথম।' পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। পঁচাত্তর

বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পণ্ডিত ৩য় খণ্ড প্রকাশের চেষ্টায় ধনীদের দ্বারে এবং প্রেসে ঘোরাঘুরি করিতেন। তখন আমার সহিত বিশেষ পরিচয়। তাঁহার ব্যাকুল আগ্রহ, মৃত্যুর পূর্বে পুস্তিকা ছাপা শেষ করিয়া যাইবেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা এবং জ্ঞান বিতরণের আকুল আকাঙ্খায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয়। যাচ্ঞার পূর্বে দান সর্বোত্তম। 'দেব', 'দেই', 'দিচ্ছি' বলিয়া তিনবার প্রার্থীকে ঘুরাইবার কোনও কৈফিয়তই নাই। অথচ আমাদের সমাজের যেন ইহাই রীতি। পণ্ডিতের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় নাই।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাবারিধি বি. এ., করিমগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উপনিষদ, স্মৃতিতে অগাধ পাণ্ডিত্য। ছাত্রদের এবং বয়স্কদের শ্রদ্ধা, তিনি পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবলে আকর্ষণ করিয়াছেন। আমার সহিত শ্রীহট্টে চারি বৎসর পূর্বে বিশেষ পরিচয় হয়। হিন্দুর সমাজব্যবস্থা এবং টোলের পণ্ডিত সমাজকে বাঁচাইবার বিফল চেষ্টা তাঁহার সহযোগে করিয়াছিলাম। তিনি এখন কাশীবাসী।

৺প্রমথনাথ তর্কভূষণকে দেখি শ্রীহট্টে। সাহিত্য কন্ফারেন্সের সভাপতি হইয়া যান। তাঁহার মৃদু স্বভাব, পাণ্ডিত্য, হিন্দু ধর্মে, হিন্দু সভ্যতায় ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্বে যখন হিন্দু কোড নিয়া দেশে আলোচনা হইতেছে তখন কাশী হইতে আনন্দবাজার পত্রিকায় এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমরা প্রাচীনপন্থীদের মধ্যেও সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা আছে। নবীনপন্থীরা যদি হিন্দুধর্মের মূল নীতিগুলি স্বীকার করিয়া এই সংস্কার কার্য করেন তবে আমরাও হাত মিলাইতে পারি।" গর্বিত গান্ধী-পন্থী কংগ্রেস, (যাহার মূলনীতি—হিন্দু কোড রিপোর্টের ভাষায়—'fall in line with the world'—পাশ্চাত্যের অনুকরণ) এই আহ্বান তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখান করেন। প্রমথনাথ নাকি পরিণত বয়সে মিল্টন ও সেক্সপীয়র অভি-ধানের সাহায্যে পাঠ করিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন।

শ্রীহট্ট রেঙ্গা পরগণার রায়বাহাদুর রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৺রামরাম পণ্ডিতের পৌত্র। রামরাম ছিলেন 'জজ পণ্ডিত' অর্থাৎ ইংরাজ আমলের প্রথমে হিন্দু আইন সম্বন্ধে ইংরাজ বিচারককে ব্যবস্থা দিতেন। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী জজ বিচার করিতেন। ইঁহার পিতাও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। আমাদের পরিবারের সহিত ইঁহাদের সৌহার্দ্য আছে। ক্ষুদ্র জমিদার, অবস্থা এমন সচ্ছল নহে, কিন্তু এককালে পণ্ডিত রেবতীরমণ ভাওয়ালী১৭ করিয়া শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। পরগণার বহু গণ্যমান্য বড় জমিদার থাকা সত্বেও রমেশ ভট্টাচার্য সর্বোচ্চ মান্য। তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর হইয়াও কংগ্রেসকে সর্বদা সহায় সাহায্য করিয়াছেন। ইলেক্শনের সময় পোলিং ঘরের বারান্দায় বসিয়া থাকিতেন। ভোটারগণ হিন্দু ও মুসলমান

পক্ষের হউক অথবা প্রতিপক্ষের হউক সকলেই তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম বা সেলাম দিয়া তাঁহার অনুমতি নিয়া তবে ভোট ঘরে প্রবেশ করিত। এ সম্মান রাজসম্মান অপেক্ষাও বড়। এ প্রবলের সম্মান নয়—চরিত্রের সম্মান।

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের কথা কিছু পূর্বে বলিয়াছি। তিনি ভোজনবিলাসী ছিলেন। ইঁহার লিখিত কামরূপ শাসনাবলী প্রামাণ্য গ্রন্থ। তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে ইঁহার লেখা আছে। নিজ ব্যয়ে জয়ন্তীয়া পীঠের মন্দির সংস্কার করান। পরশুরাম কুণ্ডের উদ্ধারসাধন করেন। তেজীয়ান লোক। কাহারও সহিত বনিত না। "রামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রীয় পরমহংস উপাধি পাইতে পারেন না" বলিয়া রামকৃষ্ণ ভক্তদের চটাইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "রজোগুণে প্রবল, নেপোলিয়নতুল্য, কিন্তু সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী নহেন।"

সারদা আইন পাশ হওয়ার প্রতিবাদে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ও পেন্‌সন ত্যাগ করেন। স্যার আশুতোষের কন্যা কমলার প্রথম বিবাহ হয় আমার সতীর্থ শুভেন্দুর (বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্র) সহিত। শুভেন্দুর অকাল মৃত্যুর পর আশুবাবু যদু কাঞ্জিলাল নামক হাইকোর্ট উকিলের এক আত্মীয়র সহিত পুনরায় কন্যার বিবাহ দেন। সমাজের উচ্চস্তরে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বিধবাবিবাহ আর হয় নাই। এই বিবাহে সমাজে আলোড়ন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণও বিবাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ; বিদ্যাবিনোদ করেন নাই। প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণির দলের শেষ তার্কিক। তাঁহার পর প্রাচীনপন্থীরা হাল ছাড়িয়া নীরব। মাসিক পত্রিকায় প্রায়ই বাদানুবাদ করিতেন। আমার 'জনশক্তি' পত্রিকায় আমার পিসামহাশয় নগেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বিবেকানন্দবিষয়ক তুমুল বাদানুবাদ হয়। চারবার বাদপ্রতিবাদ ছাপাইয়া পরে বন্ধ করিয়া দেওয়ায় উভয়েই ক্ষুণ্ণ হয়েন। তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতাম।

বিদ্যাবিনোদের মত খাঁটি লোক আজ নাই বলিলেই চলে।

সারদা আইন পাশ হইবার পর রামনন্দবাবু প্রবাসী পত্রিকায় লিখেন, "ইহাতে পিতামাতার দায়িত্ব বাতিল, বিশেষভাবে মাতার ; সমাজের নিম্নস্তরে ইদানীং কন্যা-চরিত্র নষ্টের ঘন ঘন সংবাদে অনুমান হয় উচ্চস্তরে ও দায়িত্ব যথাযথ পালিত হইতেছে না।" পাশ্চাত্য প্রভাবে শালীনতার মাপকাঠিও বদলাইতেছে। পাশ্চাত্যেও স্বাধীনতা (যৌন স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রভেদ কি?) ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর সহবাস শাস্ত্রে মহা-পাপ। তজ্জন্যই সংস্কার বিবাহের বিধি। শাস্ত্র ব্যবস্থা হিন্দু মানিয়া চলিত। দুই একটি ব্যভিচারের১৮ দৃষ্টান্তে বিচলিত হইয়া অকেজো সারদা আইন করিয়া সরকার হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। বিলাতে বিবাহের বয়সের আইন নাই।

সেখানে বার বৎসরের কন্যার সন্তানবতী হওয়ার দৃষ্টান্ত এবং চৌদ্দ বৎসরে বিবাহের খবরও মাঝে মাঝে কাগজে দেখি। বাধ্যতামূলক হিন্দু কোড অকেজো হইবে। 'কাজ নাই তো মার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কর'। অল্পবয়সে সন্তানবতী হওয়ার দোষগুণ সম্বন্ধে বিলাতের ডাক্তারদের মধ্যেই বিভিন্ন মত।

সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনের তাৎপর্য কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়াছিলেন "বিষয়টি আধ্যাত্মিক ; আমি স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া চলি, তীর্থভ্রমণে অভূতপূর্ব আনন্দ পাই। তুমি গীতার অমুক নম্বর শ্লোকগুলি অনুধাবন করিবে।" কি খাঁটি লোক, ভড়ং নাই!

সারদা আইন অনাবশ্যক ও অকেজো হইলেও প্রণেতা হরবিলাস সারদাকে শ্রদ্ধা করি। মৃত্যুশয্যা হইতে এসেম্‌ব্লিতে উপস্থিত হইলে (ভোট দেওয়ার জন্য) দেখি।

শিলচরের ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব গোড়ার দিকে জনশক্তি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতার উপাসক, তেজী, জ্ঞানী ও ভক্ত। বহু উপনিষদ ও তন্ত্র পাঠ করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে জনশক্তিতে শক্তি-ভক্তিমূলক মনোজ্ঞ গান লিখিতেন। সিলেটে কিছুকাল ছিলেন (১৯০৭ ইং), তখন প্রায় একমাস গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন মনে আছে। ১৯১৩ সালের বন্যায় শিলচরে তাঁহার বাড়ীর একতলায় জল উঠায় দ্বিতলে আশ্রয় নেন। শুনিয়াছি, স্বেচ্ছা-সেবকগণ তাঁহার পরিবার ও জিনিষপত্র অন্যত্র সরানোর পর নৌকা নিয়া যখন তাঁহাকে আনিতে যায় তখন তাঁহার প্রথম প্রশ্ন, "আমার গ্রন্থ?" গ্রন্থ সরানোর পূর্বে পণ্ডিত কোথাও নড়িবেন না। পাঠক এতেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইবেন। অভাবে, কষ্টে জীবনযাপন করিয়া বার্ধক্যে মারা যান। তিনি কানে কম শুনিতেন। আমাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। প্রথমে শিলচরের সুরমা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীহট্টে পরিচিত কতিপয় ব্যক্তি

ছাত্রাবস্থা সময়ের সিলেটের ডাক্তার কবিরাজের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অপর ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করিতেছি।

'কুঞ্জ রায়—বাড়ী ছাতিয়ান। এল. এম. এফ. সরকারী ডাক্তার। কলিকাতার ছাত্রমেসে ইনি অপরের সকল কাজ বাজার করা, ডাক্তার দেখানো ইত্যাদি করিয়া দিতেন। মৃদুভাষী সজ্জন কঠোর পরিশ্রমী। 'চাঁদ রায়' নাটকের অনুসরণে তাঁহার ব্যঙ্গ নাম ছিল 'কচু রায়।' কয়েকবার ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল করেন। ডাক্তার হইবার বহু পরে বিবাহ করেন। নিঃসন্তান। শেষে অবসর গ্রহণ করিয়া

সিলেটে ভাড়াবাড়ীতে বাসকালে মারা যান। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার ভাইঝির চাকুরীর একটা সুবিধা করিয়া দিবার কথা বলেন। এরপর ইহারা যে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে জানি না।

সুরেন্দ্র দে—ঐ ছাতিয়ান গ্রামের অধিবাসী। বাবার পিসতুতো ভগ্নীর ছেলে। ছেলেবয়সে দুর্দান্ত ছিল। উঁচু আগডালে উঠা ইত্যাদি অসীম সাহসের কাজ করিত। কলিকাতায় বি.এ. পাঠকালে উকীল সারদা শ্যামের ছোট-ভাই দক্ষিণা শ্যামের সহিত এক সাধুর আস্তানায় যাইত। উভয়ে চুপ করিয়া অনেকক্ষণ টেবিলের নীচে বদ্ধমুষ্টি হইয়া বসিয়া থাকিত। একদিন তাহাকে সাধুর আড্ডা হইতে ধরিয়া আনি। কিন্তু রোগ বাড়িতেই থাকে। কথা বলিত না। ত্রিমুণ্ডী১৯ হইয়া বসিয়া থাকিত। খাবার দিলে কোনদিন খাইত কোন-দিন খাইত না। বিজয়রত্ন সেন কবিরাজকে দেখান হয়। তিনি বলেন—'ধর্মোন্মাদ—সারিবার নহে।' দিনে দিনে দুর্বল হইয়া মারা যায়। দক্ষিণা স্নায়ুদুর্বলতায় অকালে মারা যায়।

নবীন চক্রবর্তী—বাড়ী নদীয়া। পি. ডবলিউ. ডি.-র ওভারসিয়ার ছিলেন। ভাল ঘোড়সওয়ার ও পোলো খেলোয়াড়। তখন সাইকেল ছিল না। সকালে বিকালে ঘোড়ায় কার্যপরিদর্শনে বাহির হইতেন। সাহেবেরা পোলো খেলিতেন। সঙ্গে থাকিতেন, খুড়ামহাশয়, নবীন চক্রবর্তী ও মণিপুরী চৌরা সিং। সল্‌কেল্ড নামে এক পাজি জজ ছিল। খেলার সময় নবীনবাবুর ঘোড়ার পায়ে ইচ্ছা করিয়া ডাণ্ডা মারে। পরে নবীনবাবু সুবিধা পাইয়া তাহার কব্‌জিতে মারায় নালিশ করে। ক্যাপটেন পোর্টিওন (ডি.সি.) উত্তর দেন "Rightly served"।

'The Spider and Bruce' কবিতায় "Try again" পড়িয়াছিলাম। এর প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারি অনভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার, চা-কর হান্টের পোলো খেলার সময়। পাজি ঘোড়া হঠাৎ ছুট দেয়। থামাইতে গিয়া হান্ট জিনের ঘসায় রক্তাক্ত উরু। ঘোড়া হইতে নামিতেছিলেন, তখন ক্যাপটেনের "Hunt, try again" এই তীব্র আদেশে স্তম্ভিত হইয়া 'মর্ম' হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। নবীনবাবু সুদর্শন; শরীরও ছিল পূর্বকথিত ব্যায়ামবীর মর্তুজার মত। কাজকর্ম ও সুন্দর হস্তাক্ষরের খুব সুখ্যাতি করিতেন চীফ কমিশনার স্যার হেনরী কটন। নবীনবাবুর সহিত বছর কুড়ি পূর্বে (১৯৩৩-৩৪) আবার দেখা হয় কলিকাতায়।

পুলিশসুপার রিচি সাহেব সিলেটেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। লোক সাধু। তাঁহার মাদ্রাজী মেমের দিকে এক কন্যা কলিকাতায় পড়িত। মেম মারা গেলে এক মুসলমানী বিবাহ করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর মুসলমান স্ত্রীর আত্মীয়রা মুসলমানী মতে গোর দিতে চায়। পাদ্রী ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের

চেষ্টায় খৃষ্টিয়ান মতে গোর দেওয়া হয়। তাঁহার উইলের একজন একজি-কিউটার ছিলেন খুড়ামহাশয় (সুখময় চৌধুরী)।

যোগেশ গুপ্ত—আমার বাবার পিসীর সম্বন্ধসূত্রে আত্মীয়, সম্পর্কে দাদা। একসঙ্গে পড়ি, ফরেস্ট রেঞ্জার ছিলেন। তীক্ষ্ম উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। অবসর গ্রহণান্তে সিলেটে বাস করিতেন। তখন নিত্য ইঁহার সহিত গল্পগুজব হইত।

হেডমাস্টার দুর্গাকুমার বসু ব্যতীত মুরুব্বি বলিতে সরকারী চাকুরিয়া-দের মধ্যে হাকিম ঈশান পত্রনবীশ—বাড়ী ময়মনসিংহ ও নন্দবিহারী নন্দী—বাড়ী শ্রীহট্ট। শেষোক্তজন পূজাপার্বণে নেতৃত্ব দিতেন। ১৮৯৫-তে শ্রীহট্টে ফসল না হওয়ায় মনিপুর হইতে ও বর্মা হইতে চাউল আনান। দর ছিল মাত্র ৫ টাকা মণ। সেরেস্তাদার রুক্মিণী গুপ্ত আমার জেঠামহাশয় ও কাকা সুখময় চৌধুরীর সেরেস্তাদার। রামচন্দ্রদাসও মুরুব্বি ছিলেন।

আমাদের ছেলে বয়সে শ্রীহট্ট সহরে কালীঘাটে সিমেন নামে একটি সাহেব ছিল। কয়েক পুরুষ আগে তাহার পূর্বপুরুষ এখানে স্থায়ী বসতি করে। দীর্ঘকায় সরল; দরিদ্র কিন্তু চেহারা তেজব্যঞ্জক। ব্ল্যাকমেল ছিল একমাত্র ব্যবসা। ইহার কোনও বংশধরকে সিলেটে দেখি নাই। ইংরাজ আমলের প্রথমে হ্যারী এঙ্গলিস ছাতকে চুনা পাথরের ব্যবসা আরম্ভ করেন। বিস্তীর্ণ জমি-দারী করেন। ইঁহার দুই কন্যার নামে বিবি লেঞ্চী ও বিবি মেরী নামক দুইটি তালুক আছে। একটি এখন আমার অপরটি দস্তিদার পরিবারের। বাকী বিস্তীর্ণ জমিদারী ও চুনার কারবার ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর ক্রয় করিয়াছেন।

ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতা সিলেটে কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন। হাতী-খেদার বহু টাকা তছরূপ করায় ইঁহার চাকুরী যায়। যে টিলায় তাঁহার বাংলো ছিল এখনও তাহার নাম থ্যাকারে টিলা। আমরা যখন ছাত্র তখন ঘরবাড়ী ছিল না। এই টিলা ছিল বনভোজন স্থান। পরে সরকার সেখানে এ. ডি. এমের বাংলো তৈরী করিয়াছেন। রেফারেন্স বইতে লেখা আছে কবির জন্ম কলি-কাতায় কিন্তু হেডমাস্টার দুর্গাকুমার বসু আমাদের বলেন—কবির জন্ম সিলেটে।

১৯৩৫ ইংরাজীতে হাইকোর্ট জজ বার্টলির ভ্রাতা সিলেটে পুলিশ সুপার ছিলেন। ইঁহারা আইরিশ। বিপ্লবী বলিয়া দাগী এক ব্যক্তি (নামটি ভুলিয়া গিয়াছি) সারা জীবন পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া বিদেশে পলায়ন করে। পরে দেশে আসিয়াও সোয়াস্তি নাই। যদিচ ইহার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই তথাপি পুলিশ ইহার পিছু নিত। কেহ তাহাকে কোন কাজ অথবা আশ্রয় দিলে পুলিশ কর্মদাতা, আশ্রয়-

দাতাকে শাসাইত। সারা জীবন ভুগিয়াছে। কয়েকবার হাজতেও ছিল। ডবল হার্নিয়া ছিল। কষ্টে যষ্টিতে ভর দিয়া হাঁটিত। লোকটি দুইবার আমার কাছে আসে। কিছু সাহায্য দিয়া প্রথমবার অন্যত্র প্রেরণ করি। দ্বিতীয়বার ১৯৩৫-এ যখন আসে তখন তাহার শেষ দশা প্রায়। জীবনব্যাপী দুর্ভোগে হতবুদ্ধি হইয়াছে। বুঝিলাম কলিকাতার পুলিশের দাগীর লিস্টে নাম থাকা পর্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি নাই। স্থানীয় পুলিশ হুকুমের চাকরমাত্র। কলিকাতার পথ-ভাড়া দিলাম। এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের নিকট তাহার হস্তে একখানি পত্রও দেই। প্রফুল্লবাবু তখন রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের জন্য কাজ করিতেন। যাহাতে সে নির্বিঘ্নে কলিকাতা যাইতে পারে, স্থানীয় পুলিশ তাহাকে জ্বালাতন না করে তজ্জন্য পত্র দিয়া তাহাকে বার্টলির নিকট পাঠাই। বার্টলি তখন মফঃস্বলে। ডেপুটি সুপার প্রবোধ পালিত পুলিশ অফিস হইতে কিছু চাঁদা তুলিয়া তাহাকে সাহায্য করেন। পরে বার্টলি আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তায় বুঝিলাম এই আইরিশ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বলিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রাতা জজকেও ঐ লোকটির বিষয়ে পত্র দিতে পারেন। কলিকাতার পথে লোকটি পথ হইতে আমাকে পত্র দিয়া জানায় যে ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে তাঁহার সহিত ঢাকা যাইতেছে। এরপর তাহার কোনো খবর পাই নাই। এইরূপে সময় সময় কয়েকটি যুবককে সাময়িক সাহায্য দিয়াছি। পরে কাহার কি হইয়াছে কে জানে। ধূমকেতুর মত দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। একটি যুবকের কথা মনে হইতেছে—বহু মাস ফেরার ছিল। আমার একটি ছোট নাতনীকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল "বাড়ীতে আমার এই রকম একটা বোন আছে।" তাহার বাপ কলিকাতায়, ইঞ্জিনিয়ার। বছর খানেক পর শিলং-এ আমার এক ছেলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে সে টিউশনী করিত।

বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাসের সহিত সিলেটে একবার সাক্ষাৎ হয়।

করিমগঞ্জের রামচন্দ্রবাবু মোক্তার ও সতীশ দেব সরকারী উকিল ছিলেন মুরুব্বি। ১৯০৫ হইতে এই দুই বন্ধু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক। রামচন্দ্রবাবু পিছন হইতে কর্মীদের পরিচালনা করিতেন।

খানবাহাদুর আবদুল মজিদের পরিবারের সহিত আমাদের সৌহার্দ্য তিন পুরুষের। ইনি প্রথমে ১৯১২ ইংরাজীতে উভয়বঙ্গের পুনর্মিলনের সময় শ্রীহট্ট বঙ্গভুক্ত থাকার বিপক্ষে মত দেন। ১৯২৩-এ আমার অনুরোধেই শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির দাবী সমর্থন করেন। গবর্ণর বীটসন বেলের কাছে অকপটে ইহা স্বীকার করায় সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কিছুকাল পরে ১ম মন্ত্রী করেন। রীতি ছিল সুর্মা উপত্যকা হইতে একজন ও আসাম উপত্যকা হইতে একজন মন্ত্রী হইবেন। ইনি সত্যই মুসলীম সমাজের মুরুব্বি

ও সত্যিকার নেতা ছিলেন যেমন ছিলেন গান্ধীপূর্ব যুগে সুরেন্দ্রবাবু অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি। সমিতির ভোটাভুটিতে সত্যিকার নেতা মিলে না। গান্ধীবাদী ধীরেনদাদার ভাষায় "ভোটাভুটি শয়তানের কল"।

সৈয়দ মামুদ প্রভৃতির সময় হিন্দুমুসলমান মৈত্রী ছিল নেতাদের মৈত্রী। আবদুল মজিদ হিন্দু নেতাদের সহিত মিলিয়া কাজ করিতেন। ইঁহাদের এক-যোগে All India Tea and Trading Company গঠন করেন। মৎস্যজীবী মুসলমান সমাজকে সামাজিক মর্যাদা দিয়া বহু চাঁদা আদায় করিয়া মুসলিম হল নির্মাণ আরম্ভ করেন। ইহা সম্পূর্ণ হইয়া এখন 'জিন্না হল' নামে খ্যাত।

খানবাহাদুর এহিয়া ওরফে জিতু মিঞা ছিলেন আবদুল কাদিরের পুত্র। বাড়ীতে পড়িয়া ভাল আরবীর পণ্ডিত হইয়াছিলেন। সরল, পাগ্‌লাটে ধরণের লোক। চীফ কমিশনার ও তদীয় পত্নীকে বলিতেন 'Father, Mother'। ইংরেজের যদি কেহ প্রকৃত রাজভক্ত প্রজা থাকে তবে, তিনি জিতু মিঞা ; ইংরাজরাজই দয়ালু রক্ষক, সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি ট্রাস্ট করিয়া একমাত্র জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এক্‌জিকিউটার করেন। ঢাকার নবাবের বিধবাকে বিবাহ করিয়া আভিজাত্যের গৌরব করিতেন।

খান বাহাদুর আহ্‌মদ বক্ত মজুমদার ও মাহমুদ বক্ত মজুমদার সহরের বিখ্যাত জমিদার মজুমদার পরিবারভুক্ত। আহ্‌মদ বক্ত ছিলেন ডেপুটি কালেক্‌-টর। জয়ন্তিয়ার রাজাকে কালীবাড়ীতে নরবলির মিথ্যা অভিযোগে রাজ্যচ্যুত করার পর জয়ন্তিয়ার সেট্‌লমেন্ট করেন। সমগ্র জয়ন্তিয়া খাসমহাল। রাজার ওয়ারিশ দুই ভাগিনাকে (পাহাড়ীজাতির উত্তরাধিকার কন্যাগত) শুধু অর্থ ও রাজবাটী দেওয়া হয়। জিলা জজ ছিলেন ইহাদের অভিভাবক। ইহারা সিলেটে আমাদের বাড়ীর পাশে থাকিত। স্কুলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। বড় নরসিংহের অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হয়। ছোট ছত্রসিংহের জামাতা জন্মেজয় বর্মন আসামে কালেক্‌টর।

খানবাহাদুর মাহমুদ বক্ত মজুমদার সরল প্রকৃতি। আমাদের সময় কিছু-কাল আসাম কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। সামান্য ইংরাজী জানিতেন। লিখা বক্তৃতা পাঠকালে autonomy শব্দ না বুঝিয়া antimony বলিয়াছিলেন। ইহা লইয়া হাসাহাসি হইত—এখনও এইরূপ হাসাহাসি হয়। বিদেশী ভাষা-জ্ঞান নেতৃত্বের মাপকাঠি নহে। ধড়িবাজ আধুনিক নেতা অপেক্ষা সাবেকী মুরুব্বিরা ছিলেন ভাল।

পৃথিমপাশার জমিদারী সিলেটে সবচেয়ে বড়। ইহারা সিয়াসম্প্রদায়। আলি আমজাদ খান আমার পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী। বেশী পড়েন নাই, ভাল শিকারী ছিলেন। তেজী, তীক্ষ্নবুদ্ধি। জমিদারী শাসন ভাল ছিল। চা-করদের 'সুরমাভ্যালী লাইট হর্সের' এক সভায় নবাগত এক সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া

টুপি না তোলায় লাঠি দিয়া টুপি সরাইয়া দিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান, সাহেব সকলে তাঁহাকে মান্য করিত। তাঁহার সেরেস্তায় কর্মচারীগণ ছিল সব হিন্দু। এখনও বহু হিন্দু আছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় আলী হায়দর খাঁ ও আলী আসগর খাঁ। আলী হায়দর একবার বড়দলই মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। দুই ভাই মুর্শিদাবাদ নবাববাড়ীতে বিবাহ করিয়াছেন।

মছন্দর আলীকে ১৩১৬ বাংলায় (১৯০৯ ইং) সিলেট বারে দেখিয়াছি। শান্ত প্রকৃতি, উদার মতবাদ—কলিকাতার ব্যারিষ্টার খোদাবক্সের মত। তাঁহার জ্ঞাতি খানবাহাদুর আমজাদ আলী ছিলেন উকীল পরে সরকারী উকীল। ইনি খানবাহাদুর আবদুল মজিদের অনুগত ছিলেন। তাঁহারই আমলে খিলাফৎ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন লয়েড, আই. সি. এস। ইহাদের সভায় 'লড়ে, লড়ে'২০ বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি হইত। লয়েড ছিলেন রসিক। বলিতেন "আমি লড়ে না, আমজাদ লড়ে"। আমজাদ আলী করিৎকর্মা ব্যক্তি। Driving force ছিল। একা বহুর বিপক্ষে দাঁড়াইবার সাহস ছিল। সিলেটে যখন লয়েড ছাতা বগলে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে ক্যানভাস করিতেন তখনই ইংরেজের প্রেস্টিজ গেল।

সুনামগঞ্জের মোক্তার গিরিশ দত্ত (বাড়ী ইশাখপুর) ও অভয় দাস জালিয়ানওয়ালা বাগের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া উৎসাহের সহিত পরিচালনা করেন। গিরিশবাবুর সহধর্মিণী ও পুত্রেরা ১৯৩৪-এর আইন-অমান্য আন্দোলনে জেলে যান। সমগ্র জিলায় ত্রিশ চল্লিশজন নারী জেলে যান। তন্মধ্যে শ্রীহট্ট মহিলা সমিতির নেত্রী জোবেদা খাতুন ও সম্পাদিকা সরলা দেব। জোবেদা খাতুন পরে লীগ দলে যোগ দেন। ইনি মন্ত্রী তফজ্জল আলীর শাশুড়ী।

সুনামগঞ্জের হাছন রজা জমিদার-ছিলেন। আউলিয়া। তাঁহার ভক্তিভাবের গান রবিবাবুর প্রশংসা লাভ করে। ঘোড়দৌড় ভালবাসিতেন। লাল জরিওয়ালা ভেলভেটের চোগা, পাগড়ী পরিতেন। নদীতে সখীগণসহ নৌকাবিহার করিতেন। সুনামগঞ্জ সহরে যানবাহন নাই। তিনি চাকরের স্কন্ধেও ভ্রমণ করিতেন শুনিয়াছি। সাবেকী লোক, মুরুব্বিয়ানা ছিল। আশ্রিতআত্মীয় ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। ইঁহার একপুত্র একলিমুর রজা ও আর এক পুত্র আফতাবুর রজা কংগ্রেসে ছিলেন। হাছন রজার একটি গান লোকমুখে সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায়—

"হাছন রজা মরিয়া গেলে মাটির তলে বাসা
কোথায় রবে লখনছিরি কোথায় রামপাশা।"

লখনছিরি, রামপাশা তাঁহার জমিদারী।

১৯৩০ ইংরাজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সিলেটের পুলিশ সুপার ছিলেন **বোমণ্ট**। লোকটার মাথায় ছিট ছিল। মাতালও ছিল। অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে জগৎসী দয়ানন্দ আশ্রমের মহেন্দ্র পুলিশের গুলিতে মারা যায়। এই অভিযানের নেতা ছিল বোমণ্ট। তখন সে এডিশনাল পুলিশ-সুপার। ভীষণ বেগে সহরের মধ্যে গাড়ী চালাইত। গাড়ী চালাইবার লাইসেন্স দিবার পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে বাজারের ভিতর দিয়া জোরে গাড়ী চালাইবার আদেশ দিয়া পরীক্ষা করিত। আশ্চর্য, জোরে গাড়ী চালান সত্ত্বেও তাহার গাড়ীর কলের অবস্থা ভাল ছিল। তাহার পরীক্ষা প্রণালী সমীচীন নহে বলিতে পারি না। পরে বিলাতে মাতাল অবস্থায় গাড়ী উল্টাইয়া মারা যায়। ১৯৩০ ইংরাজীতে আমাদের সিলেট জেল হইতে তেজপুর জেলে বদলি করার সময় জেলগেট হইতে রেলস্টেশন পর্যন্ত স্বয়ং আমার সঙ্গে ছিল। জেলগেটে আমাকে বলিল "আমার গাড়ীতে বস।" জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার পাশে বসিব?"

বলিল "হ্যাঁ"।

তখন উত্তর দিয়াছিলাম "দেশটা তোমাদের হাতে ছাড়িয়া পলাইয়া যাইব এত বোকা নহি।"

তখন সাহেব পাগলের মত এমন বিকট হাসিয়াছিল যে পোয়া মাইল দূরে বাজারের লোক শুনিয়াছিল। পাগল কিন্তু একটা সত্য কথা বলিয়াছিল। আদালতে আমাদের হাতে বই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "কি বই"? মহাভারত শুনিয়া বলিল "মরা ভারত"। ভারত জীবন্মৃতই বটে!

কালাহান সাহেব সিলেটের আর এক পুলিশ সুপার। ইনি পরে আই. জি. হন। বিচক্ষণ লোক। পুলিশ রি-অর্গানিজেশন কমিটিতে আমার সাক্ষ্যের সহিত তিনি সব বিষয়ে একমত হন। ১৯৩৫ ইংরাজীতে পুলিশ সুপার বিনোদ গুপ্ত দ্বারা আমাকে অনুরোধ করেন আবার কাউন্সিলে যাইতে। অনুরূপ অনুরোধ করেন ফরেস্ট বিভাগের কর্তা বর সাহেব—যদিও ইঁহাকে পাবলিক একাউন্টস্ কমিটিতে একবার বেয়াদবির জন্য খুব ধমক দিয়াছিলাম।

বার্নাড ছিল সিলেটের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। লোকটি পরিশ্রমী, সৎ ও কার্যদক্ষ। জয়ন্তিয়ার বন্যায় সিলেট শিলং রাস্তা প্রতি বৎসর জলমগ্ন হইত। কয়েকটি নূতন পুল নির্মাণ করিয়া তাহা নিবারণ করেন। কখনও শিলং-এর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিয়া সময় অপব্যয় করিত না। নূতন কাজের দরকার হইলে স্বয়ং চীফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হুকুম লইয়া আসিত। তাহার দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজের দুর্নীতি এখন বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি ইংরেজের কর্মী-চরিত্র, রাজনৈতিক চরিত্রের ভক্ত কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির মোটেই ভক্ত

নহি। রাজনৈতিক চরিত্র বিষয়ে স্যার ডবলিউ রীড আমাকে বলেন "তোমরা ভাল মন্ত্রী হইতে পারিবে বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রজার ও রাজপুরুষের আইন-শৃঙ্খলারক্ষার ট্র্যাডিশন জাতিগতভাবে অভ্যাস হইতে সময় লাগে, তাহা ভুলিও না।"

সিলেটের জিলাকর্তা **ডসন সাহেবের** কথা অন্যত্র উল্লেখ আছে। ছয় মাস দিনরাত্রি কোন কেরানীর সাহায্য ছাড়া বন্যার কাজ করিয়াছিল। স্মৃতিশক্তি ছিল অদ্ভুত। একটু একগুঁয়ে হইলেও অন্তর ছিল ভাল। লেবারাইট ছিল। আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতাম। বলিয়াছিলাম "তোমার পদে থাকিলে হয় তো আমি তোমার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতাম। আমার পদে থাকিলে তুমিও আমার মতাবলম্বী হইতে।"

পদ ও মতের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। ইহা না বুঝিলে নিরর্থক বিদ্বেষ উপজাত হয়।

বঙ্কবিহারী দাস—জাতি বৈশ্য সাহা, জমিদার। ভাল বাদক ছিলেন। জমিদার মহেন্দ্রবাবুর জামাতা। সহরের বহু জায়গা এই পরিবারের ছিল। বঙ্কবাবুর পুত্র বনোয়ারীলাল মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ছিলেন। বীরেন্দ্র-লাল লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। অপর ভ্রাতা কুটলীবাবু ও বিনোদলাল। সহরে প্রচুর সম্পত্তি থাকায় মিউনিসিপ্যালিটিতে বহুকাল ইঁহাদের আধি-পত্য ছিল। মহেন্দ্রবাবুর পুত্র হেমেন্দ্র সাহিত্যিক।

ইংরেজী শিক্ষিত উকীল মোক্তার আমলারা সহরে আসার পূর্বে (১৮৫০) সহর সাহা ও মুসলমান প্রধান ছিল। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কেন্দ্র ছিল সহরতলী আখালিয়া গ্রাম। নবাগতদের মিউনিসিপ্যালিটী দখল করার চেষ্টার ফলে দ্বন্দ্ব লাগিয়াই থাকিত। ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে আবার ঢাকা বিক্রম-পুরীরা ছিল অগ্রণী। ঢাকা বনাম সিলেট দ্বন্দ্ব ১৯০০ হইতে প্রায় লোপ পায়। এই বিরোধ ছিল সরকারী অফিসে চাকুরী ও প্রমোশন বিষয়ে। সমাজে ঢাকাইয়াদের আভিজাত্যের বড়াইও ছিল। বিক্রমপুরীরা 'আমাদের' স্থলে 'আমাগোর' বলে—এ জন্য আমরা ঠাট্টা করি।

মাত্র চল্লিশ বৎসর পূর্বে (১৯১৩-১৪) সুনামগঞ্জের মজলিসে রাজস্ব সচিব রীড সাহেবকে সুরেশ দাস হাকিমের বালিকা কন্যা মাল্যদান করায় পণ্ডিত কালীজয় কাব্যতীর্থ উকীল মন্তব্য করেন "ইহা গান্ধর্ব বিবাহ।" প্রাচীনপন্থীরা বিরক্ত হইয়াছিলেন। আজ বড়দের মাল্যদান করিবার নিমিত্ত মেয়েরা লালায়িত। আধুনিক রাজা রাজড়াদের তবে তো রাজা দশরথের পথ গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় জনৈক উকীল, চীফ কমিশনারের জাহাজে জলযোগকালে একটি মাত্র কলা খাওয়ায় সমাজে কিছুকাল একঘরে ছিলেন।

এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ মোক্তার। ত্রিশ বৎসর মধ্যে তাঁহারই কন্যা অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছে। সমাজের কি দ্রুত পরিবর্তন!

মহম্মদ দাইম উকীলকে ১৩১৬ বাংলায় 'বারে' দেখিয়াছি। ইনি ভাটী-পাড়ার চৌধুরী বংশের। বৃদ্ধ ছিলেন সিলেট জিলার প্রথম গ্র্যাজুয়েট। একটু মাথা খারাপ ছিল। ওকালতীতে ভাল ছিলেন না। প্রমোদ দত্ত ও পরবর্তী কালের পাবলিক প্রসিকিউটার অম্বিকা দাস ইঁহার সহিত প্র্যাকটিকাল জোক্ করিয়া বড় জ্বালাতন করিতেন।

গৌরচন্দ্র দাস হাকিম, ক্রিশ্চিয়ান। সেখঘাটে বাড়ী। বৃদ্ধ বয়সেও সবল ছিলেন। সদানন্দ পুরুষ। ইনি আমাদের আত্মীয় হাকিম শম্ভুনারায়ণ সিংহের সমসাময়িক। শম্ভুবাবু জয়ন্তিয়া পরগণায় দ্বিতীয়বার সেটেলমেন্ট করেন। গৌরবাবুর পুত্র প্রেমবাবু কালেক্টরীতে কাজ করিতেন। শুনিয়াছি যৌবনে হাকিমবাবুরা সাড়ীগয়না পরিয়া নাচিতেন। শম্ভুবাবু ছিলেন বেহালাবাদক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ধর ওরফে যতিবাবুর সিলেটে ট্রাক বাসের কারবার ছিল। কংগ্রেসে নানারূপ সাহায্য করিতেন। কর্মঠ, কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন লোক। নোয়া-খালি-দাঙ্গার পর সিলেটে আগত দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সমিতি হয়। তখন আমি অসুস্থ। কর্তৃত্ব নিতে অনুরুদ্ধ হইয়া 'যদি ভাল সেক্রেটারী পাই তো নিব' স্বীকার করি। যতিবাবুকে বাছিয়া নিলাম। সাহায্য সমিতিতে আমি সর্বদাই সেক্রেটারীপদ পছন্দ করিতাম। কারণ সেক্রেটারীই সমিতির প্রাণ।

প্রত্যহ দুইবার অফিসে এবং ক্যাম্পে যাইতাম। যতিবাবু কয়েকদিন পরে বলেন "আপনার ঘন ঘন আসবার দরকার নাই। দায়িত্ব যখন গ্রহণ করিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

এরপর একদিন ক্যাম্পের জলের পাম্প বিগড়াইয়া গেলে যতিবাবু তাড়া-তাড়ি মেরামত করিবার জন্য অক্লান্ত শ্রম করেন। বাড়ী ফিরিয়াই তাঁহার স্ট্রোক হয়। এর ফলে তিনি এখনও একরূপ অকর্মণ্য। এই শ্রেণীর নীরব দায়িত্বশীল কর্মীই সেরা মানুষ। ইঁহারা হৈ চৈ, বক্তৃতা করেন না।

"মহাশয়ের" বাড়ী শ্রীহট্ট, তরফ তুঙ্গেশ্বর, সেনমজুমদার পরিবার—জিলা ব্যাপিয়া এই নামে খ্যাত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই 'মহাশয়' বলা হয়। ইঁহারা ব্রাহ্মণ না হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত চরিত্র বলে এই উপাধি অর্জন করেন। দেবদ্বিজে ভক্তি, দান, বিদ্যা, বিনয় ও আচারের দ্বারা এই সম্মান লাভ করিয়া-ছেন। কয়েক পুরুষ গত হইলেও এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য এখনও বজায় আছে। সিলেটে এই পরিবারের এক যুবক সবডেপুটীর সহিত বিশেষ পরিচয় হওয়ায় ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

চক্রবর্তী পদবীধারী এক. আই. এম. এস. সিলেটে সিভিল সার্জন ছিল ১৩১৬ বাংলায়। বলিত, অল্পবয়সে বিলাত গিয়া বাংলা ভুলিয়া গিয়াছে। সাহেবরা ডিনারপার্টিতে কই মাছের নাম জিজ্ঞেস করায় বলে "জানি না।" এই নিয়া খুব হাসাহাসি হইত। ইম্পিরিয়েল সার্ভিসের কালা সাহেবেরাও কালা আদমীর সহিত মিশিতেন না। তাঁহারা যে নৈকষ্যকুলীন! স্বাধীন ভারতেও বিলাতফের্তা না হইলে উচ্চপদে আরোহণ কঠিন। (আবার এক নতুন আভিজাত্য শুধু নয়, সাদা নারী আমদানীতে একটা নূতন Race-ই সৃষ্টি হইতেছে যাহাদের "হোম" অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ম্যানচেষ্টার।) গান্ধী অক্সফোর্ড শাখার জওহরলাল কেম্ব্রিজ শাখার।

ঢাকা দক্ষিণের মধ্যবিত্ত জমিদার **কালীকৃষ্ণ চৌধুরীর** মত ঘরদরজা, কাপড়চোপড়, খাওয়াদাওয়া এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাহারও দেখি নাই।

সহরের রতনমণি খাজাঞ্চির বাড়ীর গৃহজামাতা লোকনাথ **শর্মাকে** দেখিয়াছি। বিচক্ষণ লোক। দাদামহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার একযোগে দাদামহাশয় আদমপুর পরগণা ক্রয় করিয়া গোবিন্দপুর চা-বাগান পত্তন করেন। লোকনাথের পুত্র রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ছিলেন। আর গৃহজামাতা নগেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কাউন্সিলসদস্য। নগেন্দ্র চৌধুরীর গৃহজামাতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বামী সৌম্যানন্দ—সাবেক নিবাস শ্রীহট্ট, দুলালী। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের শিলং-এর ভারপ্রাপ্ত। ভাল পাখোয়াজ বাদক ও গায়ক। ১৯২৯-এর বন্যার সময় যুবক। স্বল্পভাষী ও সেবাধর্মী। ইহার অধীনে সাহায্য কেন্দ্রগুলিতে ভাল কাজ হইত। বহুবার ইঁহারা আর্তত্রাণে সাহায্য করিয়াছেন।

স্বামী **কৃষ্ণচৈতন্য**—বাড়ী সিংহেরকাচ, শ্রীহট্ট। হাতে রুটি বেলিয়া স্বহস্তে শত শত দরিদ্রকে পরিবেশনে পরিতোষ লাভ করিতেন।

তজমুল আলী চৌধুরী, কানিহাটি-শ্রীহট্ট, অবসরপ্রাপ্ত হাকিম। খুড়ামহাশয়ের বন্ধু। কয়েক বৎসর পূর্বে বৃহৎ জমিদারী বহু মূল্যে ক্রয় করেন। জমিদারী উচ্ছেদে ইঁহার সর্বনাশ হইবে। অতি বৃদ্ধ সজ্জন ও বিনয়ী। আমার মাইজভাগের বক্তৃতার জন্য রাজদ্রোহের মামলায় সরকারী সাক্ষী ছিলেন। বক্তৃতার যথাযথ বর্ণনা দেন।

সুপ্রসিদ্ধ **রমেশচন্দ্র দত্ত** (আই, সি, এস, সাহিত্যিক) অবসর গ্রহণান্তে জামাতা সিলেটের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বলিনারায়ণ বড়ুয়ার বাড়ীতে কয়েকমাস ছিলেন। মনা রায়ের টিলার বাংলার উপর হইতে সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, গাছপালার জন্য গৃহাদি বড় দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বড় জামাতা প্রমথনাথ বসুও সিলেট যান। ইনি রাঁচী থাকিতেন। ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন।

সার্ভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভ্য **দেওধর** একবার সিলেটে গিয়াছিলেন।

বরোদার মহারাজা এক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতকে সিলেটে পাঠান প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহে। ইনি আমাদের অতিথি ছিলেন। বাংলা, ইংরাজী জানিতেন না, সংস্কৃত বলিতে হইত। সিলেটের পণ্ডিতরা আবার সংস্কৃত দ্রুত বলিতে পারেন না। বি. এন. রাও তখন জজ। তাঁহার সহিত পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। পণ্ডিত সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। স্ত্রী রান্না করিতেন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে একপাত্রে আহার করিতেন।

১৯০৩ ইংরাজীতে বরোদার মহারাজার প্রেরিত এক ডাক্তার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে সকল ছাত্রের চক্ষু পরীক্ষা করেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই প্রথম অনুসন্ধান। বরোদা সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ছিল। অরবিন্দ ঘোষ, রমেশ দত্ত বরোদায় কাজ করিয়াছেন। বহুপূর্বে এই রাজ্যে সমাজ সংস্কার আরম্ভ হয়—তাহা বর্তমান ভারতে ইঙ্গভারতীয় নেতাদের গায়ের জোরে তাড়াহুড়া করিয়া রিভোলিউশনারী সংস্কার নহে। বরোদায় সারদা আইনের বহুপূর্বে কন্যার বিবাহের বয়স বারো করা হয়। ব্রাহ্মণ্যসমাজ রক্ষার্থ ব্যবস্থা হয় পুরোহিতদের পরীক্ষা পাশ করিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। বরোদারাজ ব্রাহ্মণ শুনিলেই আঁতকাইয়া উঠিতেন না এবং বর্তমান এম. পি.-দের মত 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনের বলে সংশোধন করিব' এইরূপ বড়াইও করিতেন না। রামচন্দ্র কি আকবরের মুখে হয় তো এরূপ কথা সাজিত কিন্তু ডিমোক্রেসী ও জনমতের শাসনের পুরোহিতগণ কোন মুখে এরূপ কথা বলেন? বস্তুতঃ ইহারা সমাজসংস্কার চাহেন না সমাজ ভাঙিতে চাহেন। নিজেরা যে লেজকাটা শেয়াল!

রায়বাহাদুর **রমণীমোহন দাস** (বাড়ী আখালিয়া শ্রীহট্ট) বঙ্গদেশে হাকিম ছিলেন। ছালেঙ্গাহাটের স্বদেশী হাঙ্গামায় গুলি চলার জন্য ইঁহার দুর্নাম হয়। বঙ্গভুক্তি আন্দোলনে আমার সহকারী ছিলেন। সিলেট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া বহু লোকের সর্বনাশ হইয়াছে। অনুরূপ অখিল দত্ত (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সহসভাপতি) স্থাপিত পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কও তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে ফেল হয়। হেমেন্দ্র দত্ত স্থাপিত প্রতিষ্ঠান নিয়াও পিতাপুত্রের উপর ফৌজদারী মোকদ্দমা হয়।

সিলেটে একবার ডঃ **অমিয় চক্রবর্তীর** সহিত আমার বাড়ীতে আধঘণ্টা আলাপ হয়। শান্তিনিকেতনের চিন্তাধারা বনাম মনুস্মৃতি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। অতি বিনয়ী লোক। বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে একবার বলিয়াছিলেন—"যাহারা রবীন্দ্রভক্ত বলিয়া পরিচিত

তাহাদের মধ্যেও অতি অল্প সংখ্যকই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত সমঝদার।" নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে বোলপুরে অভিনন্দন জানাইতে যান রবিবাবু তাঁহাদের বলেন "এতদিন তো আমার সুখ্যাতি কর নি? পরের মুখে ঝাল খাও!"

এই দলে বাংলার বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। পরের মুখে ঝাল যাহারা খায় তাহারা অন্তঃসারশূন্য। গান্ধীও ইংল্যান্ড যাত্রাকালে বোম্বাই-এ জাহাজে বলিয়াছিলেন "The people of India pathetically relies on me. No man is indispensable to his country."

ইংরাজের মুখে, জাপানের মুখে, স্ট্যালিনের মুখে কতবার যে আমরা ঝাল খাইয়াছি। দেশীয় নেতাদের মুখেও ঝাল খাই—রবীন্দ্র, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব অনুভব না করিয়া মুখে আওড়াই। নিজে চিন্তা করিবে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিবে। বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন আমেরিকার এক মুচি তাহাকে বলিয়াছিল, একদিন সে প্রেসিডেণ্ট হইবার বাসনা রাখে। ইহা হামবড়াই, বা আত্মজাহির করা নয়।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির (বৈশ্য সাহা) বাড়ী করিমগঞ্জ। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত দুই খণ্ডে সংকলন করিয়াছেন। সম্পদ অমূল্য কিন্তু ইতিহাস নহে। ইতিহাসের মালমসলা মাত্র। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এই কাজে সাহায্য করিয়াছেন। তত্ত্বনিধিকে তাঁহার বাড়ীতে দেখিয়াছি। তখন অতি বৃদ্ধ। শ্রীহট্টে বহু সাহা পরিবার শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী। শ্রীহট্টের ইতিহাস লিখিত হইবার আর সম্ভাবনা নাই।

সিলেটের একটি মুসলমান ব্যবসায়ীর কথা মনে পড়ে। বাজারে তাহার ছিল সেরা দোকান। প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠীদের বলা হইত সাধু। সাধু > সাহু > সাহা। এই লোকটি প্রকৃতই সাধু ছিল। ১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধে বাজার যখন উলটপালট হয়, "যোগাড়" ভিন্ন মাল আমদানী অসম্ভব হয়, তখনই সাধুর ব্যবসা মারা যায়। অবস্থা হীন হইয়া পড়িল। সে আমার খাতক ছিল। তাগিদ দিলে আসিয়া বলিত "অলক্ষ্মী যুদ্ধু" তাহার সর্বনাশ করিয়াছে। এই নিয়া বন্ধুমহলে হাসাহাসি করিতাম। লোকটি বলিত "বাবু, আপনার টাকা শোধ করিব।"

বিশ্বাস করিয়া বহু বৎসর অপেক্ষা করিলাম। সত্যই শোধ করিয়াছিল, তাহার শেষ সম্বল বাজারের দুইখানা দোকানকোঠা বিক্রয় করিয়া। সুদ রেহাই পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে তাহার মুখে জানিলাম সে খুব অল্পমূল্যে কোঠা বিক্রয় করিয়াছে। খরিদ্দার নাকি বন্দোবস্ত করে আমি যত টাকায় ঋণের রফা করি তত টাকা মূল্য দিবে। সে যদি রফা করিবার পরই এই কথা আমাকে বলিত তবে কিছু টাকা মূল্য হইতে বাঁচাইতে পারিত।

লোকটি মনমরা হইয়া মারা যায়। তাহার পুত্রদের আরও দুরবস্থা। একজন তো অর্থ এমন কি চাউল ভিক্ষা করিয়া চালাইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী স্বাধীনতা, কৌশলী অসাধুর লক্ষ্মী, ইহাদের মত লোকের বেলায় অলক্ষ্মী। অসাধু ব্যবসায়ী জাতির মস্ত অভিশাপ। বাকী সব ইহাদের গোলাম—যেমন ইংরেজ আমলে তেমন এখনো—'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'। বালিকা কন্যা ইন্দিরা পিতা জওহরলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এত ধন কোথায় যায়?" পিতা কাহার হাতে যায় বলিয়াছেন কিন্তু কি ভাবে ক্ষয় হয় অর্থাৎ সত্যই যায় বলেন নাই। ১৯২০ ইংরাজীর পূর্বে পিতা মতিলালের বিপুল অর্থ কি ভাবে গিয়াছে অবশ্যই দেখিয়াছেন। আবার কন্যাও (এখন বয়স্কা) পিতা জহরলালের দীর্ঘ প্রধানমন্ত্রীত্বের বার্ষিক পঁচাত্তর হাজার এবং "বিরাট পুরুষের", পুস্তক বিক্রয়ের ধন, পিসীমার দৌত্যের এলাওয়েন্স এ সব কোথায় যায় অবশ্যই দেখিতেছেন। ভবঘুরে কবি গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন "Half the nakedness of the indigent world could be clothed out of the lacings and flouncings of the rich." (বিলাসীর জামার ফ্রিল ও লেসের কাপড়ে পৃথিবীর অর্ধেক নগ্নের কাপড় হয়) কাপড়ের ঘাটতির দিনে কথাটা মনে পড়িল। অবশ্য বিরুদ্ধ মতও আছে —যেমন গান্ধীর মত "ইঁদুরের খোরাক ও হাতীর খোরাক সমান হয় না"।

মনে পড়িল ১৮৯৫ ইংরাজীতে সিলেটে এনি নামে একটি পঞ্চদশী ওয়েলস মিশনের পাদ্রী জোনস্ সাহেবের সঙ্গে শ্রীহট্ট বন্দর বাজারের সান্ধ্য প্রচার সভায় আসিত। সে বোধহয় চা-বাগানের ম্যানেজার ও কুলী রমণীর অবৈধ সন্তান। সাহেবদের মত ফর্সা, ফোলা-গাল যুবকদের আকর্ষণ করিত। আমাদের পুরোহিত বংশ ইশাখপুরের এক অকাল কুষ্মাণ্ড প্রলুব্ধ হইয়া ক্রিশ্চান হয়। কথা ছিল সাহেব এনির সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে। পরে সাহেব অস্বীকার করে। সে অন্য এক কুলীরমণীকে বিবাহ করে। গোরস্তানের ঘাস কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সময় সময় আমাদের বাসায় আসিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী বলিত।

সিলেটে বাঙালী মেয়ের প্রথম ঘোড়ায় চড়া দেখি ১৮৯৫ ইংরাজীতে। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বলীনারায়ণ বড়ুয়ার স্ত্রী (পূর্বোক্ত রমেশ দত্তের কন্যা) বিমলা ও তাঁহার কন্যা গাউন পরিয়া সাইড স্যাড্‌লে ঘোড়ায় চড়িতেন।

১৯১৪ ইং-এ মিউনিসিপ্যালিটির 'জেনানা মিস্ট্রেস' মিসেস্ বর্মন সিলেটে প্রথম সাইকেলচড়া বাঙালী মেয়ে। বাড়ী বাড়ী গিয়া পড়াইতেন। ইঁহার পুত্র জগজ্যোতি বর্মন কলিকাতায় মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন।

পাদটীকা

১. অর্থাৎ অল্পবিদ্যার বড়াই।
৩. স্থানীয় নাম বাঁশের ভুরা।
৪. ঋণশোধ।
৫. মাছ চাষের আনুষঙ্গিক উপকরণ।
৬. অনুমতিসূত্রে দখলদার।
৭. নিজস্ব মালখানা।
৮. "শ্ব কার্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।"
৯. সুনামগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমঅংশ এবং হবিগঞ্জের উত্তর পশ্চিমাংশ ভাটিয়াল অঞ্চল নামে অভিহিত।
১১. Wordsworth এর Ode on intimations of immortality অনুসরনে।
১২. বড় রাস্তা।
১৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক সতীশ ঘোষ এই কলেজটিকে আসামের শ্রেষ্ঠ মহিলা কলেজ বলেন।
১৪. হিন্দুর দশম সংস্কার।
১৫. গৃহীর আধ্যাত্মিকতা, বলাকা, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৪২ বাংলা।
১৬. মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়, ১৭৭/৭৮ শ্লোক।
১৭. বজরার মতো নৌকা—ইহা নির্মাণ ব্যয়সাধ্য।
১৮. নিতান্ত বালিকা স্ত্রীর সহিত যৌনসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার ফলে বালিকা-টির মৃত্যুর কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। গান্ধিজী ১৬/৮/২৬ ইং তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ঐ ঘটনার উল্লেখ করে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লেখেন। এ নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়। এখানে সম্ভবতঃ ঐগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে।
১৯. দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে উবু হয়ে বসা।
২০। শ্রীহট্টিয়া বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি।

রাজনীতিক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে

(১৯২৩—১৯৪০)

রাজনীতি

দেশে জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করার কয়েক বৎসর পর বন্ধু কৃষ্ণসুন্দর দাম, উকীল এম. এল. এ., পত্র লিখেন যে কলেজে পড়িয়াও এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি কেন রাজনীতিতে যোগ দিই না। উত্তরে Milton-এর "And inward ripens doth much less appear"১ ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম "রাজনীতি অভিজ্ঞ প্রবীণের কর্তব্য। ইহা একপ্রকার নৈমিষারণ্য।"

১৯০৫-এর স্বদেশী আদোলনে ব্যক্তিগত কর্তব্য ভিন্ন কোনও সমিতিতে যোগ দেই নাই। ১৯২০-তে যখন খিলাফৎ আন্দোলনে আমাদের গ্রামাঞ্চল মাতিয়া উঠিল তখন আমাদের পরগণার মুসলমানগণ বৃহৎ খিলাফৎ সভা ডাকিয়া আমাকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করে। আমি সভাপতিত্ব করিতে রাজী না হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়া আমার বক্তব্য বলিলাম—"প্রতিবেশী মুসলমানের ধর্মে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের প্রতি আমার সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি—কিন্তু বিধর্মী বলিয়া তাহাদের সংগে যোগ দেওয়ার আমার অধিকার নাই,—ইহা আমার কর্তব্যও নয়।"

আমার কথা অবশ্যই তাঁহাদের প্রীতিকর হয় নাই। এক বক্তা বলিয়াছিলেন আমার অসহযোগিতায় তাঁহারা দুঃখিত, তবে তাঁহাদের অভিযোগের কারণ নাই।

এই সভায় সতীর্থ উকীল কৈলাস ভট্টাচার্য বক্তৃতা দেন।

খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা, উকীল **আবদুল্লা সাহেব** ও **আবদুল মতিন সাহেব**। পরে রাজনীতিক্ষেত্রে উভয়ের সহিতই আমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আবদুল্লা শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। এত টাকা পরেও কখনো কোনো কাজে আদায় হয় নাই। ধর্মের প্রতি মুসলমানদের সত্যিকারের বিশ্বাস আছে। "ফ্যানাটিসিজ্‌ম" বলিলে এই বিশ্বাসের অর্থ বোঝা যাইবে না। আবদুল্লা ও আবদুল মতিন প্রথমে কংগ্রেসে ছিলেন। মতিন মতিলালের সময় সেন্ট্রাল এসেম্বলীর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হন। পরে জিন্নার দক্ষিণহস্তরূপে আসামে লীগ দল গঠন করিয়া মন্ত্রী হন। আবদুল্লা সাহেবও লীগ দলে যোগ দেন।

১৯২০-তে **গান্ধী** নির্বাচন বয়কট করেন। অসহযোগ আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে কোনও কাজে গ্রাম হইতে শ্রীহট্ট সহরে যাই। তখন স্বাধীনতা

সংগ্রামী লীলা রায়ের পিতা, পিতৃবন্ধু রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র নাগের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমি রাজনীতিতে যোগ না দেওয়ায় তিনি অনুযোগ করেন। বলিলাম "না গুঁতাইয়া কেবল 'ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া স্বরাজ মিলিবে না।"

তিনি বলিলেন "শ্রীহট্ট বহুকাল বঙ্গভুক্তি চাহিতেছে। ইহা স্বরাজ নহে। আসামেও ইংরাজের প্রজা, বাঙলায়ও ইংরাজের প্রজা। বঙ্গভুক্তির জন্য চেষ্টা কর না কেন?"

রাজি হইলাম। পরদিন প্রাতেই শ্রাবণের ধারার মধ্যে কাকার ঘোড়ার গাড়ীতে কাকা সুখময় চৌধুরী, রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত, সতীশ দত্ত, পিসামহাশয় নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও গিরীশবাবু সহ সহরের গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান নেতাদের সহিত দেখা করিয়া মত করাইলাম। সর্বশেষ খানবাহাদুর আবদুল মজিদের বাড়ী। জানিতাম তিনি ইহার ঘোর বিরোধী। কি ভাবে কথা আরম্ভ করিব সকলেই ভাবিতেছি, তখন তিনিই বলিলেন "আমি বুঝিয়াছি আপনারা কেন আসিয়াছেন। ভাতিজা ব্রজেন্দ্রকে আপনাদের সঙ্গে দেখিয়াই কর্তব্য স্থির করিয়াছি"—

বলিয়া একটি ফার্সী বয়েৎ বলিলেন যাহার অর্থ—দশজনের সঙ্গে ডাকাতি করাও অন্যায় নহে—অর্থাৎ মন্দ হইলেও জনমতের সঙ্গে থাকিবে।

সিলেট-বেঙ্গল রিইউনিয়ন লীগ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। জিলা-ব্যাপী ইস্তাহার বিতরণ করা হইল। সিলেটে উকীল জয়নারায়ণ দেবের সভা-পতিত্বে কনফারেন্স ডাকা হইল। তখন আমি পাইলগাঁয়ে। আসামের প্রথম লাট বীটসন বেল সাহেব সফরে আসিয়া আমাদের ইস্তাহার দেখিয়া অবিলম্বে বড়লাট চেমসফোর্ডকে তার করিয়া ভারত সরকার হইতে এই আশ্বাস আদায় করিলেন যে আসামে থাকিলেও শ্রীহট্টের রেভিনিউ সিস্টেম পরিবর্তিত হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্টের সহিত যোগাযোগ চিরকাল রক্ষা করা হইবে। এই আশ্বাস ছাপাইয়া জিলায় বিতরণ করা হইল।

কনফারেন্সে গভর্ণর বেল সাহেব উপযাচক হইয়া উপস্থিত ছিলেন। বিপিন পালও উপস্থিত ছিলেন। পর দিবস লাট, খানবাহাদুর ও রায়বাহাদুর-দের ধমকাইলেন যে, কেন তাঁহারা আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। অনেকেই আমতা আমতা করিলেন। খুড়া মহাশয় বলিলেন "বাঙলায় থাকাই আমাদের মঙ্গল।" আর আবদুল মজিদ সাহেব বলিলেন "ব্রজেনবাবুদের সহিত আমার তিন-পুরুষের বন্ধুত্ব। আমি নানাভাবে তাঁহাদের নিকট এত উপকার পাইয়াছি যে আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে যাইতে পারি না।"

এই সরল সোজাসুজি উত্তরে বেল সাহেব সন্তুষ্ট হন। পরে তিনি মজিদ সাহেবকে মন্ত্রী করিয়াছিলেন।

বঙ্গভুক্তি আন্দোলনে রমণী দাস (পরে রায়বাহাদুর ও আসাম কাউন্সিল

এম. এল. এ.) সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। কামিনীকুমার চন্দের সহিত এই উপলক্ষে বিশেষভাবে পরিচয় হইল। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম.এ. বঙ্গভুক্তির উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। খাঁটী, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও পুরাতাত্ত্বিক।

সিলেট ক্রনিকলে আসামবেঙ্গল রেলওয়ে ষ্ট্রাইক ও যুবরাজের ভারতে আগমন সম্বন্ধে দুইটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাই। প্রবন্ধ দুটির লেখক-কে, সে সম্বন্ধে অনেক খোঁজ হয়।

তৎপর ১৯২০ ইংরাজীর নির্বাচন গান্ধী বয়কট করিলে, নির্বাচনে সব প্রার্থীই স্বতন্ত্র প্রার্থী রূপে দাঁড়ান। তিনজন প্রার্থী আমার সাহায্য চান। আমি সর্ত করি, তাঁহারা কাউন্সিলে বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব করিবেন। তিনজনেই জয়ী হইলেন কিন্তু তিন বৎসর নানা অজুহাত দেখাইয়া বঙ্গভুক্তির চেষ্টা করিলেন না। ১৯২৩-এ দেশের বাড়ীতে বসিয়া দুই ভগ্নীপতির প্ররোচনায় স্থির করিলাম, নিজেই কাউন্সিলে গিয়া বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব পাশ করাইবার চেষ্টা করিব।

বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুনামগঞ্জ মহকুমার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলাম। ১৯২৪ এবং ১৯২৫-এ দুইবার বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব পাশ হইল কিন্তু বিধি বাম। কোনও মন্ত্রী মন্তব্য করেন "শ্রীহট্টের মুসলমানদের মত চিরকালই অস্থির। এখন সপক্ষে হইলেও পরে বিপক্ষে যাইতে পারে।"

এই মন্তব্যের সূত্র ধরিয়া ভারত সরকার বলিলেন "শ্রীহট্ট বিযুক্ত হইলে আসাম 'Governor's Province' থাকিবে কি না, তাহা ভবিষ্যতে সাইমন কমিশনকে নির্ধারণ করিতে হইবে। কাজেই এখন কিছু হইবে না।"

দুঃখের বিষয় এই মন্ত্রী বঙ্গভুক্তির পক্ষে আন্দোলনও করিয়াছেন। ভোটের সময় বলিয়াছিলেন, পক্ষে আছেন তবে সরকারী সদস্য বলিয়া ভোট দিবেন না। তখন তাঁহাকে লাটের বিশেষ অনুমতি নিতে বলায় উত্তর পাই নাই। নিয়তির খেলা! শ্রীহট্ট এখন পূর্ববঙ্গভুক্ত হইয়াছে।

আসাম হইতে চলিয়া যাইব এ কারণে স্বরাজ্য জাতীয় দলের এবং সব অসমিয়াদের প্রিয় ছিলাম। তাঁহাদের চায়ের কর হ্রাস, অহিফেন নিবারণ ইত্যাদি দাবীতে আমরা সায় দিতাম। কিন্তু আমাদের বন্যা নিবারণের দাবী, মেডিক্যাল স্কুলের দাবী পূরণ হয় নাই (যদিও স্কুলের ঘরবাড়ী হইয়া গিয়াছিল) কারণ তাহারা বুঝিয়াছিল শ্রীহট্ট আসামে থাকিবে না।

আট বৎসর কাউন্সিলে পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়া নিজে খ্যাতিলাভ করিলাম, কিন্তু একমাত্র সিলেট শিলং রাস্তা ভিন্ন বন্যানিবারণ, বঙ্গভুক্তি ইত্যাদি কাজ কিছুই হইল না। তখন 'দুত্তোর' বলিয়া আইন-অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ঝাঁপ দেওয়া আমার স্বভাবসিদ্ধ।

১৯২৯-এ ছয়মাস বন্যার কাজে দিবারাত্র খাটিয়াছিলাম। দেশের অবস্থা

স্বচক্ষে দেখিলাম। তিনবার জেলার গ্রামগুলি পরিক্রমা করিয়াছি। রাজপুরুষদের সদিচ্ছার অভাব নাই। অভাব অর্থের। বিদেশী রাজত্বে রাজকোষের অসচ্ছলতা থাকিয়াই যাইবে।

বন্যা-দেশপ্রেম-সমাজসেবা

ব্যাপকভাবে ও সংঘবদ্ধ হইয়া আর্তসেবার প্রথম দৃষ্টান্ত বিংশশতাব্দীর আরম্ভে দামোদরের বন্যায়। নেতাদের আহ্বানে ছাত্রসমাজ বিপুলভাবে সাড়া দেয়। তখনও কংগ্রেস কমিটি গঠন হয় নাই। ১৯২০-তে গান্ধী কঠোর নিয়মবদ্ধ কমিটি গঠন করেন। কলিকাতার কলেজগুলির ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে চিড়ামুড়ি খাইয়া থাকিয়া ও জলকাদা ভাঙিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। দুই চারজন রোগে মারাও যায়। তৎপূর্বে পুঁথিতে দেশের দুরবস্থার কথা শুনিয়া, রাজপুত-মারাঠা-রোমের ইতিহাস পাঠ করিয়া, দেশপ্রেম গজাইত। এইবার দেশ দেখিয়া, গতর দিয়া সেবা করিয়া, দেশ হৃদয়ে মূর্ত হইয়া উঠিল—যুবকদের চরিত্র গঠিত হইল। বাঙলার চীফ সেক্রেটারী (বোধহয় লায়ন) বলিলেন "The nation in the making"। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে এই সকল বন্যার কর্মীই পরে বিশিষ্ট স্বদেশী, বিপ্লবী, গান্ধীপন্থী,—অনেকে অধুনা সাম্যবাদী।

কয়েক বৎসর পর উত্তরবঙ্গের বন্যাসঙ্কটত্রাণসমিতি হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ইহার কর্ণধার। দামোদরের বন্যার পর হইতেই কলিকাতায় গঙ্গাস্নান প্রভৃতি উপলক্ষে ভিড়ের সময় ত্রাণ ও সেবার জন্য যুবকেরা পাড়ায় পাড়ায় সমিতি গঠন করে। এখনও এই সেবা কেবল সঙ্কটত্রাণে সীমাবদ্ধ। নিজ নিজ পল্লীর বারমাসী সেবার কাজ কিছু হয় নাই। প্রত্যেকটি পরিবারের অভাব অভিযোগের প্রতি যদি পাড়ার মুরুব্বিরা সর্বদা মনোযোগী হন তবে পুরসভা, বড় বড় সমিতি বা সরকারের লালফিতার যন্ত্রণা, পক্ষপাতিত্ব ও অকর্মণ্যতার হাত হইতে দেশ রেহাই পাইতে পারে। গান্ধী উদ্ভাবিত, বিনোবাভাবে পরিচালিত "সর্বোদয়সমাজ", জহরলাল প্রবর্তিত সমাজসেবা সংঘে আবার সেই লালফিতা, দলাদলি আসিবে।

সমাজ ও সঙ্ঘ পৃথক জিনিষ। সমাজের ভিত্তি ধর্ম বা চিরাচরিত রীতিনীতি, সঙ্ঘের ভিত্তি মহাজন প্রবর্তিত নিয়মাবলী ও প্রবর্তকের উপর ভক্তি। সমাজ হিন্দুর, সঙ্ঘ বৌদ্ধের। স্মৃতিব্যবস্থা প্রথমোক্তের জন্য। বিভ্রান্ত হইলে মুনির ব্যবস্থা—সর্বশেষ মহাজনবাক্য। সমাজপল্লীর, কিন্তু সঙ্ঘের সীমা নাই। শান্তিনিকেতন সঙ্ঘ, সমাজ নয়। সমাজের সীমা আছে যথা স্বগ্রামে, স্বধর্মী বা স্বজাতিতে আবদ্ধ। সীমাবদ্ধতা ছাড়া, কর্মপরিচালনা হয় না। কর্মকৌশলী

ইংরেজ Man on the spot-এর মর্যাদা দিত। আমরা এককালে এ জন্য কত না বিদ্রূপ ও প্রতিবাদ করিতাম। জহরলাল, বিধান রায়ের মতটা আশা করি এখন বদলাইয়াছে।

১৩৫০ সালের যুদ্ধজনিত মন্বন্তর ও মেদিনীপুরের ঘূর্ণিঝড়ে তেমন সহায় সাহায্য আসে নাই—কারণ, যুদ্ধ এবং সরকারের প্রতিকূলতা—দেশ মিলিটারীতে ভর্তি,—আগতপ্রায় জাপানীদের বিব্রত করিবার জন্য সম্পত্তি, ধানবিনাশ, লোপাট ইত্যাদি এবং যুদ্ধভীত সমাজে নিজ নিজ নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের চিন্তা। তখন গ্রামের নিরন্ন ছুটিল প্রাসাদপুরী কলিকাতার অভিমুখে—যদিও সংখ্যায় অনেক তথাপি কলিকাতার লোকসংখ্যার তুলনায় অবস্থা বে-সামাল ছিল না। কতিপয় নাগরিক কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধনীরা যথাসাধ্য করেন নাই। যুদ্ধের বাজারে ইঁহারা তখন স্ফীত—রোজগারের নেশায় উন্মত্ত; রজঃ ও তমের প্রাবল্যে, সত্ত্বগুণটি ফুটিয়া উঠে নাই। কথায় আছে, প্রথম পুরুষে কার্পণ্য ও রোজগার, দ্বিতীয় পুরুষে ব্যয়-বিলাসিতা ও তৃতীয় পুরুষে দান।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব বান্‌চাল হওয়ার পর কোনও কাজ ছিল না। তথাপি কাউন্সিলে রহিয়া গেলাম। ১৯২৯ ইংরাজীর এপ্রিল-মে মাসে শ্রীহট্ট কাছাড় জেলার বন্যায় সতীশ দত্ত, হরেন্দ্র মজুমদার, প্রবোধ সান্যাল, প্রমোদ দত্তের সহযোগিতায় রিলিফ কমিটি করিয়া কার্য আরম্ভ করিলাম। প্রথম দিন দ্বিপ্রহর রাত্রে উকীল হেমেন্দ্র রায় প্রভৃতি আসিয়া বন্যার অবস্থা বর্ণনা করিলেন। কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী সেবকের অভাব হইল না। দুইদিন পর জিলার কর্তা সহরে আসিলেন। রেললাইন ভাঙিয়া পড়ায় তিনি পথে আটক ছিলেন। সাক্ষাৎ করিলাম। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—"অবস্থা সঙ্গীন। আপনারা অগ্রসর হইয়া যান। যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

পূর্বদিন D. C. in-charge দেশীয় কর্তার কাছে যাই। তিনি বলেন, "আমি কি করিব?"

বোধহয় কোন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব তা জানেন না। বন্যায় ফসল নষ্ট হয় বলিয়া বন্যাত্রাণ ভূমিরাজস্বের অন্তর্গত। মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসি।

পরদিন জনসভা ডাকিলাম। ডি. সি. ডসন বলিলেন—"যাইব"। জনৈক মোক্তার সভাপতি পদে ডসনের নাম করেন। আমি আপত্তি করি। ডসন বলিলেন—"আমি লিয়াসোঁ—আমাকে নয়।" তখন আর একজন আমার নাম প্রস্তাব করেন। আমি প্রমোদবাবুর নাম প্রস্তাব করিলে প্রমোদ দত্ত সভাপতি হন। প্রবোধ সান্যাল ও আমি যুক্ত সম্পাদক—গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—সরকারী ট্রেজারার—সমিতিরও ট্রেজারার। সতীশ দত্ত সহ-সভাপতি, আবদুল হামিদ

কার্যকরী সমিতির সভ্য। এছাড়া একটি জেনারেল কমিটি ছিল। প্রবোধ সান্যাল অফিস সেক্রেটারী। বিলিব্যবস্থার ভার আমার উপর। স্বল্পসংখ্যক কর্ণধার হওয়াতে কাজের সুযোগ পাইলাম। চাঁদা চাহিতে হয় নাই—আপনি আসিতে লাগিল। এমন কি সুদূর মালয় উপদ্বীপের পেনাং হইতে শ্রীহট্টিয়া মুসলমানগণ টাকা পাঠান।

এইরূপে প্রায় বৎসর খানেক বন্যাত্রাণের কাজ চলিল। বন্যায় তো সারা বছরের খোরাক গিয়াছে।

সরকারী ইস্তাহার বাহির হইল। "The situation is indeed dark; but the silver lining in the cloud is the co-operation of the Swarajists." (অর্থাৎ কংগ্রেসদল)।

সব কংগ্রেসী বন্ধুদের আবার অকংগ্রেসীদের সহিত যোগদান মনঃপূত হইল না। বি. পি. সি. সি.-কে লিখিলেন। পাশাপাশি পাল্টা কমিটি গঠন করিলেন—উদ্দেশ্য কংগ্রেসের নাম জাহির। অভিযোগ আসিতে লাগিল—রিলিফের নৌকাতে কংগ্রেস পতাকা ওড়ে। আমার সহিত ঠোকাঠুকি হয় নাই—কিন্তু জাতীয় দৈবদুর্বিপাকের সময় পার্টিচিন্তা অতি নীচ মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তির কুফল আজ দেশবাসী হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। আসামে যে সংকট তাহাতেও পার্টিচিন্তা।

এক বৎসর—সকাল ৭—১২টা, বিকাল ৩—৯টা কাজে যাইতাম। খুব খাটুনী হইলেও আনন্দের ছিল। সমিতি ঠিকঠাক করিয়াই সফরে বাহির হই। ডি. সি.-র সহিত করিমগঞ্জে যাই। তথায় এস. ডি. ও.-র সহিত শ্রীশ দত্তের ঠোকাঠুকি লাগে। উভয়ে তাঁহাদের নিরস্ত করি। ডি. সি.-র আন্তরিকতা ও কর্মদক্ষতা দেখিয়াছি। পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলাম। গোপনীয় ফাইলও দেখিয়াছি। কয়মাস পর লাট আসিলেন। কমিটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে যাইতে চাহি নাই। ডি. সি. বলিলেন 'লাট্ বিশেষভাবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।'

বলিলাম—"এমনি যাইব না। নিমন্ত্রণপত্র চাই।" তখন নিমন্ত্রণপত্র আসিল। অতঃপর লাটের সহিত চারঘন্টা আলোচনা হইল।

গান্ধী যখন সিমলায় আরউইনের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন সাহেবরা—গান্ধী ইন্টারভিউ "seek" করিয়াছেন কি না—জিজ্ঞাসা করেন। সরকার নিরুত্তর ছিলেন। সরকারী ইজ্জতের প্রশ্ন।

এই সময় শ্রীহট্ট-কাছাড়ের গ্রামগুলি একে একে ভ্রমণ করিয়া দেশের দারিদ্র্য দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠিলাম। অনেক পাড়ায়, বিশেষতঃ মুসলমান পাড়ায় সব গৃহই ভাঙা। জল পড়ে। ঘরে একখানা ছেঁড়া চাটাই এবং কয়েকটি পাতিল (হাঁড়ি) ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। বাড়ীর কর্তা ২।৩ সপ্তাহ যাবৎ

নিরুদ্দেশ—অন্নের সন্ধানে। পরিবার উপবাসী। যথাসাধ্য চাউল বিতরণ হইল। মোট তিন লক্ষের উপর ব্যয়—অর্ধেক সরকারী বা লাট-কমিশনারের তোলা চাঁদা। ছাপান হিসাবপত্র আমার কাছে ছিল। ট্রেজারার গোপেন্দ্রবাবুর হিসাব নির্ভুল।

কাউন্সিলের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলাম। এইবার আইন-অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপ দিলাম।

আইন-অমান্য

আইন-অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০—১৯৩৪) চিত্তরঞ্জনের "abandon", গান্ধীর 'ডাণ্ডীমার্চ'এ 'Fear not—I have burnt my boats; for me there is no return'—এই উক্তি এবং সুভাষের দৃষ্টান্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। দেশের দারিদ্র্য দূর করা বিদেশী সরকারের কর্ম নয়। অবিলম্বে স্বাধীন হওয়া চাই। জিলায় একাধিকবার ঘুরিয়া কখনও বা জলকাদায় পদব্রজে, কখনো রেলে, কখনও নৌকায়, কখনও মোটরে—আইন-অমান্য প্রচার করি। বিথঙ্গল আখড়ায় বলি—"আইন অমান্যই নিত্যানন্দ গোঁসাইর সেবাধর্ম; কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ সেবার প্রতীক মাত্র। কেহ নিজের ধন দিয়া দারিদ্র্য নিবারণ করিতে পারিবে না। চাই স্বাবলম্বী হইবার কর্মসুযোগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি।"

রাধাবিনোদ দাস নয়াসড়কের আখড়ায় বলেন "পরাধীন দেশে সব যজ্ঞ নিষ্ফলা। সেবাধর্মই যজ্ঞ।" আবেগ ছাড়া বড় কাজ হয় না।

সম্পূর্ণ বিদ্রোহীর মত বেপরোয়া বক্তৃতা দিতাম। Pro Patria Mori কবিতা সভায় আবৃত্তি করিতাম; বলিতাম—"লাট বেলাট মানি না। বি. পি. সি. সি. সভাপতি সুভাষ আমার লাট—আমি সিলেটের জেলা ম্যাজিষ্টর"।

সুভাষের কষ্টসহিষ্ণুতার একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—সুনামগঞ্জ হইতে ক্ষুদ্র মোটরবোটে প্রত্যাবর্তন কালে মাত্র নয় ইঞ্চি প্রশস্ত কাঠের বেঞ্চে চারঘন্টাব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রা দিয়াছিলেন। এই লোকটি বর্মার বনেজঙ্গলে সৈন্য পরিচালনা করিবে আশ্চর্য কি?

চিত্তরঞ্জন বলিতেন—"I shall fill your jails to suffocation and make administration impossible."

আমি চিত্তরঞ্জনের অনুকরণে মাইজভাগ বক্তৃতায় বয়িাছিলাম—"আমার ব্রিটিশ সেনাপতির সহিত লড়িবার অস্ত্র নাই কিন্তু অর্থসচিবের সহিত লড়িয়া রাজকোষ শূন্য করিতে পারি।" আরও বলি "বন্যাই আমাকে আইন-অমান্যে টানিয়াছে।"

ডি. সি. ডসন বিচার করেন। বিচক্ষণ লোক। কয়েকমাস পূর্বে তাঁহার

সহিত একযোগে বন্যার কাজ করিয়াছি। রায়ে লিখিয়াছিলেন "আসামীর রাজনীতি গান্ধীবাদী নহে। ইহা সুকৌশলী হিংসার প্রচার"!

রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার অভিযোগে দুই বছরের মেয়াদ হইল।

আমি অহিংসায় বিশ্বাসী নই, শুধু পলিসী হিসাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে লইয়াছি, এ জন্য পাঠক যেন মনে করিবেন না যে গান্ধী-চরিত্র-মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী নহি। বিলাতযাত্রাপথে গান্ধীর উক্তি "দেশের পক্ষে কেহই অপরিহার্য নয়।" শ্রদ্ধা জাগায়। ১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধে লর্ড কিচেনার জাহাজডুবিতে মারা গেলে সিলেটে কতিপয় "রাজভক্ত" ব্যক্তি কমিশনার বেন্টিককে বলেন "ক্ষতি অপূরণীয়।" বেন্টিংক উত্তর দেন "মাদার ইংল্যান্ড বন্ধ্যা মনে করি না।"

চাঁদপুরে **গান্ধী** বলেন "অন্যায় মাথা পেতে মেনে নেবে না। যদি পার অহিংসভাবে বা অন্যভাবে প্রতিরোধ করবে—যে ভাবেই হোক। কাপুরুষের থেকে গুন্ডাও ভাল। তার তবু সাহস আছে।"

আরও বলেছিলেন "মহাত্মা বলেছেন বলেই যেন ভোট দিও না। নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ কর।"

তাঁর "I am mad for swaraj"—এবং "I have burnt my boats..." ইত্যাদি বাক্য আমার অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি। গান্ধী-রবীন্দ্রযুগ ১৯২০ ইংরাজীর পর—তখন আমার যৌবন উত্তীর্ণ। কৈশোর ও প্রথম যৌবন, স্বভাব গঠনের সময়। স্বভাব গঠিত হইয়া গেলে কেহ চেলা হয় না। ১৯২৮ ইংরাজীতে শ্রীহট্টে সুর্মাভ্যালী কনফারেন্সে বিপিন পাল এক সংশোধনী প্রস্তাব করিলে, তিনি খদ্দরধারী কংগ্রেস সভ্য নহেন বলিয়া আমি আপত্তি করি। "আমি তো গান্ধীর চেলা নই" বলিয়া তিনি বসিয়া পড়েন।

দ্বিতীয় বারে ই. এ. সি. মর্তুজা আলীর নিকট বিচার হয় ১৯৩২-এ। ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা করার দরুন দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়।

কারাজীবন

জেলে বন্দীত্বের দরুণ মানসিক বিষণ্নতা ভিন্ন অন্য কোন কষ্ট হয় না। আমার খাওয়া পরা খুব সাদাসিদা। বই পড়িতাম, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়া নহে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পড়িতাম। সঙ্গী **বসন্তকুমার দাস, বিষ্ণুরাম মেধী, রাজেন বড়ুয়ার** সঙ্গে সময় কাটিয়া যাইত। প্রথম বৎসর কিন্তু কোনও সঙ্গী ছিল না। সুপার 'রিচি' টিপিক্যাল জেলর—বিরস বদন ; কথাবার্তা নাই। 'এলেন' ঠিক বিপরীত। রোজ কিছু গল্পগুজব করিতাম। জেলে সহৃদয়তার স্পর্শটি বড়ই স্নিগ্ধ করে। জেলের পথ্যাদির নিয়মাবলীর নিন্দা করি না—কিন্তু সহৃদয়তার অভাব। ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল সিভিল হস্পিটাল—বৃদ্ধ হাচিনসন লোক ভাল ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, জেলের সমালোচনা করিবার

কিছু আছে কি না। বলিলাম "কয়েদী হিসাবে নহে। বাহির হইয়া বলিব।"

"সরকার সেলাম" নিয়া বড় গোলমাল হইতেছিল। আমার পরামর্শ চাহিলে বলিলাম—"ফরাসী-জার্মান কয়েদীরা বলে 'অফিসার'স সেল্যুট'—আমরাও তাহাই চাই।"

হাচিনসন বলিলেন—"ইংরাজী তো সাধারণ কয়েদী বুঝিবে না।"

বলিলাম "ভাল বাংলা তর্জমার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যান।"

এলেন তো হাসিয়া খুন।

মন্ত্রী আবদুল হামিদ একদিন তেজপুর জেলে আমার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রিচি সেখানে আসেন। মন্ত্রীকে কয়েদীর পাশে উপবিষ্ট দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ রাইট্ এবাউট টার্ণ!

দৃশ্যটি উপভোগ করিয়াছিলাম।

একদিন ডি. সি. গানিং জেল দেখিয়া বলেন "তোমার ঘরটি বেশ—বাথরুম ইত্যাদি আছে, বেশ বিশ্রাম করছ আর আমি খেটে মরছি।"

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম "মিঃ গানিং, ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন হলে পর আপনিও ইচ্ছা করলে এখানে আসতে পারেন।" সাহেবের কান লাল হইল। কিছু বলিলেন না। পরের পরিদর্শনের দিন উঠান হইতেই বলিলেন "ব্রজেন্দ্রবাবু, আমি দেশে যাচ্ছি। আমাকে আর জেলে পাঠাতে পারবে না।"

লাট কীন জেল পরিদর্শনে আসিয়া বলিলেন "I hope you will be the Prime minister in the next constitution."২ ১৯৩৫-এর ভারতশাসন আইন মানিয়া নিবার জন্য খোসামোদ !! তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম "I hope not" অমনি—রাইট এবাউট টার্ন! লোক কিন্তু ভাল ছিলেন। পরে তিনি খুড়ামহাশয়কে বলিয়াছিলেন "তিন বছরের বন্দী জীবন ইহার পরমায়ু দশ বছর কমাইয়া দিয়াছে।"

আমি যে সব রাজপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি দুই একজন ভিন্ন তারা সবাই লোক ভাল। অন্যত্র বলিয়াছি প্রবল বিরোধীভাব সত্ত্বেও ইহাদের সহিতই স্বদেশীয় সহকর্মী অপেক্ষা অনেক সময় হৃদ্যতা ছিল বেশী। গান্ধী আরুইন চুক্তি হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে এলেন জিজ্ঞাসা করে "আমি ডাক্তার, রাজনীতি বুঝি না, কিন্তু তোমরা যে স্বরাজ চাও সেটির স্বরূপ কি?"

বিষ্ণুরাম মেধী বিস্তারিত বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। সে বলিল "অতশত বুঝি না। সোজা বল টমি (পেশাদার বৃটিশ সৈন্য) থাকিবে কি না। তোমরা আর সব পাইতে পার—ঐটি নয়।"

মেধী ইতস্ততঃ করিতে থাকায় আমি বলিলাম—"সেনাপতিসহ সব সৈন্যকে যাইতে হইবে।"

সাহেব হাসিয়া বলিল "তা কখনো হইবে না"।

ইংরাজ বৈশ্যজাতি। দড়ির টান বুঝিয়া চলে।

মন্ত্রী আবদুল হামিদ জেলে দেখা করিতে গেলে ডি. পি. আই. কানিংহাম আমাকে compliments জানাইতে বলে। রাজদ্রোহের জন্যে বন্দীকে শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন শাসকজাতির পক্ষে উচ্চমনের পরিচয়। সিলেটের জেল সুপার ম্যাক্‌কয় আমি জেলে যাইবার পর দ্বিতীয় দিন ভালভাবে আমার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলে—"তোমার বন্ধুরা ও তুমি হয় তো জান না যে অচেনা জায়গায়ও তোমার বন্ধু রয়েছে। মনে হয়, তোমার বিশ্রাম দরকার। ছয় মাসে তোমার শরীর ঠিক করে দেব।"

ম্যাক্‌কয় ও এলেন পড়ার জন্য বিলাতী কাগজ ও নিজেদের বহি দিত। স্টেট্‌স-ম্যান ভিন্ন অন্য কাগজ পাইতাম না। গভর্ণর কীনের এ.ডি.সি. ক্যাপ্টেন কাল্ভার্ট জেলে গিয়া আন্তরিকতার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন—সময় কি করিয়া কাটে, কি পড়ি, ইত্যাদি। বেচারী প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানজেলে বন্দী হয়। তেজপুর জেলে থাকার সময় শ্রীহট্টের সুবিখ্যাত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন খোঁজখবর নিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি জেলের খাওয়াদাওয়া সাধারণের আহারের তুলনায় মন্দ নহে। তবে ঘানি টানা বেশ শক্ত। অনেকের বিপদ বা স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। তখন নিয়ম ছিল সুস্থ সাধারণ কয়েদীদের পালা করিয়া তেলের ঘানি টানিতে হইবে। সময় সময় ইহা শাস্তিও গণ্য হইত। জেলের নীতি এই যে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা যথাসম্ভব কয়েদীরা নিজেরা করিবে। ঢেঁকির কাজ পুরা দিনের কাজ, অত্যধিক নহে। আর সব কার্যশালায় অর্ধেক কি সিকি কাজও হয় না। তেজপুর জেলে বৃদ্ধ শুভ্রকেশ একটি নাগা সর্দার ছিল—লাল টুপি—অর্থাৎ একবার পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। সদানন্দ, প্রকৃতির সন্তান—কেবল হাসিত। আকারে ইঙ্গিতে কথা কহিত। সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। নিরীহ; বহু পূর্বে এক বিদ্রোহ হয়—তার আসামী। জেলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিনা কে জানে! একদিন চা খাইতে দিলে বলে 'ভি, ছে'। বসন্তবাবু 'ভি, ছে' খুব উপভোগ করিতেন। পরে জানিয়াছি 'ভি, ছে' অর্থ 'খুব ভাল'।

বসন্তবাবু জেলে বাংলায় গীতার পদ্যানুবাদ ও টীকা লিখিয়া পরে তাহা প্রকাশ করেন। প্রথমবার আমার বিনাশ্রম মেয়াদ ছিল। জেল সুপার এলেন বলেন 'কাজ কর। মকুব পাইবে।' বলিলাম 'কাজ নাই। শ্রমিকের উপর তোমার কড়াকড়ির জ্বালায় শেষে অস্থির হইব নাকি?'

দ্বিতীয়বার সশ্রম কারাদণ্ড—বসন্তবাবু, রাজেন বড়ুয়া সহ। মোড়ার জন্য বাঁশের শলা চাঁচিতাম। ইহাই সব চেয়ে সহজ কাজ। কখনও কখনও প্রতি-দ্বন্দ্বিতামূলক শলা চাঁচা হইত। বসন্তবাবু মোড়া বুনিতে শিখিয়াছিলেন। আমাদের সে গরজ ছিল না।

শ্রীহট্ট-আসামের নেতৃবৃন্দ

১৯০৫ ইংরাজীতে সিলেটে স্বদেশীর নেতা উকীল **প্রমোদচন্দ্র দত্ত** (পরে রায় বাহাদুর, সরকারী উকীল ও মন্ত্রী) সারদা শ্যাম, রাধাবিনোদ দাস, সতীশ দেব (করিমগঞ্জের সরকারী উকীল) হবিগঞ্জের মোক্তার শিবেন্দ্র বিশ্বাস। জাতীয় স্কুলে হেডমাস্টার শ্রীশচন্দ্র দত্ত। ইনি হাকিম প্রকাশ দত্তের পুত্র। বি.এ. পাশ করিয়া, চাহিলেই হাকিম হইতে পারিতেন। দরদী দেশ-প্রেমী। জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দিয়া পরে চায়ের বাগান করেন। বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। একবার সেন্ট্রাল এসেম্বলীর সদস্য হন।

জমিদার রমণী দাস ও কামিনী চন্দ ১৮৯০ হইতে সুরেন্দ্রনাথের অনু-গামী।

১৯২০ ইংরাজীর আন্দোলনে প্রমোদবাবু সরিয়া পড়িয়াছেন। **সারদা শ্যাম** মৃত। রাধাবিনোদবাবু সরকারী উকিল হইয়া পরে বৃন্দাবনে ভেকধারী বৈষ্ণব। **সতীশ দেব** এবং **শিবেন্দ্রবাবু** আমরণ দারিদ্র্য বরণ করিয়া কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন।

১৯০৬ ইংরাজীর বর্ষায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হইল জলবেষ্টিত জলসুকা গ্রামে। সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)। অগ্রণী ছিলেন বিখ্যাত জমিদার বৈকুণ্ঠ রায়। ঐ পরিবারের সতীশ রায় (প্রিন্সিপাল, আসামের ডি. পি. আই.) ইঞ্জিনিয়ার রাধামাধব রায়, স্বদেশী যুগের কর্মী রমাকান্ত রায় প্রভৃতি। রমণী দাসও অগ্রণী ছিলেন।

হবিগঞ্জের **গোপেন্দ্রলাল দাস,** পরিচ্ছন্ন সুশৃংখল, কর্মঠ লোক। লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের আদর্শ। আমার চেষ্টায় স্বরাজ্যদলের এম. এল. সি. ও কাউন্সিলের ডেপুটী প্রেসিডেন্ট হন। উপযুক্ত লোক। আমি ১৯৩৫-এ কাউন্সিলে না যাওয়ায় কংগ্রেস দল ছাড়িয়া সাদুল্লা সাহেবের অনুগত হইয়া রায় বাহাদুর ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হন। পরে ১৯৪১-এ আবার কংগ্রেসে যোগ দেন। সংগঠন ক্ষমতা ভাল ছিল।

রায়বাহাদুর **সতীশ দত্ত** জ্ঞানী ছিলেন। সরকারী উকীলের কাজ ছাড়িয়া ১৯৪০-এর কাছাকাছি কংগ্রেসে যোগ দেন। বি. এন. রাও বলিতেন "ইনি আমাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশী চিন্তা করেন।"

আসাম লাট কীন বলিতেন "আসামের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি।"

গোপেন্দ্রবাবু যদিও মডারেট ও responsivist ছিলেন—তথাপি আমার সঙ্গে সর্বদাই রাজনীতি আলোচনা হইত।

মন্ত্রী রায়বাহাদুর **প্রমোদচন্দ্র দত্তের** চেষ্টায় সুর্মানদীর সেতু (কীন ব্রীজ) এবং শ্রীহট্ট মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুকাল তিনি ইহার, সাহিত্যসভার

এবং শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শ্রীহট্টে মেডিক্যাল স্কুলের ঘরবাড়ী হয় কিন্তু অসমীয়াদের আপত্তিতে স্কুল খুলা হয় নাই। তিনি ডাঃ ব্রহ্মচারীর কালাজ্বর চিকিৎসারীতি অবলম্বনে আসামে কালাজ্বরের প্রকোপ প্রশমন করান। ১৯২০ ইং-তে কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন।

১৯২৩ ইংরাজীতে প্রথম আসাম কাউন্সিলে বন্যানিবারণ আলোচনা আরম্ভ করি। ত্রিশ বৎসর গত হইয়াছে। আসাম, বাংলা, পূর্ববাংলা কোথাও বন্যার প্রতিকার হয় নাই। বিহার বাংলা আসাম মিলিয়া রিলিফ কমিশন গঠন হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ সরকার সিলেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় স্কীম করিতেছেন যাহা পরস্পর বিরোধী। ফল ভাল হইবে না। কেবল মাত্র ভারত-পাকিস্তান উভয় সরকারের মিলিত চেষ্টায় বহু ব্যয়ে ইহা সাধ্য। আসাম, উত্তরবঙ্গে এবং ফলস্বরূপ পূর্ববঙ্গে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়া চলিবে। আমার প্রস্তাবে ১৯২৯ ইংরাজীতে রেলওয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিলোস্, মার্টিন রেলের ইঞ্জিনিয়ার রায়বাহাদুর **গিরীশচন্দ্র দাস**—ইঁহাদের লইয়া বন্যার-কারণ অনুসন্ধান কমিটি শ্রীহট্ট ভ্রমণ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন। ফল কিছু হয় নাই।

বন্যার সংকট কাটিলে পর খয়রাতী সাহায্যে মানুষ আত্মনির্ভরশীল হইতে চায় না। তখন কিন্তু লাট হ্যামণ্ডের সঙ্গে, বিলাতে ম্যাকডোনাল্ড সরকারের বেকার-সাহায্য-ভাতার দৃষ্টান্ত দিয়া উল্টা তর্ক করিয়াছি।

১৯৩৪-এ বন্যার সময় লাট কীনের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি নওগাঁ জিলার এক মাড়োয়ারী তাঁহাকে যে মোটা টাকার চেক দেয়, তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা করিতে থাকেন। বাধা দিয়া বলিলাম—

"এরা রাতারাতি কি করে অত টাকা কামায় তাহা জিজ্ঞাস্য।"

অমনি প্রসঙ্গ শেষ হইল।

সাংবাদিকতা

সিলেট ক্রনিকলের সম্পাদক **শশীন্দ্র সিংহ** তেজীয়ান লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্ষিতীশ দাস উকীল, ইহা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। পাইলগাঁও হইতে ইহাতে দুইটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম পূর্বে বলিয়াছি। তৎপর মাঝে মাঝে ঐরূপ অনামে ক্রনিকলে লিখিতাম। এই সময় ১২।১৪ বৎসর নিয়মিত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা পাঠ করিতাম। ইংলিশম্যানের স্টাইল ছিল আদর্শ। সম্পাদক ছিলেন সাণ্ডারল্যাণ্ড। স্টেটসম্যান ছিল লিবারেল দলের। ১৯০৪-এ র‍্যাটক্লিফ সম্পাদক ছিলেন। পরে ইংলিশম্যান স্টেটসম্যানের সহিত মিশিয়া লোপ পায়।

আমি আজীবন স্টেটসম্যান পাঠ করিয়াছি। বহু সাধারণ জ্ঞান, চিন্তা-

ধারা ও ইংরাজীর স্টাইলের জন্য স্টেটসম্যান-এর কাছে আমি ঋণী। সর্বদাই বলিতাম—"যেদিন স্টেটসম্যানের মত পত্রিকা বাহির করিব সেইদিন স্বরাজের উপযুক্ত হইব।"

আজও অন্যান্য পত্রিকা সর্বাংশে স্টেটসম্যানের নীচে।

১৯২০ হইতে আইন-অমান্য আন্দোলনের দরুণ কামিনী চন্দ, সতীশ দেব, ক্ষিতীশ শ্যাম, ক্ষীরোদ দেব প্রভৃতি কর্তৃক প্রবর্তিত সাপ্তাহিক 'জনশক্তি'-র উপর রাজরোষের ঝড় বহিয়া যখন উহা বিপর্যস্ত তখন ১৯২৬ হইতে ইহার আর্থিক দায়িত্ব, উন্নতি ও পরিচালনার ভার আমার হাতে আসে। ইহাতে আমার প্রায় সাত হাজার টাকার ক্ষতি হয়। পরে ইহার খরচটা উঠিয়া আসিত এবং সম্পাদক প্রভৃতি চারি পাঁচজনের অন্নসংস্থান হইত। ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় সরকার জামিন চাহিলে নীতিগত কারণে উহা দিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমার ভ্রাতার নিকট উহা মাত্র ৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করি। ১৯২৮-২৯-এ ইংরাজী একটি সংস্করণ ছিল যাহার লিখা ও সম্পাদনা আমার নিজের ছিল।

১৯২৩ ইংরাজীতে প্রথম **কৃষ্ণসুন্দর দাম** সহযোগে সুর্মাভ্যালী ন্যাশনালিস্ট পার্টি করি। গৌহাটিতে নবীন বড়দলইর বাড়ীতে আসামের স্বরাজ্য-দলের সহযোগে আসাম ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ফৈজনুর আলী নেতা, আমি সহকারী। নেতৃত্ব নিতে আমি অস্বীকার করি, পরের বারেও। সহনেতা ও সেক্রেটারীর কাজ করার সুযোগ বেশী। সভাপতিত্ব অস্বীকার পূর্বক সর্বদাই সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিতাম। সাদুল্লা এই সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীহট্ট আসামেই থাকিবে—এই প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় দলে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। জনৈক বন্ধু ঠাট্টা করেন—'পেটের কথাটা কি বলই না'! ইঙ্গিত করেন 'মন্ত্রী হইবে'। সাদুল্লা উত্তর দেন—'আমার অন্যপ্রকার উচ্চাকাঙ্খা আছে' (অর্থাৎ হাইকোর্ট জজ। তখন হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন।)

সাদুল্লা রাজনীতিতে উপযুক্ত লোক—ভদ্র, পরিশ্রমী, আইন কিন্তু তাঁহার ধাত নহে। কাউন্সিলে বাদানুবাদ হইত। আমি তাঁহাকে 'High priest of communalism' অভিহিত করিলে পাল্টা ব্যঙ্গ করিতেন 'High priest of Rationalism'। তিনি হিন্দুবিদ্বেষী নহেন—যদিও নিজ সম্প্রদায়কে উন্নত করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। আসামী বাঙালী হিন্দুকে মিলাইয়াই তিনি দল করিয়া ৮।১০ বৎসর দক্ষতার সহিত আসামের শাসন চালাইয়াছেন। অবশ্য ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। বিষয়ী লোক—আদর্শবাদী নহেন। অধুনা ভারত-পাকিস্তানে সাধারণতঃ রাজনৈতিকদের চরিত্র ইহাই।

নবীন বড়দলই ছিলেন আদর্শবাদী ও ভাবালু। **তরুণ ফুকন** ও নবীন

বড়দলই-ই আসামের প্রথম ও প্রধান নেতা যাঁহারা আসামকে জঙ্গলের আড়াল হইতে টানিয়া জগৎসভায় উপস্থিত করেন। শিকারী তরুণ ফুকন, বিরাট দেহ। বড় ভাই—নবীন ফুকনও শিকারী—ভূতপূর্ব পেশ্‌কার—দিলদরিয়া লোক।

গৌহাটি কংগ্রেসের ঋণভার ও মদ-ই তরুণ ফুকনের সর্বনাশ করে। পরে রোহিণী চৌধুরীর সহিত যোগ দিয়া Responsivist Party-র পক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। রোহিণী উৎরাইয়া যায়, তরুণ হারেন। এক সভায় তাঁহাকে বলিয়া ছিলাম—'বড়ই পরিতাপের বিষয় আজ এই সভায় আপনার বিরুদ্ধে প্রচার করতে হচ্ছে। একদিন আশা করেছিলাম চিত্তরঞ্জনের পর আপনি পূর্ব-ভারতের নেতা হবেন।'

নবীন বড়দলই বড় সরল ছিলেন। একদিন গৌহাটির কংগ্রেসীদের সম্মুখেই আমাকে বলেন—'ইহারা আমাকে দোষারোপ করে যে, আপনার পাল্লায় পড়িয়া সিলেট-শিলং রোড করিতে রাজী হইয়াছিলাম—এর ফলে এই রাস্তায় সিলেটীয়া আসাম আক্রমণ করিবে।'

অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ তখনও কল্পনার বাহিরে। (কিন্তু এখন সম্ভবপর।) ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনৈতিক অধিকারেই আক্রমণ সম্ভবপর। আসামী, বিহারী নিজেদের অনুন্নত মনে করিয়া কুর্মনীতি গ্রহণ করে।

গোপীনাথ বড়দলই লোক খাঁটী—অনেকটা গান্ধীভক্ত। ধীরবুদ্ধি কিন্তু শাসনে দীর্ঘসূত্রী ছিলেন। তাঁহার কাছে ফাইল অনেকদিন পড়িয়া থাকিত। সাহেব চীফ সেক্রেটারী (আই. সি. এস.) তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিতেন কিন্তু আদেশ অমান্য করিতে সাহস পান নাই। অথবা ডিসিপ্লিনের খাতিরে উচিত মনে করেন নাই।

১৯৩৬ ইংরাজীতে গৌহাটিতে বিষ্ণুরাম মেধী ও হরেকৃষ্ণ দাস নেতা নির্বাচন সম্পর্কে পরামর্শ চাহিলেন। বসন্তবাবু প্রাচীন কিন্তু তিনি নাকি আসামীদের মনে দুঃখ দিয়াছেন। অগত্যা অবিচার হজম করিলাম। পুরাতন অসমীয়া এম. এল. এ. কাহাকেও উপযুক্ত না পাইয়া আমি গোপী বড়দলইর নাম করিলাম। মেধী বলিলেন—গোপী কিন্তু রোহিণীর প্রাণের বন্ধু।

বলিলাম—'তাহা হউক। গোপীনাথ লোক খাঁটী।'

সর্বশেষে সিলেটের পাকিস্তানভুক্তির সময় গোপীনাথের প্রতি শ্রদ্ধা বোধহয় হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কাজের দায়িত্বের বোঝায় তিনি অকালে প্রাণ দেন।

আসামের সহকর্মী এম. এল. এ.-দের মধ্যে মনে পড়ে, কামাখ্যা বড়ুয়া, রোহিণী হাতীবড়ুয়া, মহাদেব শর্মা, দোয়ারা, সর্বেশ্বর বড়ুয়া প্রভৃতিকে। অনেকের সহিত অন্তরঙ্গ ছিলাম। রোহিণী প্রভৃতি ছিল প্রিয় শিষ্য।

স্যার উইলিয়ম রীড ফিনান্স মেম্বারের নিকট পার্লামেন্টারী রীতিনীতি শিখিয়াছি। বিলাতে ছুটিতে গেলে হাউস অব কমনসে যাইতেন। বলিতেন, "Within the constitution we shall try to carry the council with us".

লোক চিনিতেন। একদিন বলেন, "Brajendra attacks like a solid wall in front".—Flank movement জানে না "He will be a failure."

লোকটি ধূর্ত। অবস্থা ভেদে নানা মূর্তি ধরিতেন—স্তোকবাক্য, ব্যঙ্গ, চোখপাকানো—আবার, পায়ে ধরা সব কৌশলই (কূটনীতি) জানিতেন।

একদিন গুরুমারা বিদ্যা প্রয়োগ করিলাম। বেচারী রীড একদিন অধিবেশন কালে দাঁড়াইয়া গ্যালারীতে উপবিষ্টা স্ত্রীর সহিত কথা বলিতেছিল। আমি পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপন করিয়া এই পরিষদীয়রীতি-বহির্ভূত আচরণের প্রতিবাদ করিতেই ভ্যাবাচেকা খাইয়া নতমস্তকে আসিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িল। এইরূপ দ্বন্দ্ব ও রঙ্গতামাসায় কাউন্সিল চলিত। হাওয়া গরম হইয়া উঠিলে সামান্য দু একটি সরস শব্দেই সব ঠিক হইয়া যাইত। মিটিয়া যাইত। Interpellation is the salt of debate.। তর্কাতর্কি আমার চিরকালের স্বভাব। দীর্ঘ ভাষণ কি অযৌক্তিক কথা সহ্য করিতে পারি না। আমার নাম হইল "The Hon'ble interrupter"। Interpellation বা Supplementary প্রশ্ন হ্রস্ব হইবে—দুই একটি মাত্র শব্দ। দীর্ঘ তর্কবিতর্ক বিরক্তিকর ও অবৈধ।

অবসর গ্রহণের পর রীডকে বিলাতে একদিন এক মাঠে নিজ গাড়ীর পাশে স্ত্রী ও কুকুরসহ নিজের রিভলভারের গুলীতে হত অবস্থায় পাওয়া যায়। কি দুঃখে এই আত্মহত্যা! রীড ধনী ছিলেন। চায়ের শেয়ার ছিল।

গভর্ণর স্যার জন কার চেহারা ও চরিত্রে খাঁটী "জন বুল"। চাকুরী বাঙলায় ছিল। বাঙালীভক্ত। ১৯২৫ ইংরাজীতে বঙ্গভুক্তি প্রস্তাব পাশ হইলে কাউন্সিলে আমাদের বিদায়সম্ভাষণে বলেন—I have worked lifelong amongst the Bengalees—I shall miss here the intelligence—the dash, the power of organisation, the imagination and the patriotism of the Bengalees, I wish you Bon-voyage.

কার, রিটায়ার করার অল্প পরে মারা যান। ১৯৩৪ ইংরাজীতে কার যখন ফ্রেঞ্চাইজ কমিশন সদস্য হইয়া ভারতে আসেন তখন 'কার-মুডীমেন কমিটির রিপোর্টে' লিখেন—The deputy leader of the opposition is the outstanding feature of the council. He is studious—his general information is wide—can speak on any subject without notice. অযাচিত প্রশস্তি!

গভর্ণর হ্যামন্ড আমাকে বলিতেন "Our unofficial finance member."

জমিদারী পরিচালনার অভিজ্ঞতার দরুণ রাজপুরুষগণ আমাকে পছন্দ করিতেন। আমি যে সব রাজপুরুষদের সংস্পর্শে আসিয়াছি, দুই একটি ভিন্ন তারা সবই লোক ভাল। দেশী সহকর্মীদের অপেক্ষা ইহাদের সহিতই হৃদ্যতা ছিল বেশী যদিও ইহারা শত্রুপক্ষ।

কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসী বন্ধুগণ

১৯২৩-২৫ পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়া জাতীয় দলের (সুর্মাভ্যালী ন্যাশনালিস্ট পার্টি) প্রোগ্রাম ও লক্ষ্য সম্বন্ধে একমত হই। কিন্তু অহিংসা 'ক্রীড' বলিয়া মানিতাম না। আমার ধাত তাহা নয়।

চিত্তরঞ্জনের 'spirit of abandon' আমাকে অভিভূত করে। ১৯২৪-এ এম. এল. এ.-দের কনফারেন্সে লখনৌতে প্রথম তাঁহাকে দেখি। শ্রদ্ধা হইল। দূরসংলগ্ন দৃষ্টি ভাবুক কর্মী। তাঁহার ও মতিলালের প্রস্তাব ছিল ভারতের শাসনতন্ত্র কি হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া গোল-টেবিল বৈঠক ডাকার জন্য বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করা। 'রাউন্ড টেব্‌ল' কথাটি এই প্রথম এদেশে ব্যবহার হয়। বিঠলভাই প্যাটেল তখন বলিতে লাগিলেন "এত হ্যাঙ্গামার দরকার কি? এসেম্বলীতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। শাসনতন্ত্র সম্বলিত প্রস্তাব সেখানে পাশ করিলেই তো কাজ হইবে।"

সি. আর. দাসের পীড়াপীড়িতে বিঠলভাই গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত আপত্তির কারণ বলিলেন "জমিদার ও অনুন্নত শ্রেণী গোলমাল করিবে।"

চিত্তরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন—"ওঃ, আপনি শুধু স্বরাজ্য দলের জন্যই স্বরাজ চান? অন্যরা কি ভারতের লোক নয়? আমার 'বন্ধু' প্যাটেলের কথায় আমার এক মক্কেলের কথা মনে পড়িতেছে। সে তাহার পৈতৃক বাড়ীটি অন্য শরিকদের অজ্ঞাতসারে ভাগাভাগি করিতে চাহিয়াছিল।"

প্যাটেল লজ্জা পাইলেন। চিত্তরঞ্জনের মহত্ত্ব অনুভব করিলাম। মতিলালকে কাশ্মীরী টুপি আচকান পাজামায়, বইয়ে দেখা রাজা দশরথের ছবির মত মনে হইল।

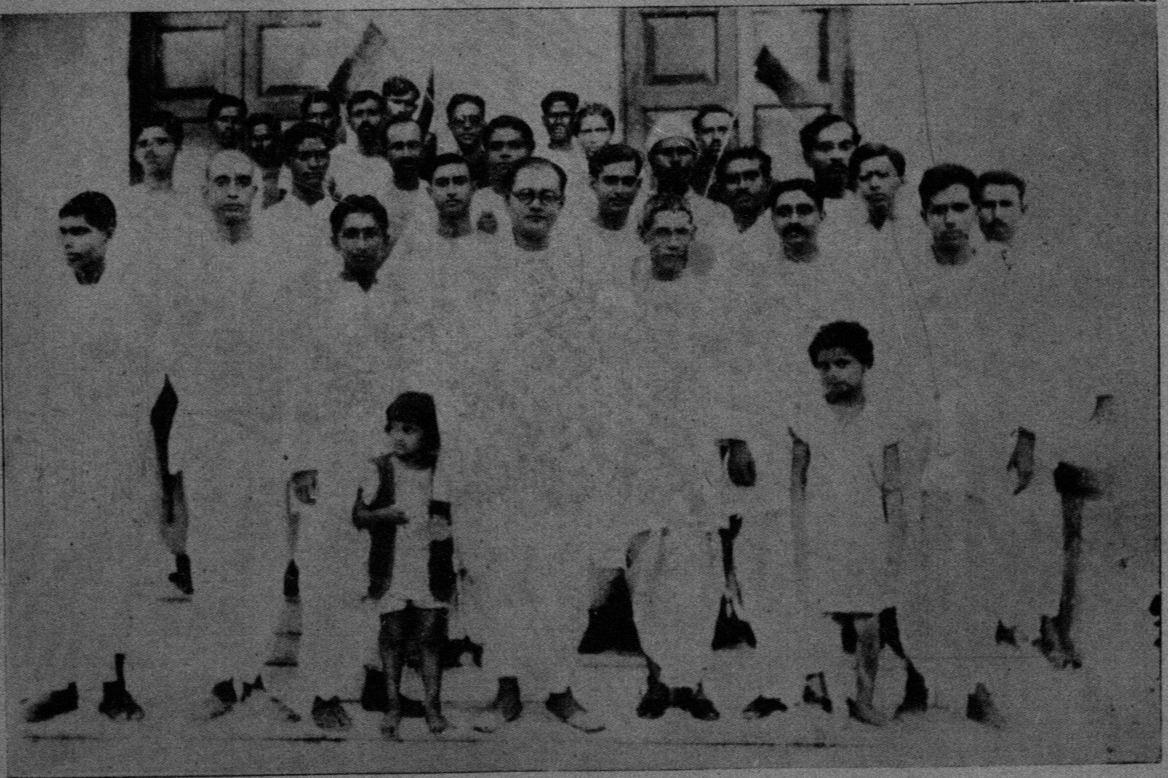
সি. আর. দাসের মৃত্যুর চারদিন পর কংগ্রেসে যোগ দেই। বন্ধুরা বলিতেন 'দেশবন্ধুর posthumus child'. কলিকাতায় অহিংসা বনাম হিংসা বাদানুবাদে মনে হইত নীতি (পলিসী) হিসাবে অহিংসা চলিতে পারে অর্থাৎ বিপিন পালের ভাষায় 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' মাত্র। ইতঃপূর্বে গান্ধীবাদী আসরে (বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে) ভাঙ্গা ঢোল বাজানোতে বিপিনবাবু রাজ-নীতিক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত।

স্বরাজ্যদল কাউন্সিলগুলিতে, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথককরণ, কমিশনারের পদলোপের প্রস্তাব বৎসর বৎসর করিতেন। এখনও অবস্থা পূর্ববৎ।

শ্রীহট্ট জিলা কনফারেন্সগুলিতে কলিকাতা প্রবাসী শ্রীহট্টবাসীদের মধ্যে বিপিন পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। আবদুল করিম, সাহিত্য বিশারদ, স্কুল ইন্‌সপেকটর একবার উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কাহারও উপস্থিতির সংবাদ জানি না। অপর কৃতীপুরুষ ও নেতারা কলিকাতায় সিলেট ইউনিয়নে কর্তব্য শেষ করেন। আমার সময়ে সিলেট ইউনিয়ন বন্যায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করা ছাড়া শ্রীহট্ট জেলার জন্য আর কিছু করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। সর্বশেষ সিলেট রেফারেণ্ডাম-এ কিছু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সংগৃহীত চাঁদা হইতে ব্যয় করিয়া আকাশপথে শ্রীহট্ট গিয়া পরদিনই ফিরিয়া আসেন। ভয়ে ট্রেনে যাতায়াতে সাহস পান নাই। সুন্দরীমোহন দাস শেষ পর্যন্ত দেশের সহিত যোগরক্ষা করিয়াছেন। ৮৬ বৎসর বয়সেও পিতৃভূমি দর্শন করেন। জনশক্তিতে প্রায়ই লিখিতেন। গিরীশ দাস ইঞ্জিনিয়ার শ্রীহট্টে বাড়ী করিয়া ও সম্পত্তি ক্রয় করিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্ট যাইতেন। অবশ্য এখন কেহ কেহ হয়তো তাঁহাকে বোকা ঠাওরাইবেন।

কংগ্রেস কমিটির নীতিগত বাদানুবাদ ভাল লাগিত না। জিলায় গঠনমূলক কাজ হইবে—এত নীতিকথা কেন? কর্মীরা ছাত্রাবস্থায় সংসারের কাজ ছাড়িয়া বা কোনও কাজ না করিয়া—অনন্যকর্মা হইয়া দেশের কাজ করেন। রাজনীতি ঘোর সংসারীর কাজ। যাঁহারা কোন কাজই শেখেন নাই, হৈ চৈ ও নীতিকথা ভিন্ন আর কি করিবেন? তবে ভাবের আবেগে যুবকগণ যে প্রাণপণ কাজ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সফল হইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছি। তবে সংসারের ট্রেনিং ছাড়া ছাত্রযুবক রাজনীতিতে ঢোকার ফলেই আজ এত অশান্তির সৃষ্টি। ভাবপ্রবণতা চাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও চাই। ভাব আগুন : আগুন কি করিয়া সামলাইতে হয় জানা চাই। এম. এল. এ.-দের নিম্নতম বয়স ২৫। ইহা ৪০ করা কর্তব্য। যাহারা নিজে রোজগার করে, কেবল তাহাদেরই ভোট থাকা উচিত। সংসারী আগে, দেশকর্মী পরে—উল্টা হইলেই মুস্কিল। আবার সকলেই নেতা হইবে এও মুস্কিল। রাজনীতিকেই অনেকে পেশা করিয়াছেন।

মতলবের কংগ্রেসীরা যে কি রূপ অনর্থ ঘটাইতে পারে তাহা একবার মিউনিসিপাল নির্বাচনে দেখিয়াছি। শ্রীহট্ট কংগ্রেস একবার মিউনিসিপালিটি অধিকার করার চেষ্টা করে। আমি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে গঠনমূলক কর্মে দলাদলির স্থান নাই—এই গান্ধীনীতি অনুসরণ করিতাম। যদিও সকলের অনুরোধে আমাকে দাঁড়াইতে হইল তথাপি উপেন্দ্র সেনকে দলনেতা করিলাম। উপেন্দ্রবাবু কমিশনার ওয়াকারের সহিত দেখা করিলে ওয়াকার বলেন "কংগ্রেস



সুভাষচন্দ্র বসুর শ্রীহট্ট পরিদর্শনকালে গৃহীত চিত্র। (১৯৩৩)
পরিচিতি পর পৃষ্ঠায়

১ম সারি—কেদারনাথ ভট্টাচার্য হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী অনাথবন্ধু দাস বর্ণী—সুভাষচন্দ্র—লেখক—পরেশলাল সোম নন্দরাণী বিনোদ-বিহারী চক্রবর্তী

২য় সারি—দ্বারিকানাথ গোস্বামী অমিয়চরণ দাস দ্বিজেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত — —সুনীল দত্ত মহিম দাস গোপেশচন্দ্র পাল প্রদ্যুম্নকুমার গুপ্ত সতীদেব (উকিল)।

৩য় সারি—কামিনী মহেন্দ্র — যতীন্দ্র দত্ত [illegible] — — কুসুমরঞ্জন চৌধুরী — সমরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

(মৌলবীবাজারের অন্তর্গত ভানুবিলে মণিপুরী বিদ্রোহের সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে অনুসন্ধান কমিটি করে তাহার কাজে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন প্রখ্যাত দেশকর্মী ও [illegible] সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত। ছবিটি দ্বিজেন্দ্রবাবুর পুত্রদ্বয় শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীরণবীর দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকিলে আমি খুশী হইব। বর্তমানে একটি পরিবারের নেতৃত্বে উহাতে দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা চলিতেছে। স্বরাজ্যদলের লোক খাঁটি।"

একটি কেন্দ্রে দুইটি সদস্যপদই দখল করিতে পারিব এই আশায় আমি ও মণি নন্দী দাঁড়াই। বেলা একটায় দেখা গেল, অপরপক্ষের মুসলমান প্রার্থী সবচেয়ে বেশী ভোট পাইতেছেন। কথা ছিল, কংগ্রেস সমর্থক ভোটার একটা ভোট আমাকে এবং অপরটা মণি নন্দীকে দিবে। পূর্বরাত্রে মণি নন্দীর তথাকথিত কংগ্রেসী বন্ধুরা অনেকের কাছে—দুই ভোটই মণি নন্দীকে দিতে হইবে—এইরূপ ক্যানভাস করিয়াছেন। আমার অজ্ঞাতে রাত্রি বারোটায় অপর কয়জন কংগ্রেসী, আমাকেই দুই ভোট দিবার জন্য নির্দেশ পত্র বিলি করিয়াছেন। ভোরে এক বন্ধু আমাকে ঐ পত্র দেখান। আমি তো অবাক! অপর কেন্দ্রে ব্যস্ত ছিলাম। বসন্তবাবু এবং প্রতুল নন্দীর (মণি নন্দীর ভ্রাতা) চেষ্টায় দুইটার পর মণি নন্দীকে ভোট দেওয়া স্থগিত হইলে আমি উত্তীর্ণ হই। কংগ্রেসবিরোধী এক মন্ত্রীর আত্মীয়বর্গ এই গোলমাল বাধাইয়াছিলেন।

সুভাষবাবু ও কিরণশংকর রায়ের বি.পি.সি.সি., জিলা কংগ্রেস হইতে আমাদের দলকে ৪।৫ বৎসর আটকাইয়া রাখেন। ১৯৩০-৩২-এর আন্দোলনে আমাদের কাজ দেখিয়া সুভাষবাবু সব আমার হাতে ছাড়িয়া দিলেন। বোধহয় লজ্জিতও হইয়াছিলেন। ডাঃ কিচলুর সহিত আমাকে পরিচিত করাইয়া বলিয়াছিলেন "The uncrowned king of Surma Valley".

জিলা কংগ্রেস একজিকিউটিভ কমিটির একটি দল ক্রমাগত বাধা দিতে লাগিলেন। কাজ করা দায়। আমি সভাপতি হিসাবে বি.পি.সি.সি.-তে পত্র ও টেলিগ্রাম দিলাম। কোনও উত্তর না পাইয়া ইমার্জেন্সী হিসাবে কমিটি সাসপেন্ড করিলাম—কারণ কংগ্রেসের কাজ বন্ধ হইতে পারে না। ব্যাপারটি মতিলালের নিকটে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন "Who is this 'Zuberdust' President who dares suspend his commitee?"

আমি এখনও মনে করি জবরদস্তির দরকার। সম্পত্তি এবং পদ মাত্রই জবরদখল। মতিলালের পুত্র জহরলালও প্রায় জবরদস্ত—অনেক সহকারী মন্ত্রীর এই অভিমত।

Deliberation (ligislation), administration, execution এর পার্থক্য সাধারণতঃ আমরা বুঝি না। প্রথমটিতে বহুর মতের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে অভিজ্ঞদের, তৃতীয়টিতে man on the spot-এর প্রাধান্য।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৩৪ সালের বন্যার সময় আমরা লাট কীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের ১৯২৭-এ গঠিত স্থায়ী সমিতি দ্বারা বন্যার কাজ করিবার প্রস্তাব দিই। কিন্তু জিলার কর্তা গানিং রাজী হন না। মিনিট খানেকো লাট, গানিংকে একরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া আমাদের সমিতির

সাহায্য লইতে বলেন। কিন্তু গানিং অটল। বলিলেন "আমার বহু সব-ডেপুটির কাজকর্ম নাই। এদের দ্বারাই কাজ চলিবে।"

প্রদেশের কর্তাকেও Man on the spot-এর কাছে হার মানিতে হইল।

খাঁটী, তেজীয়ান, বুদ্ধিমান সহকর্মীদের মধ্যে নাম করিতে হয় দলের ডেপুটী লিডার ক্ষীরোদচন্দ্র দেবের। বসন্তবাবু ধীর, স্থির, আইনজ্ঞ। ওকালতির দরুণ সময় পাইতেন না। আন্তরিক, অক্লান্তকর্মী যুবক অনেকে ছিলেন। ইঁহারা অনেকেই শেষ পর্যন্ত আমার শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারেন নাই – হয় তো সংসারের তাড়নায়। নূতন উকীলেরা অনেকে অক্লান্তকর্মী ছিলেন। সংসারের চাপে শেষে আর তেমন পারেন নাই। ঢাকার মন্ত্রী **আবদুল হামিদ, সিরাজুদ্দীন, আবদুল্লা, হরেন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রকুমার দে** প্রভৃতি ১৯৩৫ ইংরাজীর উৎসাহী কংগ্রেসকর্মী।

মৌলবীবাজারের কংগ্রেসকর্মী **কৃপেশ দত্তের** কথা ভুলিতে পারি না—নিখুঁত সৈন্যোচিত চেহারা, যেন মূর্তিমান শৃঙ্খলা। সেনগুপ্ত যখন আমার অতিথি, তাহাকে সেনগুপ্তের দরজায় প্রহরায় রত করিয়াছিলাম। সেনগুপ্ত বলিয়াছিলেন "শান্ত্রী বটে।" নীরব কর্মী ছিল। তাহাকে কথা বলিতে বড় শুনি নাই—অথচ তেজীয়ান। জেলে সবরকম শাস্তি নীরবে ভোগ করিয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস-নীতি ত্যাগ করে নাই—'সরকার সেলাম' স্বীকার করে নাই। পুলিশের অত্যাচারে গৌহাটী জেলে সে শয্যাশায়ী হয়। সরকার তাহাকে মরণাপন্ন অবস্থায় ১৯৩৩-এর ১৮ নবেম্বর ছাড়িয়া দেন। ডাঃ হরেকৃষ্ণ দাস নিজগৃহে রাখিয়া বহু যত্নে চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারেন নাই।

একটি অতি সাধারণ লোকের দেশপ্রেমে মোহিত হইয়াছি। সেখঘাটের **মোহম্মদ ওয়ারিছ,** মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ; সামান্য কাঠের দোকান ছিল। খিলাফৎ আন্দোলনে জেল খাটে। পরে, শেষ পর্যন্ত খাঁটী গান্ধীভক্ত। আর কোনও খিলাফতী শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে ছিলেন না। সোজা লোক, বেশী কথার মারপ্যাঁচ বুঝিত না।

১৯৩৫ ইংরাজীতে কামিনী চন্দের পুত্র **অরুণ চন্দ** কাছাড় হইতে আসাম আইনসভায় যোগ দিয়া কংগ্রেস দলের ডেপুটী লীডার হন। ভাল ইংরাজী জানিতেন ; ভাল বক্তা, তেজীয়ান, দিলদরিয়া লোক ; কাছাড়ে খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

যদিও ১৯৩৪-এর পর আমি এই মত পোষণ করিতাম যে আইনসভায় যাওয়া নিরর্থক, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভিন্ন ইংরেজ তাড়ানো যাইবে না, তথাপি ১৯৩৭ ইংরাজীতে ডাঃ বিধান রায় ও সন্তোষ বসুর বিশেষ অনুরোধে কেন্দ্রীয় আইনসভার উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলাম। আমার

সৌভাগ্য, নির্বাচনে কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয় নাই। দেশবাসীর আশাতিরিক্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি।

আইনসভার কংগ্রেস দলটি আমার মোটেই প্রিয় ছিল না। শ্রীপ্রকাশ প্রভৃতি ২।৪ জন ভাল ভাল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। বাকী সবই সুযোগসন্ধানী, কাজ করা লক্ষ্য নহে, নাম করাই লক্ষ্য। সেক্রেটারী আসফ আলী বহু চেষ্টা করিয়াও সভ্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করাইতে পারেন নাই। সুযোগ সুবিধার জন্য অনেকেই দলনেতা **ভুলাভাই দেশাই** এবং হুইপের তোষামোদ করিতেন। ভুলাভাইও বোধহয় ইহাই পছন্দ করিতেন। তজ্জন্য সেক্রেটারীর কথায় কান দিতেন না। ভুলাভাইর যুক্তিতর্ক ও বাক্যবিন্যাস অসাধারণ ছিল —অনেক সময় বাক্য সমাপ্ত হইত না—তবু চিত্তাকর্ষী। ভুলাভাইর নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতাম কিন্তু শ্রদ্ধা কোনো কালেই ছিল না। নেতারা জেলে—ভুলাভাই লাটের সহিত আপোষ-পরামর্শ করেন! তাঁহার কাপট্যপূর্ণ নরমপন্থী নীতি ও স্বেচ্ছাচারের দরুণ পদত্যাগ করি। পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে দিল্লী, সিলেট ও কলিকাতায় অনেক জল্পনাকল্পনা হইয়াছে—কাহাকেও কিছু বলি নাই কারণ নিরর্থক তর্কাতর্কি আমার নীতি নয়। বাংলার সদস্য **নির্মল চন্দ্র** প্রভৃতি এই কারণে আইনসভায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে

এই সময় আমি সমাজচিন্তা ও শিক্ষায় মনোনিবেশ করি। ইহার পূর্বে ১৯৩৭ সালে মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ **সতীশ রায়** ও **রমণী দাস** (ভূতপূর্ব ই. এ. সি.) সাহিত্য আলোচনার্থে কাল্‌চারাল ক্লাব করেন। আমি প্রথম হইতে স্থায়ী সদস্য ছিলাম। পরে ইহা সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হয়। নিজস্ব বাড়ী ও গ্রন্থাগার ছিল। প্রফেসর **কিশোরী গুপ্ত** এই জন্য খুব খাটিয়াছিলেন। আমি ইহার সভায়, সভ্যতা ও মনঃশাস্ত্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি।

১৯৩৯-এ **নলিনীমোহন শাস্ত্রী, সিতাংশু শেখর দাস** প্রভৃতির সহযোগিতায় শ্রীহট্টে **উইমেন্স কলেজ** খুলি। তিন বৎসর ইতিহাস ও ইকনমিক্স পড়াই। এক বৎসর প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। ছাত্রী সংখ্যা একশতের উপর উঠিয়াছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কলেজ ছাড়িয়া দিই। পরে কলেজটি আসাম সরকার গ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর ছাত্রী কমিয়া যাওয়ায় পূর্ববঙ্গ সরকার বন্ধ করিয়া দেন। জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে পুনরায় প্রাইভেট কলেজ খুলা হয়।

১৯৪৫-এর আগস্টে শ্রীহট্টে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য বৃহৎ

কনফারেন্স হয়। আসামের ভূতপূর্ব ডি.পি.আই. স্মল সাহেব সাহায্য করেন। মুনাওর আলী বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত হইল না।

দেশবিভাগের পর সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার্থে সভা-সমিতি করিয়াছিলাম। তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। এই কার্যে উকীল যতীন্দ্র চৌধুরী, হরেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সাহায্য করিয়াছিলেন।

দেশবিভাগের পরবর্তী কথা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবে না। আমাদের অবস্থা—

Then a deathlike numbness
creeps over the soul
It cares not feel for others' sorrows
It dares not feel its own.

শ্রীহট্টে খিলাফৎ আন্দোলন

পূর্বে বলিয়াছি খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দেই নাই। আবদুল্লা ও মতিন ছিলেন নেতা। কংগ্রেসী সতীশ দেব, শিবেন্দ্রবাবু প্রভৃতি বহু হিন্দু জেলে গিয়াছিলেন—মুসলমান হইতে বেশী। কিন্তু জেলের বাহিরে আন্দোলন, মুসলমান প্রধান শ্রীহট্টে প্রবল হইয়াছিল। স্থানে স্থানে পুলিশ-গারদ বসাইয়া উহা প্রশমিত করা হয়। কানাইঘাট থানায় মুসলমান শতকরা ৮০ জন। তথায় বিরাট সভার নেতা **মৌলবী আবদুল মুছব্বীর** ও **মুজম্মিল আলী**। স্বয়ং কমিশনার ওয়েবস্টার সদলবলে হাজির ছিলেন। এরূপ বিরাট জন-সমাবেশ এ অঞ্চলে কখনও হয় নাই। সাহেব আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে গুলি চালনার আদেশ দেন। বঙ্ক নামে একটি কনস্টেবল হত হয়। খিলাফৎপক্ষে বলা হয়, সাহেব বঙ্ককে গুলি ছুঁড়িতে বলিলে বঙ্ক ইতস্ততঃ করায় সাহেব বংককে নিজেই রিভলভার দিয়া গুলি করেন। তদন্তে এস. ডি. সি. গুরুচরণ চৌধুরী সাব্যস্ত করেন যে, বঙ্ক গোলমালে জনসমষ্টিতে মিশিয়া যাওয়ায় হত হইয়াছে। সর্বসাধারণ সরকারী রিপোর্ট বিশ্বাস করে নাই। পরে কাউন্সিলে ওয়েবস্টারের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। আমার বিশ্বাস হয় না যে ওয়েবস্টার গুলি করিয়াছিল। লোকটি সৎ, নিরপেক্ষ, বিদ্বান ও কর্মঠ : পাদ্রীর ছেলে। পাদ্রী পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। দেশে ফিরিতে লিখায় চাকুরী শেষ হওয়ার পূর্বে চলিয়া যায়। থাকিলে উন্নতির আশা ছিল। এই ওয়েবস্টার যখন এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী তখন উদয় পাটনী নামক এক ব্যক্তির ফাঁসীর হুকুম হইলে সে বড়লাটের কাছে দয়া ভিক্ষা করে। একটি অধীনস্থ কেরাণী ভ্রমবশতঃ জেলারকে দয়া ভিক্ষার দরখাস্তের কথা জানায় নাই। ইহার নিষ্পত্তি

হইবার পূর্বেই উদয়ের ফাঁসী হইয়া যায়। ক্ষুদে কেরাণীর চাকুরী যাবেই এই ভয়ে ওয়েবস্টার সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে। ইহাতে তাহার প্রমোশনের ক্ষতি হয়।

কানাইঘাটের ঘটনার পরদিন যখন কংগ্রেস, খিলাফৎ নেতৃগণ ডি. সি.-র বাংলায় কানাইঘাটের ঘটনা বর্ণনা করিতেছিলেন সেই সময় ওয়েবস্টার অন্য প্রকোষ্ঠে ছিল। যখন বঙ্কর নিহত হওয়ার কথা উঠে তখন ওয়েবস্টার ঘর হইতে আসিয়া বলিয়াছিল "And the next point is Webster shot at Banka !"

মনে হয় পূর্ব হইতে মিথ্যা অপবাদ শুনিতে শুনিতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ওয়েবস্টারের ড্রাফ্‌টিং ছিল খুব ভাল। পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটিতে একটা পয়েন্ট নিয়া তিন ঘন্টা বাদানুবাদের পর আমি জিতি। পরের দিন নিজেই ড্রাফ্‌ট করিল। দেখিলাম আমার যুক্তিগুলি সে আমাপেক্ষা পরিষ্কার করিয়াছে। জনৈক মন্ত্রী নিজ পুত্রের জন্য ওয়েবস্টার হইতে সাব-রেজিস্টারের চাকুরীর সুপারিশ পান নাই যদিও লাট মন্ত্রীর পক্ষে ছিলেন। এমন নিরপেক্ষ লোক সবসময়ে সবদেশেই দুর্লভ।

এই আন্দোলনে পুলিশ, সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর আবদুল হামিদ আকন্দের নেতৃত্বে মাইজভাগ গ্রামে তল্লাসী করিতে গিয়া মজবুর মিঞার গৃহ তছনছ্‌ করে এবং একখানি কোরান ছিঁড়িয়া ফেলে। **ক্ষীরোদ দেব** প্রভৃতি ছিন্ন কোরানের ছবি "জনশক্তি" পত্রিকায় ও কলিকাতার কাগজে প্রকাশ করেন। জনশক্তিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয়। তজ্জন্য জনশক্তির উপর মামলা হয়। জজ বি. এন. রাও মাইজভাগে স্থানীয় তদন্ত করিয়া জনশক্তির বিবরণ সত্য বলিয়া রায় দেন। তিন বৎসর পর ১৯২৩ ইংরাজীতে আসাম কাউন্সিলে স্বরাজ্য জাতীয় দল ঐ আকন্দের বরখাস্তের দাবী করেন। সরকার পক্ষে রীড তীব্র প্রতিবাদ করেন—"I am not going down on my knees in ashes and sack cloth....the movement was a conflagration (বসন্তবাবু টিপ্পনী কাটেন 'Yes, to the official retina)....I will not allow legislature's interference with my executive officers. It goes to the root of discipline."।

প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলাম—"শেষ কথাটি ঠিক। আমরা লজ্জিত যে একটা খুদে কর্মচারীর পেছনে ধাওয়া করতে হচ্ছে কারণ তোমার পিছনে ধাওয়া করার অধিকার আমাদের নাই।"

বর্তমানে বিশেষভাবে ভারত, পাকিস্তানের বিধায়কদের এবং কংগ্রেস ও লীগের চাঁইদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্থানীয় রাজকর্মচারীদের কাজে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার তাঁহাদের নাই যদিচ জহরলাল কি নাজিমুদ্দিনকে

সরানোর অধিকার আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে লণ্ডনের হাইড পার্কে অনেক রাত্রে একটি যুবতীকে একজন বৃদ্ধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পুলিশ তাহাদের থানায় নিয়া হাজতে রাখে। পরদিন প্রকাশ পাইল, বৃদ্ধ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যুবতী তাঁহার ভাইঝি। পারিবারিক একটি বিষাদময় ঘটনায় বৃদ্ধটি যুবতীকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। পরদিন পার্লামেন্টে এই নিয়া প্রশ্ন উঠে। লণ্ডনের পুলিশপ্রধান বলেন কনেষ্টবল দোষী নয়। ক্রমাগত তিন দিন পার্লামেন্টে এ প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উঠার পর প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন। তখন পার্লামেন্ট শান্ত হয়।

এই ঘটনা শিক্ষাপ্রদ। গরীব কনেষ্টবলকে নিরর্থক শাস্তি দিলে কর্মচারীরা ভাল কাজ করিবে না। একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে দেশের বিশেষ ক্ষতি হয় না। পার্লামেন্ট যখন "রক্ত চাই" বলিয়া জিদ করিতেছেন তখন কনেষ্টবলকে বলি না দিয়া মন্ত্রীকে বলি দেওয়াই প্রশস্ত। কর্মচারী রাজার কাছে দায়ী, রাজা দেশের কাছে দায়ী, ব্রাহ্মণপুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য রাজা রামচন্দ্র দায়ী। ইহাই রামরাজ্য। এই ক্ষেত্রে এস. আই.-র শাস্তি এস. পি.-র উদ্যোগে হইবে। যদি না হয় সরকার বদলাইবে। প্রকৃত দোষ শাসনপ্রণালীর।

শ্রীহট্টে স্বদেশী বিপ্লব ও আইন-অমান্যযুগে কয়েকটি ডাকাতি, বোমা, এ ছাড়া খুনও হয়। মৌলবীবাজারে সাহেব এস. ডি. ও.-র বাংলায় বোমা ছোঁড়া হয় স্বদেশীযুগে। পরে ইটাখোলা মেল ডাকাতি ও চাঁদপুর ডাকাতি। দ্বিতীয়টার আসামী ধরা পড়িয়া শাস্তি পায়। সিলেটের বানিয়াচঙ গ্রামের তিন ভাই **হেম, সুশীল** ও **প্রফুল্ল**-আদি বিপ্লবী বারীন ঘোষের দলের। হেম ফেরার হইয়া নিরুদ্দেশ হয়। বিপ্লবীদের অনেকে গান্ধীপন্থী হইয়া পরে কম্যুনিষ্ট হইয়াছে! ধাত, Every day to fresh fields and pastures anew ?

খিলাফৎ আন্দোলনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৩০-এর অসহযোগে বহু যুবক, কয়েকজন প্রবীণ উকীল ও অল্প কয়জন মুসলমান এবং নারী জেলে যান। এই জিলায় জেলখাটাদের সংখ্যা বাংলার জিলাগুলির মধ্যে তৃতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে। জিলাপিছু বন্দীর সংখ্যাই ছিল আন্দোলনের মাপকাঠি। বহুপূর্বে লুপ্ত লবণের কূয়া বনজঙ্গলে আবিষ্কার করিয়া সোল্লাসে লবণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। করিমগঞ্জে এক চা-বাগানের জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রাচীন লবণের নালী (কূপ) আবিষ্কারে বে-আইনী লবণ সংগ্রহ করা হয়। সুরেশ দেব (পরে এম. পি.) কূপে নামিয়া বালতি ভর্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কর্দম আমার হাতে দেন। ঐ কর্দম বাগানে আনিয়া জ্বাল দিয়া লবণ তৈরী হয়। বেলা তৃতীয় প্রহরে লবণ গ্রহণ করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করি।

দুই এক স্থানে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করার চেষ্টা হইয়াছিল। ১৯৩২-এর আন্দোলনে অনেক কম লোক জেলে যায়। কারণ প্রচারের সময় ও সুযোগের অভাব। প্রধান প্রধান কর্মীরা সকলেই জেলে ছিলেন।

১৯৪২-এ কংগ্রেসের পরিষ্কার নির্দেশের অভাবে আন্দোলন জমে নাই। শিবেন্দ্রবাবু আর কাছাড়ের অরুণ চন্দ প্রমুখ সিলেটের জন কয়েক কংগ্রেস-কর্মী জেলে যান। কংগ্রেসকর্মী উকিল উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী আদালত বসার পূর্বে জজ-আদালত দখল করিয়া কিছুক্ষণ বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। পরিকল্পনা ছিল মসরুওয়ালার। গান্ধী ইহার দায়িত্ব অস্বীকার করেন।

১৯৩০ ইংরাজীর গোড়ায় আমার গ্রেপ্তারের পরদিন আচম্বিতে সহরের ভদ্রমহিলাগণ রাস্তায় বাহির হইয়া প্রসেশন করেন, বসন্তবাবুর নেতৃত্বে। ছাপা কাগজ দেখিয়া জেলে ডাক্তার সাহেব বলেন "You have tread the path of fifty years in social reform in a day."।

১৯৪২-এর বিপ্লবে মিসেস অরুণা আসফ আলী শ্রীহট্টের একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া পরে গিয়া উঠেন এ ডি. এম. কিদোয়াইর বাংলায়। লুক্কায়িত ফেরার আসামীই বটে!

চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্য সেন শ্রীহট্টের রেঙ্গা গ্রামে কিছুকাল লুকাইয়া ছিলেন।

আমার জানা লোক

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পর পর কয়েকবার দেখা হইয়াছে। প্রথমবার সিলেটে প্রিন্সিপাল সতীশ রায়ের বাড়ীতে। পরে শিলচরে। তিনি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি—আমি সমবায় সম্মেলনের সভাপতি হইয়া গিয়াছিলাম। উভয়ে কামিনী চন্দের অতিথি হইয়াছিলাম। আমার বক্তৃতায় "Under official control the true co-operative spirit will be wanting. The movement cannot thrive"—এই কথাটা তাঁহার মনে লাগিয়াছিল। ঐ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিতে বলেন। ১৯৩২ ইংরাজীতে করাচী কংগ্রেসের পথে ট্রেনে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি বিষয় অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। তৎপূর্বে বাংলায় একটি অকংগ্রেসী সম্মেলনে (সম্ভবতঃ হিন্দুসভা) মানভূম ও ভাগলপুরের বঙ্গভুক্তি দাবী করা হয় কিন্তু সিলেটের উল্লেখ ছিল না। তিনি বলেন, আপনারা আসামে থাকিলে ক্রমশঃ বাঙ্গালী সভ্যতা ও বাংলা ভাষার প্রচারে, কালে আসাম বাংলাদেশ হইবে। উত্তর দিয়াছিলাম, 'সে গুড়ে বালি।' নবজাগ্রত অসমীয়া জাতীয়তাবাদ সবল। হয় তো আসাম ময়মনসিংহিয়া উপনিবেশে পরিণত হইয়া কালে মুসলমানের দেশ হইবে—এই আশায় লীগ বঙ্গভুক্তির বিরোধিতা করিতেছে। সাদুল্লা, আবদুল মতিনের এই অভিপ্রায়।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত ছিলাম। **কাকা কালেলকর** হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে গিয়া শ্রীহট্টে দুইবার আমার অতিথি হন। শিলচরে এক সভায় প্রকাশ্যে হিন্দীর বিরোধিতা করায় তাঁহার সহকর্মী একজন (বাড়ী ইউ. পি.) আমাকে অভদ্র আক্রমণ করেন। কালেলকর বাংলা জানেন, তবে বক্তৃতা দিতে পারেন না। বঙ্কিমের উপন্যাস, বিশেষভাবে লোকরহস্য তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ। তিনি বলিয়াছিলেন পূর্বে নাগরী হরফ গ্রহণ করিলে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হইত। লিখিত ভাষা প্রচারে হরফের প্রভাব বেশী।

কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী **মহেশ ভট্টাচার্যকে** কুমিল্লায় তাঁহার বাড়ীতে ১৯৩২-এ দেখি। এক আনায় এক আউন্স শিশি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তখন বাজারের মূল্য চারি আনা। আমার সঙ্গে **অখিল দত্ত** ছিলেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গনের পাশে টানা সিঁড়ি দুইটি, দালানে বহু উচে উঠিয়াছে। সিঁড়িগুলিকে গ্যালারি করিয়া সামিয়ানা খাটাইয়া বৃহৎ বৃহৎ কনফারেন্স এই মহেশপ্রাঙ্গনে হইত। প্রাতে তাঁহাকে বাড়ীতে না পাইয়া তাঁহার স্থাপিত 'রামমালা' বিদ্যালয় দেখিতে যাই। সহরের উপকণ্ঠে বিস্তৃত ভূমি, বাগান, তন্মধ্যে পাকা দেওয়াল টালীর ছাদ স্কুল ও ছাত্রনিবাস। মহেশ-বাবু ছাত্রদের চাউল, ডাইল ইত্যাদি দিয়া অর্ধেক ব্যয় বহন করিতেন। বাকীটা ছাত্রেরা গরু পালিয়া, বাগানে কাজ করিয়া সংগ্রহ করিবে। দুঃখ করিলেন, স্বাবলম্বী করিবার জন্য এই চেষ্টা সফল হয় নাই। বিদ্যালয় হইতে ফিরিবার পথে বেলা এগারটায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সকালে গিয়া এইমাত্র ব্যাঙ্ক হইতে ফিরিয়াছেন—খালি পা, গায়ে ফতুয়া। তাঁহার নিজের তাগিদে নহে, তাঁহার নিকট গচ্ছিত অপরের টাকার তাগিদে। মৃত্যুর পূর্বে এইগুলি পরি-শোধ করিয়া না গেলেই নয়! কয়েক দিনই তিনি বাঙ্কে ধরনা দিতেছেন। তখন ১৯২৮ ইংরাজীর slump-এ ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল। কুমিল্লাবাসী হাইকোর্টের উকীল গোবিন্দচন্দ্র দাসের আনুকূল্যে দরিদ্র মহেশবাবু কলি-কাতায় সামান্য ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষপতি হন। তাঁহার চরিত্রবল, নিয়মনিষ্ঠা এবং বৈষয়িক কতকগুলি নীতি ছিল। কিছুতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইতেন না। তজ্জন্য তাঁহাকে কতকটা একগুঁয়ে, জেদী ও অদ্ভুত মনে হইত। গার্হস্থধর্ম বিষয়ে তাঁহার দুই তিনখানা বহি উপহার দেন। এক স্থানে লিখিয়াছেন—শঠব্যবহারকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও মোকদ্দমা করিয়া শাস্তি দেওয়াবে—বহুব্যয় সত্ত্বেও। তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাঁচী প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেন।

হরিজনসেবক **এ. ভি. ঠক্করও** শ্রীহট্টে আমার অতিথি হন। অতি সাত্ত্বিক, হাস্যমুখ, দরদী লোক। ১৯২৯ ইংরাজীর বন্যায়ও গিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একবার শ্রীহট্টে আমার অতিথি হন ১৯৩২-এ।

ঠিক এর পরে **সুভাষবাবুও** যান। উভয়েই আমাকে দলে টানিবার চেষ্টা করেন। আমি নিরপেক্ষ ছিলাম। সুভাষবাবুর সহিত, আবার আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে, এই বিষয়ে একমত হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে পরামর্শক্রমে আমি উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রচারে বাহির হই। তিনি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারকার্য করেন। তৎপর বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে সম্মিলিত হই। এই সভায় বোম্বের **নরীম্যান** ও **বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের** সহিত সাক্ষাৎ হয়। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রেসিডেন্সীতে আমার দুই শ্রেণী নীচে পড়িতেন। এই কন্‌-ফারেন্সে বঙ্কিম মুখার্জি কৃষক-প্রজাদের কংগ্রেসের ভিড়ানোর উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, জমিদারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিবে। কংগ্রেস সর্বজনীন—এই যুক্তি দেখাইয়া আমি বিরুদ্ধাচরণ করি। **সুরেশ মজুমদার** প্রভৃতি আমাকে নিষেধ করিয়া বলেন, "জমিদার বলে গাল দেবে।" বলিয়াছিলাম "জমিদার তো আর চোর নহে।" বঙ্কিম জমিদার লাল-মিঞাকে ভয় দেখাইয়া ভোট আদায় করিয়াছিলেন। তাঁহারা অল্প ভোটে হারেন। বলিয়াছিলাম "Next time you win".

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে "রাজেন্দ্রবাবু ভাল বাংলা জানেন। বাংলা দেশে শিক্ষা এবং বহুকাল ছিলেন"—এইরূপ বলার পর বাংলাতে বেশ ভাল বক্তৃতা দেন। কোনও অঞ্চলের ভাষা জানা থাকিলে সেখানে অন্য ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া অন্যায়।

তিনটি জিলা কমিটির মনোনয়নে **হরদয়াল নাগের** সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। প্রবীণ হরদয়াল রাজ্যসভাপতি হন। তাঁহার সহিত পূর্ব হইতেই পরি-চিত ছিলাম। ইতিপূর্বে তিনি সিলেটেও গিয়াছেন। আমি সিলেট ছাড়িয়া কোথাও বড় যাই নাই। কোনও বিশেষ কাজে কলিকাতায় আসিলে, অমৃত-বাজার, লিবার্টি, এডভান্স সম্পাদকদের সঙ্গে ও সেনগুপ্ত, সুভাষবাবুর সঙ্গে দেখা করিতাম। একবারের বি. পি. সি. সি.-তে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মনোনীত হইয়াও যোগ দেই নাই। তজ্জন্য কিরণশঙ্কর অনুযোগ করিয়া-ছিলেন। এই বিষয় নিয়া আসামের লাট জনৈক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "দেখিতেছি কংগ্রেসেও নমিনেশন আছে। যত আপত্তি আমার নমিনেশনে।"

সেনগুপ্ত, সুভাষবাবুর বিরোধের সময় **বিধান রায়** টেলিগ্রাম করিয়া আমাকে আনাইয়া মহাবোধি হলে বিরোধ-নিষ্পত্তি সভার সভাপতিপদে বসাইয়া দিলেন, যেহেতু এই বিরোধে কেবল শ্রীহট্ট ও বাঁকুড়াই নিরপেক্ষ। তিন ঘন্টাব্যাপী আলোচনায় কোনো ফল না হওয়ায় সেনগুপ্ত ও সুভাষ-বাবুকে বলি "যদি আপনাদের বিবাদ নিজেরা মীমাংসা না করিতে পারেন, তবে আমাদের নেতৃত্ব করার আপনাদের অধিকার কি?"

সেনগুপ্ত বলেন "সুভাষ আমার ছোট ভাই-এর মত। আমি তাহাকে শঠ বন্ধুদের হাত হইতে রক্ষা করিতে চাই।"

সুভাষবাবু বলেন "এ ঝগড়া আমার ও সেনগুপ্তের নয়। ইহা আনন্দ-বাজারী দল, এডভান্স ও লিবার্টির ঝগড়া—ব্যবসায়ীর বিবাদ।"

কলিকাতার কংগ্রেসীদের মতিগতি দেখিয়া তখনই বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলাম। এই বিরোধে মাধব শ্রীহরি আনে অনুসন্ধান করেন। আনে আমাকে বলিয়াছিলেন "বিসমার্কতুল্য কূটবুদ্ধির অধিকারী কিরণ-শঙ্কর স্বাধীন দেশে বিসমার্কের মত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইতে পারিতেন।"

মুসলমান কংগ্রেসী **হাসেমী (লাল মিঞা)** সিলেট গেছেন। ইঁহারা প্রতিশোধ শব্দটি কথায় কথায় ব্যবহার করিতেন। হিন্দু সাহিত্যে ভীমসেনের মুখে ভিন্ন প্রতিশোধ শব্দটার ব্যবহার বড় দেখা যায় না। দ্বন্দ্বকলহময় জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রতিশোধ প্রবৃত্তির দরকার। সাধারণের প্রকৃতি উচ্চ নয়। কর্তব্য-বোধ অপেক্ষা প্রতিশোধ প্রবৃত্তি বলবান। কর্তব্যে তেজী করে না কিন্তু প্রতিশোধে করে। পুরাতন বন্ধু অনেক মুসলমান কংগ্রেসী ছিলেন। শেষে সকলে লীগদলে যাওয়ার পর হৃদ্যতা লোপ পাইয়াছে। এটা মনে বড় লাগে। ভিন্ন মতবাদ এমন কি যুদ্ধবিগ্রহই বা ব্যক্তি সম্বন্ধের ক্ষতিকর হয় কেন? সি. আর. দাশ ও এস. আর. দাশের ছাড়া-ছাড়িতে ভগ্নী ঊর্মিলা দেবী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯৪৬ সালের ইলেকশনে ও তৎপূর্বে **জহরলাল** এই দুইবার সিলেট গেছেন। প্রথম বারে জিলা কংগ্রেসের সহিত ভাল ভাব না থাকায় সাক্ষাতের সুযোগ পাই নাই যদিচ আমি তখন সেন্ট্রাল এসেম্বলীর কংগ্রেসী সদস্য। বন্ধুবর ও সহসদস্য কুলধর চালিহা দেখা করিতে বলিলেও উপযাচক হইয়া যাই নাই। ১৯৪৬-এ আমার অতিথি ছিলেন। আমি ইলেকশন বোর্ডের সভা-পতি—কিন্তু আমার শরীর খারাপ থাকায় বসন্তবাবুই তাঁহাকে নিয়া জিলা সফরে যান। আহারের সময় ভিন্ন তাঁহার অবসরই ছিল না। কথা জমাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, জহরলাল অসম্ভব চাপা স্বভাব; চটপটে, আবেগ-প্রবণ, অধৈর্য, ব্যবহারে কেতাদুরস্ত, এই মনে হইল। তাঁহার পরিশ্রমক্ষমতা, সময়নিষ্ঠার কথা সকলেই জানেন। সকালসন্ধ্যা এক মিনিটও বিশ্রাম না করিয়া রাত্রি দুইটার সময় গৃহে ফিরিয়া অটোগ্রাফ লিখা শেষ করিয়া শয়ন। পরদিন প্রাতে ছয়টায় উঠিয়া আবার কাজ। এইরূপ কয়েকমাস তিনি সফর করিয়াছেন। মনের বল ও সময়ানুবর্তিতা এবং স্বল্পাহারই এর মূল রহস্য। আমিও ৪৫—৬০ বৎসর বয়েসে একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ, একমাস এরূপ সফর করিয়াছি—কখন গাড়ীতে, কখন রেলে, অধিকাংশ সময় হাঁটা পথে জলকাদায়। নৌকায় পালের সাহায্যে তেরো মাইল হাওর এক ঘন্টায় পাড়ি দিয়াছি। সহ-

কর্মীগণ বাহির হইতে দেরী হইলে যে বকুনি খাইতেন এখনও তাহার উল্লেখ করেন।

সেনগুপ্ত ছিলেন সরল, সেন্টিমেন্টাল। সিলেটে যখন যান তখন হাই ব্লাডপ্রেসার। লঙ্কা খাইতেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন "চাটগাঁয়ের লোক, আমি এত লঙ্কা জীবনে খাইয়াছি সে ঋণ এখন শোধ করিতেছি।"

বিকালে সভার সময় হইয়া গিয়াছে বলায় বলেন "আগে বাঁচি পরে সভা। চলুন, গাড়ীতে একটু হাওয়া খেয়ে আসি।"

রাস্তায় দুইটি ব্যাঙ্কগৃহ দেখিয়া বলেন "লোকে এত ব্যাঙ্ক করে। আমাকে যদি কেহ ষাট হাজার টাকা দিত!"

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে স্ট্রাইকের দরুণ তাঁহার ঋণের বোঝা এর পরে চাটগাঁয়ের হাজীসাহেব শোধ করেন। এই হাজী সাহেব, সাহেব কোম্পানীর প্রতিযোগী হইয়া চিটাগং-আকিয়াব স্টীমার লাইন খুলেন। হিন্দু-মুসলমানে সেই প্রীতি আজ কোথায়?

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে স্ট্রাইক ১৯২১-এ হয়। সাহেব-ম্যানেজারদের অত্যাচারে চা-মজুর (কুলী) বাগান ত্যাগ করিতে আরম্ভ করে। দেশে যাইবে এই উদ্দেশ্য—যদিও অনেকের বাগানেই জন্ম—দেশ দেখে নাই। একে একে বাগান খালি হইতে লাগিল। একটি দশ বৎসরের বালক দন্তবিকশিত হাসির সহিত বলিয়াছিল "আউর ঘন্টি (অর্থাৎ কাজের ঘন্টা) নাহি পড়ে গা। মুলুক চল্ যাতা হ্যায়।" ইহারা বিনাটিকিটে রেলগাড়ীর ছাদে বসিয়া চলিল। সরকার, কমিশনার কে. সি. দে-র তত্ত্বাবধানে চাঁদপুরে ইহাদের আটকাইলেন। স্টীমার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চাঁদপুরে সশস্ত্র পুলিশ ইহাদের উপর বেয়নেট চালাইল। প্রতিবাদে রেলকর্মচারীগণ ধর্মঘট করিলে সেনগুপ্ত ইহাদের সাহায্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। চিত্তরঞ্জন নৌকায় পদ্মা পাড়ি দিয়া উপস্থিত হইলেন।

রেলকর্মীদের অনেকের চাকরী গেল। এখনও করিমগঞ্জ ও কাছাড়ের আনাচে কানাচে দুই একজন ঐ রূপে কর্মচ্যুত লোক মিলে যাঁহারা অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। বড়দের ত্যাগই আমরা বড় করিয়া দেখি। ইঁহাদের ত্যাগ চোখে পড়ে না। অগণিত সত্যিকার দেশপ্রেমিকগণ অজ্ঞাত, অবহেলিত।

কুলীরা অল্পসংখ্যক মুলুকে গেল। বাকীরা অসহায়, নিরুপায় হইয়া বাগানে ফিরিয়া গেল। Labour agreement-এ ইহারা ছিল ক্রীতদাস। এখন agreement নাই। "গিরমিটের" (এগ্রিমেন্ট শব্দের অপভ্রংশ) কুলীদের আড়কাঠিরা মিথ্যা প্রলোভনে ভাগাইয়া আনিত। সাহেব কোম্পানীগুলি বিহারের রাঁচি, উড়িষ্যার গঞ্জাম এই সব অঞ্চলে আড়কাঠি পাঠাইত। সিলেটের

(পরবর্তী কালে বিখ্যাত ও গণ্যমান্য) কোনো ভদ্রলোকের 'আড়কাঠি' অপবাদ ছিল। কুলীর মূল্য ১০০—২০০ টাকা ছিল। কুলীরা কলিকাতা হইতে বাগানের খরচে সিলেট, কাছাড়, আসাম যাইত। কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে বুক ফুলাইয়া বলিত "বাগিচামে যায়েগা।"

কিছুকাল পর শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভিক্ষা করিতে আসিত "বাবু, ভিখ্ মাঙ্গকে বাগিচাসে আয়া।" আড়কাঠির ভাগানো একটি স্ত্রীলোক চল্লিশ বৎসর আমাদের বাড়ীতে দাসী ছিল।

সেনগুপ্ত-সুভাষ বিরোধের সময় সেনগুপ্ত আমাকে খাওয়াইয়া, তিনঘন্টা ভজাইয়া একটি সহি নিতে পারেন নাই। তাঁহার বন্ধু কিরণশঙ্করবাবুকে বলিয়াছিলেন, আমি "Terrible man". (সাংঘাতিক লোক)। পলিটিক্সে ঝগড়া সত্ত্বেও উঁহারা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সুভাষবাবু স্বল্পভাষী। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। কিরণবাবু তাঁহার মন্ত্রী ও দক্ষিণ হস্ত। কিরণবাবু ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটিগুলিকে হাতে রাখায় সিদ্ধহস্ত তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সুভাষবাবু রুগ্ন অবস্থায় যখন ডালহৌসীতে ছিলেন তখনও কাগজে লিখেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে লিখিয়াছিলাম। উত্তর দিয়াছিলেন "মন মানে না। আপনিই বা কেন চুপ করিয়া আছেন? আবার নামুন না।"

তাহার উত্তর দিয়াছিলাম "জিলা কমিটিগুলি এত খারাপ হইয়াছে যে আইন-অমান্য আন্দোলনে যাহারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী, খাঁটি সহকারী তাঁহারাই আপনাকে সমর্থন করিবে বলিয়া ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে।"

সুভাষবাবু পরবর্তীকালে আমার অতিথি হইয়া সিলেটে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন কিন্তু আমার সহিত পলিটিক্স আলোচনা করেন নাই।

অখিল দত্তের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। আগেই সিলেটে পরিচয় হয়। পরে দিল্লীতে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। Nestor৩ of the House গণ্য হইতেন। জাতীয় দলের নেতা আনে, অখিল দত্ত ডেপুটি লীডার।

কালেভদ্রে কলিকাতায় আসিলে **শরৎ বসুর** সহিত 'লিবার্টি' পত্রিকা অফিসে দেখা হইত। পরে গৌরীপুর জমিদারের এক মোকদ্দমায় সিলেট গেলে দেখা হয়। বহু বৎসর পূর্বে "লিবার্টির" সাহায্যে অযাচিতভাবে টাকা পাঠাইয়াছিলাম। ঐ কথার উল্লেখ করেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর "সারভেন্ট" পত্রিকায়ও কিছু সাহায্য দিয়াছিলাম। বিধু সেনের অনুরোধে ইউনাইটেড প্রেসেও কিছু শেয়ার নিয়াছি। খাদি প্রভৃতির জন্য বহু চাঁদা দিয়াছি। পাইলগাঁওয়ে একটি হাইস্কুল স্থাপনা করি। পঁচিশ বৎসর বহু ব্যয়ে আমরা ঐ স্কুল রক্ষা করিয়াছি। তদানীন্তন ডি. পি. আই. কানিংহাম ইহা জানিতে

পারিয়া স্কুলের ঘাটতি মিটাইবার জন্য **সরকারী** সাহায্য দিতে চান। আমি প্রত্যাখ্যান করি। কংগ্রেস ইলেকশনে বহু ঘাটতি মিটাইয়াছি। সবগুলি টাকায় নিজে কোন কাজ করিলে স্থায়ী ফল হইত। সমিতির উপর এখন বিশ্বাস হারাইয়াছি। বহু ছাত্রের পড়ার অর্থ দিয়াছি। ইস্কুলে শিক্ষা হয় নাই, কুশিক্ষা হইয়াছে। মাত্র তিন চারটি ছাত্র মানুষ হইয়াছে।

স্যার বি. এন. রাও মিষ্ট ও মৃদুভাষী। ভাষা খুব প্রাঞ্জল, analytical brain. শ্রীহট্টে যখন জজ ছিলেন আমি একবার Assessor ছিলাম। আসামী পাগল কিনা ইহা স্থির করিবার জন্য তিনি আইনমতে 'sanity' কি, তাহা সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, মনে আছে। তৎপর, যখন তিনি আসাম কাউন্সিলে সেক্রেটারী তখন বিশেষ পরিচয় হয়। Constitution ও administration লইয়া সময় সময় তাঁহার কামরায় বসিয়া আলাপ করিয়াছি। কাউন্সিলের Rules and standing orders প্রণয়নে তিনি কমিটিকে বহু সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন হইতে বোধকরি তাঁহার Constitution and practices সম্বন্ধে শিক্ষা আরম্ভ। তৎপরে হাইকোর্টে জজ, কাশ্মীরে মন্ত্রী, দিল্লীতে Reforms officer। তখন দিল্লীতে আমার বাসস্থানে একদিন Incometax সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কাগজে আমার একটি বক্তৃতার রিপোর্ট দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অনেক নূতন তথ্য তাঁহার কাছে শুনিলাম। লোক thorough। শেষ দেখা- যখন Hill Tribes committee member হইয়া এ. ভি. ঠক্কর সহ লুসাই হিল-এ যান। তখন আমেরিকান শাসনতন্ত্রের একটা ড্রাফ্‌ট তাঁহার হাতে দিয়াছিলাম। বি. এন. রাও হিন্দু কোড কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার ড্রাফ্‌ট ও রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করিয়া এসেম্বলীতে আমার মত পাঠাইয়াছিলাম। সম্পূর্ণ ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত, হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত এ রূপ, খুব ভাল ও তীক্ষ্মবুদ্ধি লোকও হিন্দু কোড প্রণয়নে অনুপযুক্ত মনে করি। ইনি শ্রীহট্টে কালাজ্বরের দুইটি ডিসপেনসারীর ব্যয়ভার কয়েক বৎসর নিজে বহন করেন।

অল্প বয়সে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের অনেক সাদা দুর্দান্ত ছিলেন কিন্তু বয়সে ও অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারেন, কৌশলে দেশ শাসন করিতে হইবে। ভদ্র ব্যবহার চাই। ফিনান্স মেম্বার (পরে আসামের লাট) **রীড সাহেব** যৌবনে দুর্দান্ত ছিলেন। বয়সে কৌশলী হয়েন। তাঁহাকে আমরা 'ফক্স' (খেঁকশিয়াল) বলিতাম। কমিশনার **ওয়াকারের** স্বভাব গরম ছিল, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কহিত, কিন্তু লোক খাঁটি। আখালিয়ার **রমেশ দাস**, কমিশনারের কেরাণী ছিল। সাহেবের দুর্ব্যবহারে হাতের রুল দিয়া সাহেবকে আক্রমণ করে। সর্বদা ইংরাজী বলিত বলিয়া আমরা 'ইংরাজী রমেশ' বলিতাম। বন্যার প্রতিকার কল্পে গঠিত 'স্মাইল'স কমিটির সহিত ভ্রমণকালে সেলুনের এক পার্শ্বে

ওয়াকারের সহিত গল্প করিতেছিলাম। আমি চুরুট বাহির করিলে তিনি তাঁহার দেশলাই অফার করেন। বলিলাম "আমার আছে।" আমার দেশলাই দেখিয়া বলিলেন "তোমারটি স্বদেশী নয় কিন্তু আমারটা স্বদেশী। খাঁটি বিলাতের।" শ্রদ্ধা হইয়াছিল, লজ্জাও পাইয়াছিলাম। আমারটা ছিল জাপানী। সেন্ট্রাল এসেম্বলীতে আমার সময় ছিলেন। শ্রীহট্ট কংগ্রেস একবার মিউনিসি-প্যালিটি অধিকার করার চেষ্টা করে। ওয়াকার খুশী হন। Imperial service এর সাদা রাজপুরুষদের অনেকেরই ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হইয়াছে, দুই চারিজন বাদে। পূর্বে ডাক্তার সাহেব রীচির কথা উল্লেখ করিয়াছি। আর একজন ছিলেন কমিশনার বার্ণস্। অস্থায়ী ফিনান্স মেম্বার থাকা কালে কাউন্সিলের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন বলিয়া স্থায়ী হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট গোহাটিতে অভিযোগ করেন। লোকটি ক্ষমতাদৃপ্ত ও দাম্ভিক। তাঁহার পূর্ববর্তী রীড বলতেন "We shall try to carry the Council with us." (স্বরাজ্য দলকে যথাসম্ভব তোষণ করিতে হইবে) এঁর নীতি ঠিক বিপরীত। একদিন এক কমিটিতে আমার নাম প্রস্তাব করা হইলে সভায় আপত্তি করেন। ভোটে হারিয়া যান। ইহা অত্যন্ত অভদ্রতা। কোনও আইনসভায় এইরূপ ব্যক্তিগত আপত্তির কথা শুনা যায় নাই। কথা-বার্তায়, চালচলনে, রাজপুরুষদিগকে কর্তা স্বীকার করিতাম না এই জন্য আমার প্রতি আক্রোশ!

কাজ না থাকিলে উপযাচক হইয়া কাহারও সহিত দেখা করি না। করাচী কংগ্রেস অধিবেশনের এক ঘন্টা পূর্বে সেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করেন, গান্ধীজির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে কি না। হয় নাই শুনিয়া বলিলেন "চলুন, এখনই দেখা করাইয়া দিব।" ইতিপূর্বে গান্ধীকে দুইবার দেখিয়াছি ১৯২৮ ইংরাজীতে কলিকাতা কংগ্রেসে। বি.পি.সি.সি.-র কারসাজীতে জিলা সভাপতি, এম. এল সি. হইয়াও স্থান পাইলাম প্রাইমারী ডেলিগেটের সঙ্গে প্যাণ্ডেলের অপর প্রান্তে। আমি চাটাই-এর উপর শুইয়াছিলাম। সুদূর মঞ্চে একটি লোক বসিয়া কথা বলিতেছে--উচ্চারণ মিষ্ট নয়--তন্দ্রার ঘোরে যেন মনে হইল, বড়বাজারের কোনো মারওয়াড়ী তাহার কাপড়ের গুণাগুণ ও মূল্যের আলোচনা করিতেছে! গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র প্রবন্ধের সহজ ভাষা ও সহজ যুক্তি ভাল লাগিত। করাচীতে প্যাণ্ডেলে গান্ধী যেন এক সাধু—মুটেমজুর বেষ্টিত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেছেন। আর ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া বিদায়ী সভাপতি জহরলাল এবং নূতন সভাপতি প্যাটেল। কন্যাসমা সরোজিনী নাইডু এদিক ওদিক করিতেছেন। ইতোপূর্বে সরোজিনী শ্রীহট্টে সুনামগঞ্জে রাজনৈতিক কনফারেন্সের সভানেত্রী হইয়া গিয়াছিলেন। আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভা-পতি কিন্তু তখনও কংগ্রেসে যোগ দেই নাই। খদ্দরধারী ছিলাম না দেখিয়া

কিন্তু শেষ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "I have not come here to preside over a public meeting" আমি দু এক শব্দে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম "Do not want the public?" চিত্তরঞ্জনের কথা "Oh! Swaraj for Swaraj party only?"

এখনও কংগ্রেসের এই সঙ্কীর্ণভাব রহিয়াছে।

কাজ শেষ করিয়া গান্ধীজী উঠা মাত্রই সিলেটে আইন-অমান্য আন্দোলনের বিবরণ সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তকহস্তে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাতে দিলাম এবং বলিলাম "শ্রীমতী নাইডু আমাদের জানেন।" প্রগল্‌ভা শ্রীমতী নাইডু বলিলেন "অনেক পূর্বেই তোমাদের সার্টিফিকেট দিয়া রাখিয়াছি।"

গান্ধীজী "অবসর সময়ে পড়ব"—বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "ধীরেনবাবু কেমন আছেন?" বলিলাম "এখন অনেকটা ভাল। এইখানে আসিয়াছেন।"

বলিলেন "আমার সহিত দেখা করতে বলবে।" বলিয়া তিনি সভার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেলেন। **ধীরেন দাসগুপ্ত** ওরফে ধীরেনদা "বিদ্যাশ্রম" (খাদি) পরিচালক। আইন-অমান্য আন্দোলনে মাথায় লাঠির আঘাতে মরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দেখিলাম, গান্ধীজী বিশ্বস্ত অনুচরদের সব খবর রাখেন। আমরা যখন অপেক্ষা করিতেছিলাম তখন প্যাটেল ও জহরলাল নীরবে গৃহের কোণে আধঘন্টা দণ্ডায়মান ছিলেন। কোনো প্রজা কোনো দিন আমার সম্মুখে এত দীনতা প্রকাশ করে নাই! ডিসিপ্লিন না গুরুভক্তি না অটোক্রেসী ঠিক বুঝিলাম না। এখনও বুঝি নাই, তবে মনে দাগ কাটিয়াছিল।

সেই সময়ে এক খাটিয়ায় বসিয়া নেলী সেনগুপ্ত ও সরোজিনী নাইডু মিহি খদ্দরের সাড়ীর আলোচনা করিতেছিলেন। জহরলাল জিজ্ঞাসা করেন "What are the ladies talking about?"

সেনগুপ্ত বলিলেন "What else could they talk about but dress?"

আমি বলিলাম "Why, children and cookery?" তখন সরোজিনী "What" বলিয়া ধমক দিয়াছিলেন।

গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনে ১৯২০ ইংরাজীতে সিলেট যান। ইদগার সভায় ত্রিশ হাজার লোক আসে। গান্ধী ও তাঁর সঙ্গী মহম্মদ আলী বলিয়াছিলেন ভারতের মধ্যে এই ইদগাই সবচেয়ে সুন্দর। নিচু পাহাড়শ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত খোলা মাঠে একটি জলাশয়। তাহার পাশে নিচু টিলার উপর ইদগা, বিস্তৃত সোপানশ্রেণী—সত্যই সুন্দর।

আমি তখন পাইলগাঁয়। শুনিয়াছি রেলগাড়ির সময় জিজ্ঞাসা করায় একজন বলেন 'পাঁচটা' আর একজন বলেন 'পাঁচটা দশ'। ইহাতে গান্ধী ভীষণ রাগ করিয়াছিলেন—'ঠিক সময় জান না! কংগ্রেসের কি কাজ করতে পারবে!'

অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীই কিন্তু কাছাছাড়া, বিষয়কর্মের অনুপযুক্ত। তজ্জনাই গঠনমূলক কাজের রব উঠে, কাজ কিছুই হয় না।

সুনামগঞ্জ কনফারেন্সে শ্রীমতী নাইডুর শেষ বক্তৃতা কবিত্বপূর্ণ ছিল। শ্রাবণ মাস ; নদী কূলে কূলে প্লাবিত। নদীর উপরই প্যাণ্ডেল, সহরের প্রান্তে। বজরায় করিয়া তাঁহাকে নিয়া প্যাণ্ডেলে অবতরণ করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্বে সূর্য অস্ত যায় যায় --সম্মুখে নদী, অপর পারে দশ মাইল দূরে পর্বত শ্রেণী। তিনি ঐ দৃশ্য ভুলেন নাই। যখন আমরা জহরলাল ও কমলা নেহরু প্রভৃতিকে সিলেট পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি তখন তাঁহাদের নিকট সরোজিনী ঐ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়াছিলেন। কমলা নেহরুকে বলিয়াছিলেন 'সিলেট গেলে কমলা খাবে।' করাচীতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া দশ মিনিট কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন।

সি. এফ. এণ্ডরুজ ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি হইয়া ১৯২৬-এ শ্রীহট্ট যান। তখন তাঁহাকে দেখিয়াছি। ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিতেন। অতি শান্ত প্রকৃতির লোক।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের মত প্রশান্ত সংযমী দেখা যায় না। তাঁহাতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা কখনও দেখি নাই। অথচ তাঁহার লিখা, কথাবার্তা, তেজীয়ান। সত্যিকার ভগবদ্ভক্ত। শিলং-এ তাঁহার পৌত্র কঠিন টাইফয়েড রোগে কাতর। টেলি পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রশান্ত ভাবে তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিরে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া জলযোগান্তে খোল সহযোগে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন করিয়া শিলংবাসীকে অবাক করিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনতার কত বড় উপাসক ছিলেন তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা জানেন। হবিগঞ্জে (শ্রীহট্ট জিলায়) কলেরার ডাক্তারী তাঁহার প্রথম চাকুরী। পরে কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটিতে সিমসন সাহেবের অধীনে, রেঙ্গুনে Ross-এর অধীনে ম্যালেরিয়া রিসার্চ এবং শেষে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে পাবলিক হেলথ্ সার্ভিসে। আজীবন সেবা করিয়াছেন। জীবনের মধ্যভাগে ডাক্তারী প্র্যাকটিসও ছিল। চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার লিখিত ধাত্রীবিদ্যা, বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা খুড়ীমা পিসীমারা পাঠ করিতেন। তুলসীদাসের নিম্নলিখিত চৌপাঈ-

কোই কুদ্‌কে সাগর উতারা কোই কিয়া মিত
কোই উখড়া গিরিদরখত কোই সিখায়া নীত ॥
ক্যা কহুংগা সীতানাথকো ম্যয়নে ক্যায়া কিয়া চোরী
সোহি কুল উদ্ভব মেরো বেদিয়া খিঁচে ডোরী ॥

সুন্দরীবাবুরই প্রেরণায় কিছুকাল আমার জনশক্তি পত্রিকায় ছাপা হইত। ইহার ভাবার্থ, বানর বলিতেছে 'হে সীতাপতি আমার পূর্বপুরুষ কেহ সাগর লাফ দিয়া পার হইয়াছে, কেহ বা (তোমার সহিত) মিত্রতা করিয়াছে, কেহ পাহাড় উপড়াইয়া আনিয়াছে, কেহ বা নীতি শিখাইয়াছে। আমি কি চুরি করিলাম যে (এমন কুলে জন্ম সত্ত্বেও) বেদিয়া (ইংরেজ) আমার গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিতেছে?'

১৯২৮ ইংরাজীর কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতি **মতিলালকে** দ্বিতীয়বার দেখি। জি. ও. সি. সুভাষবাবু অশ্বপৃষ্ঠে হাওড়া ষ্টেশন হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইংলিশম্যান পত্রিকা ঠাট্টা করিয়াছিল—কিন্তু সত্যই একদিন সুভাষবাবু জি. ও. সি. রূপে কোহিমা অবধি আজাদ হিন্দ ফৌজ পাঠান। জহরলাল, সুভাষবাবু বামপন্থী; সলাপরামর্শ করিলেন যে কংগ্রেসে বামপন্থী প্রস্তাব পাশ করাইতে হইবে। সুভাষ এই প্রথম মিল মজদুরের প্রসেশন করিয়া কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে ঢুকার চেষ্টা করেন। অবস্থা দেখিয়া গান্ধী ও মতিলাল জহরলালকে ডাকাইয়া বলেন—

"আমরা বৃদ্ধদের পলিসী যদি তোমাদের মনঃপূত না হয় তবে তোমরাই কংগ্রেসের কর্তৃত্ব গ্রহণ কর।" জহরলাল "Not yet" বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ভীক সুভাষ একা প্রস্তাব পেশ করিয়া নাজেহাল হন। জহরলাল এই কংগ্রেসে কোনও অংশগ্রহণ করিলেন না—চুপ করিয়া ডায়াসের নীচে বসিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর স্বভাব ও কৃষ্টি, সর্বভারত হইতে কতকটা পৃথক। বাঙ্গালীর সহিত কাহারও বনিবনা হইবে না। বাঙ্গালী, হয় রাজত্ব করিবে, নয় অপরের অধীনে থাকিবে। এখন পরাধীন। রাজত্ব হিন্দুস্থানীদের, কারণ উপযুক্ত নেতা হিন্দুস্থানী। যখন আবার চিত্তরঞ্জনের মত লোক বাঙলায় হইবে বাঙ্গালী আবার রাজা হইবে। ১৯৩৬-এ সত্যমূর্তি৪ প্রথম দর্শনে আমাকে বলেন "Where was Bengal when C. R. Das lived, where are you now."

চিত্তরঞ্জন গান্ধীর অনুগত ছিলেন না, টক্কর দিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের শ্মশানে বসিয়া গান্ধী লিবার্টি পত্রিকার জন্য লিখিয়াছিলেন "Who am I to talk of him? He was an intellectual giant, before whom I am a dwarf."

ডিমোক্রেসীর আচ্ছাদন বাহ্যিক। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজত্ব অটোক্রেটদের। নেতৃত্বই বড় কথা। একা আলী ইমাম বিহারকে প্রদেশে পরিণত করিয়া (এখন রাজ্য) উন্নত করিয়াছেন। লর্ড কার্জন বঙ্গবিচ্ছেদ না করিলে আজ বারানসী হইতে নদীয়া, দার্জিলিং হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত, এক ভাষা, এক দেশ এক সভ্যতা

হইত। ১৯১১ সনে উভয় বঙ্গের পুনর্মিলন ও প্রদেশ পুনর্বিন্যাস আরও সর্বনাশ করিল। রাজধানী গেল দিল্লীতে, বিহার-উড়িষ্যা আলাদা হইয়া গেল। বাঙালী রব তুলিল যে, বাংলাভাষীদের একত্র রাখিবার প্রয়াসের বিরুদ্ধাচরণ ইংরাজের কুমতলবপ্রসূত কারসাজী; কিন্তু ভুলিয়া গেল যে, ভবিষ্যতের জন্য পতিত জমি চাই। লীগ আসামের জঙ্গলের জন্য প্রাণপণ লড়িয়াছে। বাঙালী 'হা মাটি' 'হা ভাত' বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাটির জন্যই হিটলার ও জাপান লড়িয়াছিল। ইংরাজ, মুসলমানের বিষয়বুদ্ধি টনটনে, বাঙালী ভাবুক। ইংরাজ জানিত মুসলমান একদিন পৃথক হইবেই, অমুসলমানের অধীনে কখনও থাকিবে না। রাজধানীতে বাঙ্গালী বিদেশী। পাঁচ বৎসর (১৯৩৭-৪১) দিল্লীতে থাকিয়া বেশ লক্ষ্য করিয়াছি সকলেই মছলীখোর বাঙালীকে হিংসা করে। "Bengalees think too much of themselves."—বাঙালীই প্রথম ইংরাজকে এদেশে ডাকিয়া আনে। তাহারা ইংরাজের ফেউ হইয়া সারা উত্তর ভারতে ছড়ি ঘুরাইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহে নিজাম এবং Bengal Regiment-ই ইংরাজরাজ্য রক্ষা করে ইত্যাদি কানাঘুষা কংগ্রেসী মহলেই শুনা যাইত। বিপিন পালের সহিত শেষ দেখা ১৯৩৭ সালে দিল্লীর পথে কলিকাতায়। আমি গান্ধীর অহিংসবাদী দলে আলেয়ার পিছনে যাওয়ায় খুব বকিলেন। Pan-Islamism-এর ভয় তাঁহারা বরাবরই ছিল। বলিলেন "গান্ধীনীতিতে ভারতের সর্বনাশ হইবে। গান্ধী আন্দোলনে একটাও গান হয়েছে যে হৃদয় স্পর্শ করবে?"

সারা উত্তর ভারত আর বর্মা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। উত্তর ভারতের সব প্রদেশের নেতাদের শিক্ষক ছিলেন বাঙ্গালী। "Past services are soon forgotten". এই সেবাই, হীনমন্যতায় বিদ্বেষের ইন্ধন জোগায়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে ভুলাভাই-এর পরামর্শে পরিচালিত Gandhian কূটনীতি, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ত্রিপুরী ফেরৎ (এসেম্বলী লবীতে) বাঙ্গালী সভ্যদের মধ্যে খুব আলোচনা হইতেছিল। ভুলাভাই সূর্য সোমকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "Shome, dont waste your energy. Take two pegs at night".

পরে বলিলেন "Brojendra Babu is adding fuel to the fire".

আমি কংগ্রেসের বিরোধে কোনোকালেই কিন্তু ভালমন্দ কোনো আলোচনা করিতাম না। দুইটি ভিন্ন, কোনো কংগ্রেস অধিবেশন দেখি নাই। জিলার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। জেলা কমিটিতে পাঁচ বৎসর সভাপতি ছিলাম। এ. আই. সি.-র সহিত জীবনে কোনও সম্পর্ক নাই। এতেই বাঙ্গালীকে কি চক্ষে রা দেখেন বুঝা যায়। কেবল সত্যমূর্তি, বিশাখাপত্তনের গুপ্তা প্রভৃতি চজন মাদ্রাজী সভ্য, বিপিন পালের এবং সি. আর. দাসের ভক্ত ছিলেন।

বলিতেন Benighted province মাদ্রাজকে বিপিনবাবু, বিবেকানন্দই জাগাইয়াছেন।

সুর্যসোম দিলখোলা রসিক লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের ঠাকুর-দাদা। একা, মটর ভেহিক্‌লস্‌ এ্যাক্টের বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত করিয়াছিলেন। সরকারী সদস্য তাঁহার আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। এই আলোচনায় তিনি এত উন্মত্ত হইয়া যান যে রাজাগোপালাচারী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মৈমনসিংহের ভাষায় "রাজাগোপাইল্যা' বলিতে থাকেন।

গোঁড়া কংগ্রেসী ছিলাম না। সমাজের স্বার্থবোধে সময় সময় স্থানীয় হিন্দুসভার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতাম। সর্বদাই বলিতাম "আপনারা কংগ্রেসে যোগ দিয়া গান্ধীর দলের মুসলমান পক্ষপাতিত্বের প্রতিরোধ করুন।" আসল কথা, ইঁহারা সবকারের কংগ্রেস নির্যাতন নীতিকে বড় ভয় করিতেন। সিলেটে হিন্দুসভার কনফারেন্সের প্রাক্কালে আমার পত্রিকা সাপ্তাহিক জনশক্তিতে লিখিয়াছিলাম "হিন্দুর কাম ও তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা মুসলমান অপেক্ষা কম নয়। পার্থক্য এই, মুসলমান তজ্জন্য জোর করে, প্রকাশ্যে নারী ফুসলায়, হিন্দু লুকাইয়া পাপাচরণ করে।" ইহাতে হিন্দুসভাপন্থী বন্ধুগণ বড় চটেন। কনফারেন্সে শ্যামাপ্রসাদ, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ব্যানার্জি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আমার বাড়ীতে ইঁহাদের সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ আলোচনা হয়। হিন্দুর সমাজব্যবস্থা বিষয়ে নির্মলবাবুর সহিত আলাপে বলিলেন "আপনার দেখিতেছি মনুশাস্ত্র বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। কলিকাতায় গিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দিন।" বলিলেন, তিনি হিন্দু ল' অব এভিডেন্স বিষয়ে ঠাকুর ল লেকচার দিয়াছিলেন। সমগ্র মনুসংহিতা অনুধাবন করিয়াছেন মনে হইল না।

হিন্দু কোড-এর প্রথম ড্রাফ্‌ট বাহির হইলে ইহার বিরুদ্ধে নোট লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাই। হিন্দুসভার কমিটিতে তাহা উপস্থিত করা হইবে—এই উত্তর পাইয়াছিলাম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সহিত মদনমোহন কলেজ-এর অনুমোদন উপলক্ষে সিলেটে দেখা হয়। আসাম ইউনিভার্সিটি বিষয়ে আলোচনার জন্য শিলং গিয়াছিলাম। একই ইউনিভার্সিটিতে আসামী ও বাঙ্গালী দুইটি ডিভিসন থাকিতে পারে, যেমন চেক-জার্মান (প্রাহা) ইউনিভার্সিটি আমি এ কথা বলিলে তিনি উহার সত্যতা অস্বীকার করেন যদিও মডার্ণ রিভিউতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ কয়েক বৎসর পূর্বে বাহির হইয়াছিল।

হিন্দুসমাজের মজ্জাগত নীতি, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে স্তরভেদ। ব্রাহ্মণ বর্ণের (জাতি নহে) চরিত্র উৎকৃষ্ট। বৈশ্যবর্ণ বিত্তশালী থাকিবেই। তখনও গান্ধীর আধ্যাত্মিক একাকার এবং জহরলালের আর্থিক একাকার দানা বাঁধে নাই। কংগ্রেস তখন ভয়ে ভয়ে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে একাসনে বসা

(আহার নয়) প্রচার করিতেছিলেন। ১৯৩৫-এর পরে কংগ্রেস প্রকাশ্যে সোস্যালিজম ও জাতিভেদ এমন কি সম্প্রদায়-বিভেদ উৎপাটনের প্রচার করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী-গণও! জিজ্ঞাসা করি সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীর সমাজব্যবস্থা চর্চার অধিকার কি?

সেন্ট্রাল এসেম্বলীতে সহসদস্য ছিলেন **ভাই পরমানন্দ**। বিপ্লবী; আন্দামানে বহু বৎসর কাটাইয়া পরে হিন্দুসভার সভাপতি হন, লাজপত রায়ের পরে। তিনি অবিবাহিত। জমিদারীর বাৎসরিক আয় (সাকুল্যে বিশ-পঁচিশ হাজার) হিন্দুসভায় দান করিয়া দিল্লীতে হিন্দুসভার আপিসঘরে বাস করিতেন। বক্তৃতা দিতে গিয়া ভাবাধিক্যে বৃদ্ধের স্বর রুদ্ধ হইত। সরল লোক, পার্লামেন্টারিয়ান নহেন, মনে দাগ কাটিতে পারিতেন না। তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। কিন্তু 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। "Those days are past."

শ্রীপ্রকাশের বাবা **ডাঃ ভগবান দাস** বোধহয় বাঁচিয়া আছেন। বয়স এখন ৯৩-এর উপর। পণ্ডিত লোক। এসেম্বলী লবীর কোণে পাঠে রত থাকিতেন। একবার ভুলাভাই-এর অনুরোধে ডিফেন্স পলিসি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। চমৎকার লিখিত প্রবন্ধ কিন্তু প্রেসিডেন্ট আবদার রহিম, "অপ্রাসঙ্গিক" বলিয়া দুই-তিনবার আপত্তি করিয়া দশ-মিনিট পর বসাইয়া দেন। পণ্ডিতকে নিরর্থক অপমান করিবার প্রয়োজন ছিল না।

গান্ধী, ভারতের শাসনতন্ত্রে গ্রাম্য পঞ্চায়েতে প্রাথমিক নির্বাচন হইতে পরে সেকেণ্ডারী ইলেকশনের যে প্রস্তাব করেন তাহা ডাঃ ভগবান দাস উদ্ভাবন করেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার সহকারী ছিলেন। ভগবান দাস, ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীলের মত পণ্ডিত লোক।

শ্বশুরবাড়ীতে **রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু** (সরকারী কেমিক্যাল এ্যানালিস্ট) **কৃষ্ণলাল দত্ত**, **ভূপেন্দ্র বসু**, **শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে** দেখি। ইঁহারা শ্বশুর মহাশয়ের বন্ধু। চুনীবাবুর "খাদ্য" নামে একখানা বহি আছে। প্রত্যহ তিনি ৬টার সময় প্রাতর্ভ্রমণে আত্মীয়স্বজনের খবর নিতেন। **কৃষ্ণলাল দত্ত** সেক্রেটারিয়েটে ৬০ টাকার কেরাণী হইতে অডিট বিভাগে দ্বিতীয় পদ প্রাপ্ত হন। মূল্য অনুসন্ধান কমিটির (১৯১২) চেয়ারম্যান ছিলেন। কমিটি সিদ্ধান্ত করেন বিগত ত্রিশ বৎসরে মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে কিন্তু মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হইয়া পারিবারিক বাজেট চতুর্গুণ হইয়াছে। ইনি পরে বিলাতে সরকারী চাকুরী করেন। তীক্ষ্নবুদ্ধি তেজস্বী লোক। স্বদেশী বন্ধুদের বিদ্রূপ করিতেন। **ভূপেন্দ্র বসু** কংগ্রেসের এটর্নী, সুরেন্দ্রনাথের

দক্ষিণ হস্ত। সেন্ট্রাল এসেম্বলীতে সদস্য ছিলেন। এই তিনজন তখন উত্তর কলিকাতার নেতা।

শ্যামসুন্দরের বক্তৃতা, লেখায় (সার্ভেন্ট ও বন্দেমাতরম্) ভাবাবেগ ছিল, যাহা স্বদেশী ও বিপ্লবের ইন্ধন যোগাইত। তিনি অতি দরিদ্র। বিপিনবাবুদের সঙ্গে বর্মার Act III of 1818 অন্তরীণ হন। পরে নিজে 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'বন্দেমাতরম্' ইংরাজী সংস্করণে প্রবন্ধ লিখেন 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।"

কংগ্রেসে, অমৃতবাজারের মালিক-সম্পাদক **মতিলাল ঘোষ** ছিলেন সুরেন্দ্রবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইনি একটু চরমপন্থী : তিলকদলঘেঁষা ছিলেন কিন্তু রাজদর্শনে অতি ভক্তপ্রজা বলিয়া প্রমাণ দিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে বাগবাজার ঘাটে জেটীতে নিত্য সন্ধ্যায় পায়চারী করিতে দেখিতাম। ফর্সা, পক্ককেশ, গোল চেহারা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তেজব্যঞ্জক, অনেকটা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত। পত্রিকা অফিসে খাটিয়ায় বসিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। স্টেশনমাস্টার কর্তৃক D. T. S.-কে টেলিগ্রাম "A tiger on the platform. Wire instructions" প্রভৃতি গল্পের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। পুলিশের বড় কর্তারা অধীনস্থদের অমৃতবাজার পত্রিকার পুলিশ কোর্ট রিপোর্ট পাঠ করিতে বলিতেন। 'অমৃতবাজার', বাগবাজারের প্রাচীনপন্থী বৈষ্ণবদের মুখপাত্র ছিল। বঙ্গবাসীর মত কংগ্রেসকে বিদ্রূপ করিত না।

প্রোফেসর মর্তুজা, পশ্চিমা মুসলমান (বোধহয় পারসীক) ব্যায়ামবিদ। তাঁহাকে ১৯০৩ ইংরাজীতে শ্রীহট্ট সম্মিলনীতে তলোয়ার খেলা ইত্যাদি দেখাইতে দেখি। চেহারা, শরীরের গঠন অতি সুন্দর। বলবান অথচ পেশী স্থিরাবস্থায় মাখনের মত নরম। **স্যাণ্ডো** কিছুটা রুক্ষ চেহারা এবং রুক্ষ শরীরগঠন। কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে স্যাণ্ডোর কসরৎ দেখি।

টহলরাম গঙ্গারাম গোলদীঘিতে স্বদেশী বক্তৃতা দিত। লোকটি খ্যাপা। কেবল লাট কার্জনকে গালি দিত "He has a nose like this, he has an ear like this" ইত্যাদি, লোকে হাসিত।

ব্যায়াম শিক্ষক সি. আর. নাইডুকে সিলেটে দেখি। হিন্দুমতে প্রাণায়াম শিক্ষা দিতেন। ছাত্রদের "আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি", "আচ্ছা করে তালপুকুরে মারব গিয়ে ডুব সাঁতার"—

এইসব ছড়ার সহিত খালি হাতে ব্যায়াম শিখাইতেন।

প্রোফেসর জেম্স প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনের অধ্যাপক, পরে প্রিন্সিপাল। কয়েক মাস আমাদের পড়াইয়াছিলেন। পার্সিভ্যাল সাহেবের ন্যায় উঁচু টেবিলে দাঁড়াইয়া পড়াইতেন। তাঁহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দরুণ চীফ

সেক্রেটারীর সহিত উদ্ধত ব্যবহার করায় চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এ বিষয়ে বিলাতেও আন্দোলন হয়।

ডাঃ শরৎ মল্লিক লণ্ডন হইতে হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ হইয়া আসেন। ছেলেরা স্টেশন হইতে তাঁহার গাড়ী নিজেরা টানিয়া আনিয়াছিল। ভিজিট প্রথমে বত্রিশ পরে ষোল, পরে আট টাকা করিয়াও ব্যবসা জমাইতে পারেন নাই। একদিন আমার মুখে ইহা শুনিয়া ডাঃ আর. এল. দত্ত বলেন "গরীব দেশে কি বত্রিশ টাকা ভিজিট চলে?"

এখন বড় বড় ডাক্তারের ভিজিট দেওয়া কি করিয়া চলে? সর্বোচ্চ বোধহয় ১৩০ টাকা পর্যন্ত। দেশটা নিশ্চয় ধনী হইতেছে? কর্তারা কি বলেন? ইনি লালমোহন ঘোষের মেয়েকে বিবাহ করেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ঢাকানিবাসী বিচক্ষণ আই. সি. এস.। চাক্ষুষ দেখি নাই। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মরা ইঁহার গৌরব করিতেন। ফুলারী আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ভাষা নির্ধারণ কমিটিতে ইনি প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিবার পক্ষে মত দেন। এর প্রতিবাদে জেনারেল এসেম্বলী কলেজ হলের সভায় রবিবাবু এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'মাতৃভাষা হত্যাকারী' গুপ্ত মহাশয়কে সিজারের হত্যাকারী তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্রুটাসের সহিত তুলনা দিয়া (Et tu Brute-এর অনুকরণে) বলিয়াছিলেন "বঙ্গজননী তারস্বরে চীৎকার করিয়াছিলেন 'গুপ্তমহাশয়, তুমিও'?" পাঠকালে রবিবাবুর চোখমুখের ভঙ্গী (এ্যাকটিং) অনুপম হইয়াছিল। থিয়েটার রোডে কৃষ্ণগোবিন্দবাবুর বৃহৎ বাড়ী বহুকাল পূর্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষকে হাইকোর্টে দেখি। সভাসমিতিতে দেখি নাই। তবে জানিতাম রাজনৈতিক, সামাজিক সব বিষয়ে মুরুব্বি ছিলেন। বিক্রমপুরের লোক ইঁহার খুব গৌরব করিত। তাঁহার পুত্র উকীল যোগেন ঘোষের সমিতি, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেন। সিলেটের নগেন্দ্র চৌধুরীর ভ্রাতা উপেন্দ্র চৌধুরী এই বৃত্তির সাহায্যে জার্মানীতে খনিজ বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি জজ আশু চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। চন্দ্রমাধবের দৌহিত্র অশোক রায় এডভোকেট জেনারেল এবং ল' মেম্বার ছিলেন। ইনি, যোগেন ঘোষের ছেলে স্মৃতীশ ঘোষ, ইঁহারা আমার সহপাঠী।

রমণী ভট্টাচার্য সিলেট স্কুলে সহপাঠী। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আসামে তিনি তৃতীয়, আমি চতুর্থ স্থান অধিকার করি। ক্লাশেও সর্বদা তিনি তৃতীয়, আমি চতুর্থ ছিলাম। স্কুলজীবনেই সময় সময় moody থাকিতেন। বি. এ. পাশ করিয়া সিলেট সরকারী স্কুলে শিক্ষক হন। তখন আমি পাইলগাঁয়ের বাড়ীতে। কলিকাতায় একবার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহার সহিত অক্টোরলনী মনুমেন্টে উঠিয়াছিলাম। তাঁহার স্ত্রীর এবং একটি শিশুপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের

উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া স্ত্রীর অনুমতি নিয়া নাকি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। কাশীর রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন (১৯৫৪-৫৫) নাকি দেরাদুনে। স্কুলে আমরা ছিলাম অন্তরঙ্গ অথচ তাঁহার কিম্বা তাঁহার পরিবারের খোঁজখবর নিবার অবসরই হয় নাই। মনে করি নিব। পরমুহূর্তে ভুলিয়া যাই।

পাদটীকা

১. ৭নং সনেট, "Poetical works of John Milton (Oxford University Press)
২. তখন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের প্রাইম মিনিস্টার বলা হত।
৩. গ্রীক পুরাণের এক বিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি।
৪. লেখকের সমকালীন কেন্দ্রীয় পরিষদের দলনেতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী

মালব্যজীর কথা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিতেছি। আচারে নিষ্ঠাবান, চিত্তে দৃঢ়, ব্যবহারে কোমল ; রাজনীতির বাক্‌যুদ্ধে কেহ তাঁহাকে রূঢ় কথা বলিতে শুনেন নাই। প্রথমাবধিই কংগ্রেসে যোগ দেন। তখন কলিকাতায় তাঁহাকে দেখিয়াছি। দীর্ঘ পাতলা চেহারা, কপালে তিলক, পোষাক বংশানুক্রমিক উষ্ণীষ, চাপকান, গলায় চাদর।

প্রয়াগে মতিলাল নেহরুর বাড়ীতে নাকি মদনমোহন, তেজবাহাদুর সপ্রু ও মতিলাল এই তিন উকীল বন্ধুর গল্পগুজবে উত্তর প্রদেশের রাজনীতির অঙ্কুর রোপিত হয়। ইহারই মহীরুহ জহরলাল ও কিষাণ আন্দোলন। মতিলাল, সপ্রু কিন্তু গান্ধীযুগের পূর্বে কংগ্রেসে ছিলেন বলিয়া জানিনা। সুরাট কংগ্রেসে ভাঙ্গনের পরও মালব্য কংগ্রেসের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। মদনমোহন আবার সপ্রুর লিবারেল ফেডারেশনের সহিত খুব মাখামাখি করেন নাই। তিনি স্বভাবে মৃদু, খুব উগ্রপন্থা তাঁহার ধাতু ছিল না। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি "বে-আইনী" আইন একবার অমান্য করিয়াছিলেন। বহু-কাল তিনি সেন্ট্রাল এসেম্বলির সভ্য ছিলেন। একবার সময় কাটাইবার জন্য তিনি সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা দেন। এত দীর্ঘ বক্তৃতা আর হয় নাই। তখন প্রধান বক্তা ছিলেন—শর্মা, শাস্ত্রী ও সপ্রু। সাংবাদিকগণ রহস্য করিত, "Three asses. ('S')"। মালব্যজীর চেষ্টায় ১৯৩১ সালে গান্ধী ও বড়লাট আরউইন-এর সাক্ষাৎ ঘটে। যাহার ফল, গান্ধী আরউইন প্যাক্ট। সমাজ-সংস্কারেও তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ সঙ্গমে সহস্র সহস্র অস্পৃশ্যদের নিজে শৈবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। হিন্দুর মূলনীতি উদার, কিন্তু অধিকারীভেদ আছে। অনধিকারীকে তাহার শক্তির অতিরিক্ত কাজ দেওয়া উদার মনের কাজ নয় কারণ ইহাতে তাহাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হয়। এমন কি "অচলায়তনের" রবিবাবুর শেষ বয়সে যখন আমেরিকান মিশনারী বোলপুরে সাঁওতালদের জন্য খৃষ্টীয় মিশন খোলা সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ চান, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এদের মন প্রাচীন যুগের। এদের প্রাচীন পূজাপদ্ধতিতে বোধহয় ভাল হয়, কিছু উপকার হয়। খৃষ্টীয় ধর্মের উপদেশে ইহারা বিভ্রান্ত হইবে, উপকার হইবে না।" অধিকারী ভেদ উদার মনের পরিচয়। অনধিকারীকে শত্রু মনে করিয়া শাস্ত্র করা হয় নাই, বন্ধু জানিয়াই করা হইয়াছে। বর্তমানযুগের সমাজসংস্কারকদের আত্মম্ভরিতা আছে—dictatorial.

গান্ধী কর্তৃক Man of Christ আখ্যাত 'মাটির মানুষ' এণ্ডরুজ সাহেব লিখিয়াছেন যে, একবার প্রয়াগে রেল স্টেশনে অল্পক্ষণের জন্য মালব্যের সহিত সাক্ষাৎকালে মালব্যজী তাঁহাকে রেস্তোঁরাতে হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস কাছে বসিয়া থাকিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। সনাতনপন্থীর এই ব্যবহার তাঁহার কাছে আশ্চর্য ঠেকিয়াছিল। এণ্ডরুজ সাহেব আমাদের এত দেখিয়াও বুঝিতে পারেন নাই যে প্রাচীন পন্থানুযায়ী, অতিথিকে তাহার প্রিয় আহার দিতে হয় এবং দেবতাজ্ঞানে সেবা করিতে হয়। ইহা হিন্দুর উদারতা (Liberalism), ইহা Heterodoxy নহে কারণ সাহেব হয়ত জানেনই না যে মালব্যজী গৃহে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া নিষিদ্ধ দ্রব্য সান্নিধ্যজনিত অপবিত্রতা জপ দ্বারা শোধন করিয়াছিলেন। বন্ধুহীন চণ্ডালের শবও ব্রাহ্মণকে দাহ করিতে হইবে যদিও পরে প্রায়শ্চিত্তও আছে। এই ব্যবস্থায় দোষ কোথায় তাহা এতদিনের চিন্তায় এই ৭২ বৎসর বয়সেও নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অথচ চতুর্দিকে শাস্ত্রের নিন্দা শুনি। বর্তমান ব্যবহার যদি দুষ্ট হয়, দোষ আধুনিক সমাজের। শাস্ত্রের দোষ কি করিয়া হয়?

শিশুকালে বিমলাদিদি, পদ্মাদিদির কোলে মানুষ হইয়াছি। ৬০ বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মণ বালকরা ঠাকুরমার হাতে ভাত খাইয়াছে। পৈতার আগের দিন আমার ঠাকুরমা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শেষ খাওয়াইয়াছেন। পৈতার পর আর তো খাইবে না! 'জন্মনা জায়তে শূদ্র, সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।' সংস্কার অস্পৃশ্যতার মূলে, বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা নহে। মনুর বিধানে১ শূদ্রের পাক অন্ন দ্বিজজাতি গ্রহণ করিতে পারে। পরবর্তী কালে ইহার ক্রমশঃ সংকোচ হইয়াছে সমাজ বিবর্তনের ফলে।

মালব্যজীর প্রধান কীর্তি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। একা তিনি ইহার উদ্যোগী, অর্থ সংগ্রাহক ও পরিচালক ছিলেন। হিন্দু রাজা মহারাজা ও ধনীরা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু "Prince of beggars" মালব্যজী ভিন্ন অপরে কোটি কোটি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত না। রাজা মহারাজাদের বর্তমান দুর্দিনে এই একটি সান্ত্বনা রহিল—তাঁহাদের কীর্তি—হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়। কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি সত্ত্বেও আচারের দিকে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় সাফল্য লাভ করে নাই। আমার এক ছেলে সেখানকার B.Sc., তাহার কাছে ইহা শুনিয়াছি। হিন্দুর স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বেদজ্ঞানী অপেক্ষা বেদাচারী উৎকৃষ্ট।

আমার ছেলেটি ভর্তি হইবার সময় প্রিন্সিপাল বলেন "অনেক বাঙালী ছেলে নেওয়া হইয়াছে, আর বাঙালী ছেলে নেওয়া হইবে না। দেখ, যদি মালব্যজীর কাছে গিয়া কিছু করিতে পার।" সে দৌড়াইল মুসুরীতে পণ্ডিত-জীর কাছে। বহু দর্শকের ভীড়ের দরুণ তাহার ডাক পড়িল বহুক্ষণ পর।

পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাঙালী, না অসমীয়া?" সে উত্তর দিল, "আমি আসামবাসী বাঙালী (সিলেটের)।" তিনি ভর্তির অনুমতি দিয়া বলিলেন, "ছেলেটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছে, বোধহয় কিছু খায় নাই, ইহাকে খাওয়াইয়া দেও।" তখন মালব্যজী অতি বৃদ্ধ ও দুর্বল।

রাজা মহারাজাদের বৃটিশ শাসিত ভারতের সহিত যুক্ত করিয়া মহাভারত গঠনের উদ্দেশ্যে, অশুভ মুহূর্তে মালব্য, রাউণ্ড টেবিলে ফেডারেশন-এর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে যদি রাজন্যরা যোগ দিতেন তবে আজ তাঁহারা নিঃশেষিত হইতেন না। ভারতের ভাগ্য অন্য রূপ ধারণ করিত।

প্রাচীনপন্থী মালব্য ও প্রগতিপন্থী সপ্রু এবং প্রগতিপন্থী ও বিলাসী মতিলালের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এক আশ্চর্য বিষয়। উদার মন ভিন্ন এই সংযোগ সম্ভব না। মনে পড়িতেছে বিলাতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধী বলিয়াছিলেন, "My friend Mr. Sapru thinks I am leading India to the abyss." (আমার বন্ধু সপ্রু মনে করেন আমি ভারতকে অতল গহ্বরের দিকে ঠেলিয়া দিতেছি।)

কায়কল্প

১৯৩৭ সালে কায়কল্প চিকিৎসা প্রণালী নিয়া খুব আলোচনা হয়। কায়কল্প হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এক অঙ্গ। এই চিকিৎসায় পথ্যাদি বিষয়ে কঠোর নিয়ম পালন ও অন্ধকার ঘরে বহুদিন বাস করিতে হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ৭০ বৎসর বয়সে কায়কল্প চিকিৎসা করান। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণকান্ত মালব্য এম এল এ. আমাদের বলিয়াছিলেন যে, ঐ চিকিৎসার পর পণ্ডিত মালব্যের গাল এবং গলার চামড়ার খাঁজ, আর নাই। তাঁহাকে অন্ততঃ দশ বৎসর কম বয়স্ক দেখায়।

অল্প লোকেই কায়কল্প করিয়াছেন। স্থায়ী ফলাফল সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। ডাঃ ভরনফ-এর বানর গ্রন্থি বসাইয়া মানুষের যৌনশক্তির উদ্ধার সম্বন্ধেও এর পূর্বে খুব হৈ চৈ হয়। পরে নাকি দেখা যায়, ফল বেশি দিন স্থায়ী হয় না এবং সামান্য কুফল আছে। বুলগেরিয়ার লোক নিত্য ঘোল খাইয়া সুস্থ সবল, দীর্ঘজীবী—এই তথ্য ডাক্তাররা বাহির করার পর কলিকাতায় ডাক্তাররা সব রোগেই ঘোলের ব্যবস্থা দেওয়া আরম্ভ করিলেন। তখন রাজেন্দ্র সেন—কালীতলার বিখ্যাত নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ, আমায় বলেন, "জনৈক আমাশয়ের রোগীকে ডাক্তারেরা ঘোল খাওয়াইয়া মরণের মুখে আনিয়াছেন।" আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে গরীবরা ঘোলই খাইতে পায়—দুধ পায় না। যাহাদের গাভী আছে তাহারা ঘি করিয়া বিক্রয় করে। আমাদের গ্রামের বাড়ীর অতিরিক্ত দুধ নিঃসহায়া বিধবারা নিয়া তৎপরিবর্তে ঘিয়ের অর্ধেকটা দিত। গান্ধী প্রাকৃতিক চিকিৎসার ভক্ত ছিলেন, নিজেও

মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা দিতেন। মানুষ একটা যন্ত্র—বস্তুজগত অনিত্য, ক্ষয় হইবেই - বাহিরের যাহা কিছু আমরা স্পর্শ করি অর্থাৎ আলো, হাওয়া, পানীয় ও পথ্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়াই স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র উপায়। জীবনের উদ্দেশ্য থাকিবে। জন এবারনেথি২ বলেন, "The two great killing powers in the world are stuff and fret." (গুরুভোজন ও খিট্‌খিটে স্বভাব জীবনী-শক্তি নাশ করে।) যন্ত্রের মূল শক্তি কিন্তু জন্মগত। মনুরও অনুরূপ ব্যবস্থা। মানব তার পূর্ণ আয়ু ১২৫ বৎসর বাঁচেনা কেন? উত্তর—খাদ্যাখাদ্যের অবিচার, অতি ব্যবহার ও অমিতাচার, আলস্য এবং মনের স্থৈর্যের অভাব।

খাদ্যাখাদ্য বিচার আধুনিকের ঠাট্টার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরে স্বাস্থ্য-অবনতির মূল কারণ আলো হাওয়ার অভাব—ভেজাল খাদ্য তত নহে। কলিকাতার লোক কিন্তু আইন নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর বাড়ীতে এক ইঞ্চি জায়গাও খোলা রাখিতে চায় না। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস বলিতেন যে, শরীর একটা কেল্লা। বীজাণুরা এর চতুর্দিকে দৃষ্ট, অ-দৃষ্ট, জ্ঞাত, অজ্ঞাত কত যে রহিয়াছে কে জানে। এদের পেছনে ধাওয়া না করিয়া কেল্লার দেওয়াল মজবুত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কলেরা বীজ সকলের শরীরে ক্রিয়া করে না। সুন্দরীবাবু ছিলেন সারা জীবন Health Officer.। বীজাণু নিয়াই তাঁহার কাজ ছিল।

জাতীয় শিক্ষা

১৯০৫-এ ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান নিষেধ করিয়া কার্লাইল ও লায়ন সার্কুলার বাহির হইলে এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির উদ্ভব। গোল-দীঘির পাড়ে অফিস খুলিয়া নিত্য সন্ধ্যায় সভা চলিতে লাগিল। বিপিন পাল সিনেট হলের নাম দিলেন 'গোলামখানা'। ছাত্ররা 'গোলামখানা' লেখা সাইনবোর্ড সিনেট হলে আঁটিয়া দিল। বিপিনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে "রক্তমাংস-অস্থিশূন্য" বলিয়া অভিহিত করিলেন। ইউনিভার্সিটিকে এড়াইয়া জাতীয় শিক্ষার জন্য 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' গঠিত হইল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সুবোধ মল্লিক সর্বস্ব দান করিয়া জনগণ হইতে 'রাজা' উপাধি পাইলেন। মৈমনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী অর্থদান করিলেন। ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে একমাত্র অভিযোগ "ইংরাজের গোলামী করার মনোবৃত্তির জনক।" ইউনিভার্সিটির কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমাদ গনিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি চিত্তরঞ্জনের স্কুল কলেজ বয়কট হইতে ইউনিভার্সিটিকে রক্ষা করেন। সুরেন্দ্রনাথ স্কুলবয়কট ভাল চক্ষে দেখেন নাই কারণ তাঁহার তখনও ধারণা ছিল, ইংরাজ সাম্রাজ্যে আমরা মর্যাদাজনক স্থান লাভ করিতে পারিব।

যাদবপুরের স্কুল পরে টেক্‌নিক্যাল স্কুল হইল। ইহা এখন ভারতে সর্বোত্তম সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইয়াছে। পাঠ্যতালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হুবহু নকল; পার্থক্য কোথায় বোঝা গেল না। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়ও আছে। জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রকাশ্যে ইংরেজ শাসনকে গালি দিতেন -বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রকাশ্যে ইহা করিতেন না চাকরী যাইবার ভয়ে এবং ঐ ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ছাত্ররা যাহাতে সভাসমিতিতে না যায় তাহার তদ্বির করিতেন উপরওয়ালাদের খুসী রাখিবার জন্য।

আশুতোষের উদ্দেশ্য ছিল—বাংলার প্রত্যেক গ্রাম বিক্ষুব্ধ গ্রাজুয়েট দ্বারা ভর্তি করা। সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ফল হইয়াছে—পাঞ্জাবের ডি. পি. আই. কেলাণ্টের ভাষায়—'ইহারা বিক্ষুব্ধ বেকার এবং কাজের অযোগ্য' (Unemployed and Unemployable)। বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশ বৎসরেও ইহার সুরাহা করিতে পারেন নাই। গ্রাজুয়েটেরা ছন্নবুদ্ধি—ভাঙিতে জানে, জীবন ও জীবিকা গড়িতে জানে না। স্বদেশীযুগে সিলেটেও শ্রীশদত্তের অভিভাবকত্বে জাতীয় স্কুল হয়। বেশীদিন টিঁকে নাই।

দ্বিতীয় দফায় গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে আবার স্কুল-কলেজ খালি হইতে লাগিল ১৯২০ হইতে। জাতীয় স্কুল হইল। সিলেটে সুরেশদেবের অধিনায়কত্বে স্কুল হয়—বৈশিষ্ট্য কেবল খদ্দর, বাঁশের ছাতা, খালি পা, কটীবস্ত্র অর্থাৎ গান্ধীর মর্কটানুকরণ। ১৯৩০-এ ডি. পি. আই. কানিংহামের সার্কুলারের ফলে সিলেটে ছাত্ররা স্কুল ছাড়ে। তাহাদের জন্য প্যারীমোহন একাডেমী খোলা হইল। কলেজে ছাত্রদের পিকেটিঙে বাধা দিতে অস্বীকার করায় মুরারিচাঁদ কলেজের প্রোফেসর যতীশ দাসের চাকুরী গেল। পরে বেচারা সুভাষবাবু, বড়দলই, জহরলালের কাছে আবেদন করিয়াও স্বাধীন ভারতে চাকুরীটি আর পাইল না। বহু কষ্টে জীবনযাপন করিয়া শেষে ভৈরবের পুলের উপর ট্রেনে দাঙ্গাকারীদের হাতে প্রাণ দিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

প্যারীমোহন একাডেমী, পরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেন্দ্রনারায়ণ ক্রয় করিয়া 'রসময় মেমোরিয়েল' নামান্তর করিয়াছেন। সরকারী ইন্‌সপেক্‌টর সতীশ রায় ঐ স্কুল অনুমোদন করার বিরুদ্ধে ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট দেন। স্কুল কমিটির সভাপতি হরেন্দ্র মজুমদারসহ আমি সুভাষবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি ফোনে সিন্ডিকেটের সদস্য রমাপ্রসাদ প্রভৃতিকে হাত করেন। তার পরদিন হেরম্ব মৈত্র, সামসুল উলেমা সাহেব প্রভৃতির সহিত

হরেন্দ্রবাবুসহ দেখা করিয়া তাঁহাদের হাত করেন। আমি বলিয়াছিলাম—"হেরম্ববাবু কি আপনার কথা শুনবেন? সেই দিন আপনি সিটি কলেজ বোর্ডিং-এর সরস্বতীপূজা নিয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়াছেন।"

উত্তর দিলেন "ভাববেন না। তিনি আমার শিক্ষক।"

আমি দিল্লী এসেম্বলীতে থাকাকালে গান্ধীর নয়ী তালিমের কথা উঠে। বিহারের জাকীর হোসেনের পরিকল্পনা Earn as you learn। কুমিল্লার মহেশ ভট্টাচার্যের রামমালা বিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্যের কথা 'জানা লোক' অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। কুমিল্লার বিখ্যাত ধনী বেঙ্গল ইমিউনিটির মালিক নরেন্দ্র দত্ত স্বগ্রাম শ্রীকাইলে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ইহার প্রিন্সিপালের সহিত দেখা হওয়ায় জানিতে পারিয়াছি ঐটিরও অনুরূপ দশা।

স্বাধীন ভারত জনক গান্ধীর আজগুবি খদ্দর, মদ্যপাননিবারণ, নয়ী তালিম আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে মাত্র ; প্রাণ নাই, বিশ্বাস নাই—নিয়মরক্ষা—নমঃ নমঃ। 'রাজা' জহরলালের আশা শান্তিনিকেতনের উপর বেশী। এই আশাও ভঙ্গ হইবে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুদিবস অপেক্ষা জন্মদিবস পালনের পক্ষপাতী ছিলেন শুনিতে পাই। জীবিতাবস্থায় হিন্দু দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাকিবার কামনায় জন্মদিবস পালন করে। মৃত্যুর পর পুত্র আত্মার পারলৌকিক সদ্গতি কামনায়, স্বর্গ কামনায় দানদক্ষিণা করে, মৃত্যুদিনে নয়, মৃত্যুতিথিতে। ইহাই জাতীয় ভাবধারা। শান্তিনিকেতন জাতীয় ভাবধারার হদিস পায় নাই। ইংরাজী শিক্ষিতগণ, হারাইয়া যাওয়া জাতীয় ভাবধারা খুঁজিয়া না পাওয়া পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা হইতে পারে না। নয়ী তালিম হিন্দী প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়। বিদ্যাসাগরের আমলে সরকারী চাকুরীর লোভে যেমন লোকে ইংরাজী শিখিত এখন তদ্রূপ হিন্দী শিখিবে।

স্বাধীন ভারতে মদ্যপান বাড়িয়াছে পাশ্চাত্য অনুকরণে ; তান্ত্রিক প্রভাবে নয়।

কারখানায় দিনে কাজ করিয়া নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা—ইহাও স্বাধীনতার ২৫ বৎসর পূর্বে কার্নেগীর উপদেশ।

শিক্ষার প্রধান অঙ্গ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং চিন্তাশক্তির উন্মেষ। পর্যবেক্ষণ শক্তি আমাদের কত কম তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দৈনিক পত্রিকার খবরগুলি,—অনাবশ্যক, অবান্তর কথায় স্ফীত। সত্যিকার জানিবার মত কথা কমই আছে। স্টেটসম্যানের খবরগুলি ভাল। এখনও স্মরণ আছে বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকায়, স্বদেশী যুগে যখন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে প্রথম পুলিশে ধরে সেই খবর, এক কলম ব্যাপিয়া বাহির হয়—কিভাবে থানায় গেলেন, পুলিশের সঙ্গে বচসা ইত্যাদি। কিন্তু ওয়ারেন্ট আছে কিনা, কোন ধারায় তাহার উল্লেখ নাই। কয়েকদিন পরে জানিলাম ওয়ারেন্ট ছিল রাজদ্রোহের ১২৪-ক ধারায়।

অসম্পূর্ণ সংবাদ প্রকাশে খুব রাগ হইয়াছিল। এখনও ঐ রূপ হইলে রাগ হয়।

এই শ্রেণীর সংবাদদাতারাই একদিন দম্‌দম্‌ বিমানঘাঁটিতে সুভাষবাবু কোনো বিবৃতি দিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে ধম্‌কাইয়াছিল—"We can make and unmake leaders".

হিন্দুর গৃহ্যসূত্র অনুসরণ করিলেই গৃহীর ভাবধারা—জাতীয় ভাব, জাতীয় শিক্ষার হদিস পাওয়া যাইবে। কবিত্ব, আধ্যাত্মিকতা কোনও বিশেষ জাতির ভাব নহে।

লোকশিক্ষাপ্রচার

প্রচার ভিন্ন সভ্যতার বিস্তার হয় নাই। সভ্য রীতি নীতি ধরিয়া রাখিতেও নিত্য প্রচার আবশ্যক কারণ মানুষের ভোলা মন। পূজাপার্বণ, মেলা, যাত্রা, কথকতা, পাঠ ছিল আমাদের প্রচার—যাহা বর্তমানে দৈনিক পত্রিকা ও মাসিক পত্রিকা এবং সভাসমিতি সমূহ করিয়া থাকে। আমার জন্মাবধি ১৯০৬ ইংরাজী পর্যন্ত আমার বাবার আমলে এইগুলি পুরাদমে চলিয়াছে। বৎসর বৎসর রথযাত্রা হইত; পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তিতে বৃহৎ মেলা বসিত বিস্তীর্ণ মাঠে। শীতকালে একবার গোষ্ঠবিহার হইত। গ্রামের মেলায় বেশ্যা বা জুয়া ছিল না। দোল, দুর্গোৎসবে এবং ভাল বাহিরের দল আসিলে যাত্রা-গান হইত। সবই পৌরাণিক যাত্রা। সাত বৎসর বয়সে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' যাত্রা দেখিয়াছি। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত প্রহ্লাদ পুড়িল না—সেই অবাক ভাবটি এখনও মন হইতে দূর হয় নাই।

বিবাহ উপলক্ষে বাইখেমটাও দেখিয়াছি। ইহার কুপ্রভাব সিনেমা ও কলিকাতার থিয়েটার অপেক্ষা কম। সাধারণ সিনেমা অভিনেত্রী অপেক্ষা বাইজীরা সভ্য ও ভদ্র ছিল। আসরে এরা সসম্ভ্রম গাম্ভীর্য রক্ষা করিত।

ভাল ভাল পণ্ডিত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দুই তিন বা চারি সপ্তাহব্যাপী রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন। ভদ্রশ্রোতা শেষদিন ১ টাকা অথবা আট আনা (৫০ নয়া পয়সা) দক্ষিণা দিতেন। ভাল যাত্রার দল আসিলে সিলেট সহরে ঐ রূপ ফেরীর গান হইত। আমি যখন ইস্কুলে তখন সিলেটে বদন সিং মণিপুরী, মণিপুরী যাত্রার দল গঠন করেন। সহরের মণিপুরী ও বাঙালীরা মিলিয়া অভিনয় করিতেন। নরমেধ যজ্ঞে কুশধ্বজের ভূমিকায় সেনা সিংহ নামে একটি বালক চমৎকার করিত। ১৯৩০-৩৫ ইংরাজীতে পি. ডবলিউ. ডি. কর্মচারীরা জগদ্ধাত্রী পূজায় বিখ্যাত ঘাটীয়ার দলের যাত্রা করাইতেন।

আমার আমলে গ্রামে ক্রমশঃ ঐগুলি কমিতে থাকে। প্রধান কারণ--স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর মন ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। তৎপর গ্রামে যুবকেরা থিয়েটার করিত—মিশরকুমারী, মীরকাশিম প্রভৃতি। চেষ্টা করিয়াও ইহাদের দ্বারা পৌরাণিক নাটক অভিনয় করাইতে পারি নাই। ১৯২৪-এ চিত্তরঞ্জন-- "রাজনীতি সমাজধর্ম হইতে পৃথক নয়" - ইহা বলিয়াও মোড় ফিরাইতে পারেন নাই।

এখন সহরে, বিশেষভাবে কলিকাতায় ভাগবত পাঠ ও কীর্তনের ছড়াছড়ি। ইহা আর্ট কি ভক্তি, কি ফ্যাসন ঠিক বুঝিতেছি না। রামায়ণ মহাভারতের গার্হস্থ ধর্মের কথা কেহ শুনিতে চাহে না।

সেকালে সাময়িক সামাজিক প্রসঙ্গ লইয়া গ্রাম্যগীতি রচিত হইত যেমন বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের "সুনার পুরী আঁধার করে লুকালে কোথায়" (সুনার = সোনার) প্রসঙ্গ জলসুকার জমিদারের মৃত্যু। অথবা "তুতা মিঞার মরণ হইল পড়িয়া বিপাকে"—(জমিদারতনয়া কামরুন্নেছার স্বামী হত্যা)। ১৩০৪ বাঙলার প্রচণ্ড ভূমিকম্প বিষয়ক গানও রচিত হইয়াছিল। গ্রাম্য দলাদলির রাজনীতি নিয়াও কবিগান, যাত্রার পালা হইত। আমাদের সময়ে আতুয়াজান পরগণার কেশবপুর গ্রামে রাধারমণ দত্ত নামক এক ভক্তের গান-গুলি পথে ঘাটে গীত হইত। পৌরাণিক যাত্রার শেষ অঙ্কে একমেবাদ্বিতীয়ম্ প্রচার হইত। শিব, কালী, কৃষ্ণ সবই এক। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইংরাজী শিক্ষিতরা এখন পর্যন্ত প্রচার করিতেছেন যে সাধারণ হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদী নহে।

নারীজাগরণ

১৮৯০ এমন কি ১৯০০ ইংরাজীতেও বিলাত ফেরৎ ও ব্রাহ্ম মহিলা ভিন্ন কোন ভদ্রমহিলা পুরুষ মহলে বাহির হইতেন না। লম্বা ঘোমটা ছিল রীতি। ক্রমশঃ সরকারী উচ্চপদস্থদের গৃহিণীগণ ঘোমটা খাটো করিতে এবং বাহির হইতে আরম্ভ করেন। ৩৫ বৎসর পূর্বে (১৯১৭ ইং) যখন শিলং-এ বনবিভাগের কোন উচ্চপদস্থ চাকুরিয়ার স্ত্রী উপরওয়ালা সাহেবের গাড়ীতে ভ্রমণে বাহির হন তখন সহরে ঢি ঢি পড়িয়া যায়। ১৯২০ ইংরাজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় অল্প কয়েকজন বঙ্গনারী আন্দোলনে যোগ দিয়া রাস্তায় বাহির হন। ঐ সময় আসামে প্রবল আন্দোলন ও ধরপাকড় হয়। তরুণ ফুকনের বৃদ্ধা মাতা রাস্তায় বাহির হইয়া মায়েদের আহ্বান করেন—"এ সহরে কি মায়েরা মৃত? ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর মায়েরা ঘরে বসে!"

সিলেটে ১৯৩০ ইংরাজীতে আমার কারাদণ্ড হইলে মহিলারা প্রতিবাদে

রাস্তায় মিছিল করেন এই প্রথম। জেলে সুপার ম্যাককয় আমাকে বলেন— "তোমরা একদিনে পঞ্চাশ বছরের পথ অতিক্রম করিয়াছ। মহিলারা পর্দাপ্রথা ভাঙিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।"

গান্ধী আন্দোলন যে পর্দাপ্রথা ভঙ্গ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনৈক বন্ধু বলিতেন "বাছুর টানলে গাই ছুটে আসবে।"

নিজ সন্তানের সহকর্মী সন্তানদের প্রতি মায়েরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে আহারাদি সম্বন্ধে সস্নেহে সমান ব্যবহার করিতেন। ১৯০৫-এর আন্দোলনে জাতিভেদ শিথিল হইয়াছিল। কর্মীদের পিতামাতা, স্ত্রীর স্নেহের ও প্রেমের বন্ধনের উপরও ঝড় বহিয়াছে। কত মাতা, স্ত্রী দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন।

অন্তরঙ্গ সহকর্মীরূপে যুবকযুবতীর মেলামেশার সুযোগও এই প্রথম।

রক্তের ও পারিবারিক স্নেহের বন্ধন এ যুগের ছেলেমেয়েরা স্বীকার করে না। রাশিয়ায় বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা মাতাপিতাকে পুলিশের হাতে অর্পণ করে।

১৯০৫ ইং আন্দোলনে মা ভগিনীরা ঘরে বসিয়াই বিলাতী চুড়ি ভাঙেন, বিলাতী কাপড় পোড়ান এবং পুরুষদের উৎসাহ দেন। পরে বিপ্লবী আত্মীয় অনাত্মীয়দের কত না সাহায্য বঙ্গনারী করিয়াছেন। পুলিশ টের পাইলে নিশ্চিত বিপদ, জানিয়াও করিয়াছেন। এইরূপ একজন নারীকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া পুলিশ এক নামের অপর এক নারীকে গ্রেপ্তার করিয়া নাজেহাল হয়। দু-চারজন সাক্ষাৎভাবে বিপ্লবে যোগ দেন—যথা, চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। মুকুন্দদাসের গান 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী আর পরো না' বঙ্গনারীকে পাগল করে। "Women think through the heart hence they are extremist."

১৯১০ ইং নাগাদ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন—রেলযাত্রী নারীর প্রতি সকল শ্রেণীর পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি—এইসব গায়ে সহ্য হইয়া এখন আর চোখে পড়ে না। কিন্তু emancipated সহর ও পল্লীগুলিতেও যৌন আকর্ষণ যে কমিয়াছে মনে হয় না। গগনেন্দ্রনাথের এই চিত্রের সদৃশ ঘটনা এখন আর তত চোখে পড়ে না কারণ অনাত্মীয় নারীর সহিত মাখামাখি করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। মাথায় কাপড় এখন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, ব্লাউজের মাপও দিন দিন কমিতেছে। কেবল সাড়ী বিদেশিনী কর্তৃক প্রশংসিত বলিয়া রাজত্ব রক্ষা করিতেছে। সামান্য ইংরাজী জানা পুরুষের পোষাক হুবহু আমেরিকার আধুনিক ফ্যাসানে।

উত্তর কলিকাতা রক্ষণশীল না হোক অগ্রগতিতে দেরীতে চলে। আজও বাগবাজার কাশীমিত্রের ঘাট স্ট্রীটকে একটা জেনানা বাজার বলা চলে। গঙ্গা-

স্নান ফেরৎ মেয়েরা এ রাস্তায় তরীতরকারী কেনেন, বিকালে ছোটোখাটো নানান দ্রব্য ক্রয় করেন। পাড়ার লোক ভিন্ন পুরুষের যাতায়াত এ রাস্তায় কম। রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। গ্রাম্যপল্লীর আবহাওয়া এখানে কিছু কিছু আছে। গঙ্গার ঘাটে এবং বহু মন্দিরে প্রায় নিত্য ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ পাঠে প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান কতক রক্ষিত আছে। প্রগতিশীল নরনারীর শুভদৃষ্টি এখানে পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে দারিদ্র্যের মধ্যেও এখানে শান্তি আছে, আনন্দ আছে। হিন্দু ভারত আছে কালীঘাটে, বাগবাজারে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ পতিতালয়েও পৌঁছিয়াছিল। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কলিকাতায় অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহারই চেলা কয়েকজন, পতিতাদের দল বাঁধিয়া রাস্তায় বাহির করেন। যুক্তি ছিল, ইহাদের কি দেশসেবার সুযোগ থাকিবে না? যাই হোক, এই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হয় নাই। প্রসেশন হইতে দুই একটি 'সুভদ্রাহরণ' হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্র

দামোদরের বন্যায় ছাত্ররা কিরূপে দেশপ্রেম শিখে তাহা বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছি। ইংরেজের স্কুলে শিক্ষার ফল- জাতীয় স্বাধীনতার চিন্তার অঙ্কুর। এই অংকুর গাছে পরিণত হইতে চাহিবেই। ১৯০৫ ইংরাজীতে, কার্লাইল সার্কুলার তাহাতে বাধা দিয়া পরিণতির বেগ বৃদ্ধিই করে—ফলে স্বদেশী আন্দোলন। অপর দিকে আছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। স্যর আশুতোষ এই বিষয়ে অবহিত হইয়াই বহু কষ্টে চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির আক্রমণ হইতে বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। গান্ধীর যুক্তি, -ঘরে যখন আগুন লাগে তখন জ্বলন্ত গৃহের ভিতর ছাত্ররা বসিয়া নিশ্চিন্তে পড়ে না। অপর দিকে, অগ্নিনির্বাপণের পর আবার পড়িতে বসা উচিত। কিন্তু যাহারা বহু বৎসর কেবল অগ্নিনির্বাপণে হৈ চৈ করিয়া স্বভাবে বিগড়াইয়া গিয়াছে তাহাদের মন কি আর অধ্যয়নে ফিরিবে? বহু বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর নাগরিক সৈনিকদের গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ে। যাহারা বহু বৎসর ক্রমাগত তরবারি চালাইয়াছে তাহারা কি সহজে আবার লাঙ্গল ধরিতে চায়? রোমে এই অবস্থা বহুবার হইয়াছে। আমরা এখন এই দেশে তাহা দেখিতেছি। 'গোলামখানা ছাড়'—এই তাগিদে গোলামখানার রাখাল, শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের অশ্রদ্ধা হইয়াছে। গুরুর উপর শ্রদ্ধা হারাইলে শিক্ষা হয় না। গুরুরা চাকুরী হারানর ভয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করেন নাই যদিও অন্তরে সহানুভূতি ছিল। ইঁহারা স্বাধীনতাযুগের সৈনিক, ছাত্রদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। এখন যদি গুরু আবার শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন তবে ছাত্র

আবার ছাত্রই (গুরুর দোষ ঢাকার ছাতাই) হইবে—রাজনৈতিক দলের কাঁচা ছেলেদের দলে টানিয়া সস্তায় দল বাড়ানর প্রয়াস সত্ত্বেও। পরিণত বয়সে (৪২ বৎসর) রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করায় এই দোষমুক্ত ছিলাম যদিও কলেজে একবার পরীক্ষা বয়কট করায় যোগ দিই। তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ছাত্রদের স্কুল ছাড়িতে আহ্বান করি নাই, বলিয়াছি—যাহারা আসিতে চাও এসো—কিন্তু জানিবে তোমাদের পড়াশোনা আর হইবে না। কোনও ছাত্র বা যুবসমিতির সভায় সভাপতিত্ব করি নাই। যুবক কর্মীরা আমাকে একটু ভয়ই করিত। তাহারা জানিত আমার চিন্তাধারা অন্যপ্রকার। আমি বালসন্ন্যাসী নহি। গান্ধীটুপি মাথায় দেই নাই। তিলক দেখিয়া বৈষ্ণবকে শ্রদ্ধা করি না, করি চরিত্রের। 'ভেক'-এ কিন্তু ভিখ্ মেলে। বন্ধু ক্ষীরোদ দেব আসাম কাউন্সিলে পরিবার জন্য একটি টুপী দেন। দুই-তিন দিন মাত্র পরিয়াছিলাম মনে হয়। দিল্লী এসেম্বলীতে দলে টুপী প্রসঙ্গ উত্থাপনে বলিয়াছিলাম: বাঙ্গালীর পরিচয়—উষ্ণীষ বিহীন, গান্ধীও স্বীকার করিয়াছেন।

গুরুর বেতন বৃদ্ধি দরকার—স্বীকার করি। তবে সরস্বতীর বরপুত্রেরা চিরকালই দারিদ্র্য স্বীকার করিয়াছেন—জ্ঞানান্বেষণ ও বিতরণই তাঁহাদের মুখ্য পুরস্কার। টোলের পণ্ডিত ইঁহাদের অপেক্ষা কম বিদ্বান নহেন—তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ। আধুনিক গুরু গোলাম, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির হুকুমে ওঠেন বসেন, গুরুত্ব লোপ পায়। সেকালের হিন্দু-মুসলমান রাজাদের মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের রাজা বৃত্তি দিবেন মাত্র—কাজের তদারক করিবেন না। পণ্ডিত নিজ চরিত্র ও প্রতিভায় সহকারী পণ্ডিত সংগ্রহ করিবেন। ইহাই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে বহু। ইঁহাদের Territorial jurisdiction সীমাহীন হইবে। নিয়োগকর্তা কর্মপ্রার্থীদের পরীক্ষা লইবেন—চরিত্র এবং জ্ঞানের। টোল কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির সহিত কর্মদক্ষতার সম্বন্ধ কি?

রাজনীতি ও অর্থনীতি যাহাদের কোন আয় নাই, যাহারা অপরের পোষ্য তাহাদের ভোট থাকিবে না। এবং ছাত্রদের ভোট থাকিবে না। তাহাতে পড়া ছাড়িয়া রাজনীতির হুজুগ করার প্রবৃত্তি কমিবে। ১৯০৫ ইংরাজী হইতে যে সব বালসন্ন্যাসী (এখন বিষয়ী) দেশ উদ্ধারের কাজ করিয়াছে তাহাদের পুনর্বাসন সমস্যা 'ইভাকুঈ' সমস্যা অপেক্ষা কঠিন। ইহারা কংগ্রেসের Patronage ভাঙাইয়া খাইতে চায়। এখন অনেক ছাত্রকর্মী এইরূপ। Patronage-এর আশা রাখে। বলিয়াছি গোলামখানার শিক্ষকগণ, আশুতোষের দলও দেশপ্রেমিক ছিলেন, যেমন মডারেট দল। পার্থক্য এই, তাঁহারা অত্যাচার সহিবার সাহস রাখিতেন না। শত বৎসর পূর্বে মেকলের ডেসপাচে লেখা ছিল—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়রা একদিন গণতন্ত্র চাহিবে—সেদিন

ইংরাজের গৌরবের।' অগ্রপশ্চাৎ করিয়া ইংরাজ ক্রমশঃ ঐ পথে অগ্রসর হইতে-ছিল। ইঁহারা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভরসা রাখিতেন—যেমন রাখিতেন বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য), সুরেন্দ্রনাথ।

অহিংসা ও খাদি

ইতঃপূর্বে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীর চরিত্রের কথা বলিয়াছি। উত্তেজনার মুখে যৌবনে ইহারা তেজ, সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ এবং বাহ্যত বহুলাংশে অহিংসা প্রদর্শন করিয়াছে বটে কিন্তু এই অহিংসভাব অনেকের বেলায় স্থায়ী হয় নাই। বোধহয় 'সম্পূর্ণ অহিংসা' সৃষ্টির ধারা নয়,—বিশেষতঃ বাঙালীর রক্তে পুরুষানুক্রমিক শক্তিপূজার প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। শক্তিপূজাই বাঙালীর স্বধর্ম। চৈতন্যের প্রেমধর্মও ইহাকে লোপ করিতে পারে নাই বরঞ্চ দেখি অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণবই কালীপূজাও করে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। বিগত ত্রিশ বৎসর অহিংসধর্ম চর্চার ফলেই বোধহয় আজ বাঙালী চরিত্রের অধঃপতন। বাঙালী নিজেই আজ স্বীকার করিতেছে—Bengal lies low.। নিজে দুর্বল না হইলে অপরে আমাকে নীচে ফেলিবে কি করিয়া? অভিযোগে ক্ষান্ত দিয়া বাঙালীর আত্মদর্শনের দিন আসিয়াছে।

মাত্র কয়েকজন খাদি কর্মী দেখিয়াছি, যাহারা প্রকৃতই অহিংস। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, কিছুতেই চটে না, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সেবাই যাহা-দের জীবনের মূলমন্ত্র। সিলেটের পূর্বোল্লিখিত ধীরেন দাদা, পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ও অনুচর নিকুঞ্জ গোস্বামী—ইঁহারাই ছিলেন এদের মধ্যে সেরা। আরও দুই চারজনের নাম মনে পড়িতেছে না।

মনে পড়ে আসাম এসেম্বলীতে বলিয়াছিলাম "পুরা দিন সূতা কাটিয়া দশ পয়সা লাভ হয়। অনেকের এই রুজিও নাই বলিয়া আমি ইহা সমর্থন করি।" কানিংহাম (ডি. পি. আই) বলেন 'খাদির নৈতিক প্রভাব আছে।' তিনি নিজে তকলী কাটেন।

মুসলমানই বেশী সূতা কাটিত। হিন্দু অলস, সংযত-শক্তির সত্ত্বগুণ ও আলস্যের তমোগুণে তফাৎ করিতে না পারিয়া হিন্দু আজ তেজহীন।

হরেকৃষ্ণ মহতাব লিখিয়াছেন "গান্ধীজী যদি অহিংসার সর্ত না করে আইন-অমান্য আন্দোলনের নির্দেশ দিয়ে যেতেন তাহলে সর্বনাশ হত। প্রচণ্ড দমন নীতিতে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যেত।"

অর্থাৎ প্রচণ্ড ও বিরাট কর্মী হরেকৃষ্ণ মহতাব ও Non-violence from policy—এই দলে ;—নীতিগতভাবে বিশ্বাসী নহেন। চিত্তরঞ্জনও এই দলে ছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিপিন পাল আইন-

অমান্যকে Passive Resistance (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ) বলিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা কংগ্রেস বিপিনবাবুর মানসশিষ্য। গান্ধী ছিলেন স্বীকৃত গুরু। খাঁটী লোক বিপিনবাবুর দন্ড হইল রাজনীতি হইতে নির্বাসন!

কংগ্রেসের সত্যবিকৃতি—ঝটিতিপন্থা

অন্যত্র নাগারানী গাইদলুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। নিরক্ষর, বাংলা ইংরেজী না জানা নাগা sorceress. শ্রীহট্টের কংগ্রেস কর্মীগণদ্বারা গান্ধী-ভক্ত, স্বাধীনতার উপাসিকা, মিশনারী কলেজ শিক্ষিতা বীরনারীতে রূপান্তরিত হন। মালাবারের মোপলাবিদ্রোহীদেরও স্বাধীনতাযুদ্ধে গান্ধীদলের সৈনিক রূপান্তরিত করা হয়। ইংরেজের অভিযোগ মোপলারা ধর্মোন্মাদ, একটি পাকিস্তান করিতে চাহিয়াছিল (যদিও পাকিস্তান শব্দের উদ্ভব তখনও হয় নাই)। মোপলারা কি সংখ্যক বিধর্মীর উচ্ছেদ করিয়াছিল তাহা গণনা করা উচিত।

১৯২১ ইংরাজীতে গান্ধী Swaraj by 31st December দিবার আশা দিয়াছিলেন। নবীন বড়দলই একদিন হাসিতে হাসিতে বলেন "সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিলাম ৩১শে ডিসেম্বর স্বরাজ হইবে।" বিপ্লব-রিভলিউশন কথাটা এখন ছেলেবুড়া সকলের মুখে। পাশ্চাত্য সমাজ ও রাষ্ট্রে ঝটিতি পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। গান্ধীরও সব ঝটিতি। অত্যাচারে লোকে এত অস্থির হইয়াছে যে কেহ ভাবিয়া দেখে না প্রকৃতির পরিবর্তন সবই বহুকালের অভ্যাসের ফল। প্রকৃতি, A bundle of habits।

বন্ধু! ধীরে, ধীরে! এত দ্রুত ছুটিলে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মরিবে।

নেতৃত্ব চিরকালই আভিজাত্যের থাকিবে

মোঘল আমলে নেতৃত্ব ছিল সামন্তদের হাতে। সামন্তদের সাহায্যেই বাদশাহ তক্তে বসিতেন বা তক্ত হইতে নামিতেন। পলাশীর যুদ্ধও সামন্তদের খেলা। ইংরেজ অধিকারে সামন্ত লোপ পাইলেন। জমিদারগণ আরজি পেশ করিবার অধিকার মাত্র পাইলেন। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য জমিদারই ছিলেন প্রকৃত নেতা। তাঁহাদের ইঙ্গিতে, উল্লাসে কি ভয়ে, সমাজ পরিচালিত হইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের পর প্রফেসনাল বড় বড় উকীল ডাক্তাররা নেতাদের দলে ভিড়িলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদার নেতার সমিতি। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন উকীল ডাক্তার নেতাদের সমিতি। ইঁহারাও ধনী এবং অনেকে জমিদারী ক্রয় করিয়া জমিদারও। ১৮৯০ ইংরাজী পর্যন্ত ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নেতৃত্ব। অতিমাত্রায় রাজভক্তিসূচক ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়া অখণ্ড ভারতের জাতীয়তাবাদী অভিজাতদের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'—তাহাদের নেতৃত্ব ১৮৯০—১৯১০। তৎপর কয়েক বৎসর কতিপয় চরমপন্থী নেতাদের (ইহারাও প্রফেসনাল, উচ্চ মধ্যম শ্রেণী বা মধ্যম শ্রেণী) উস্কানীতে বিপ্লবী যুবকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেতৃত্ব (যুগান্তর, অনুশীলন দল) ছিল। উপদলের নেতৃযুবকগণও বড় উকীলের বা হাকিমের ছেলে। তারপর ১৯১৮ হইতে গান্ধীযুগ। বিপ্লবী অনেকে গান্ধীদলের উপনেতা হইল। ক্রমশঃ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে ভাল ভাল কর্মী আসিতে লাগিল। স্বাধীন হওয়ার পর ইহারা ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত কি উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইতেছে। ঐ কালে কংগ্রেসের প্রচার ছিল 'গরীব ও নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বরাজ।' স্বাধীনতার পর, মুখে কৃষকমজদুর-রাজ, কিন্তু পরিচালিত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজদ্বারা। এম. পি-রা পার্লামেন্টের আরামদায়ক কক্ষে বাস করিয়া ও দৈনিক ৩৫ টাকা ভাতা পাইয়া এখন উচ্চমধ্যবিত্ত—মায় কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ! এত আরামের পর কি ইঁহারা প্রখর রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, মাঠে, ঘাটে আর প্রচারকার্য করিবেন? ধনীদের সঙ্গে কিছু কিছু হাত মিলাইয়া কৃষক মজদুর রাজ চলিতে থাকিবে। ইহাই চিরন্তন রীতি। রাজা চিরকালই প্রজারঞ্জক; জমিদার চিরকালই প্রজাবন্ধু। জমিদার, রাজা সকলেরই আদিপুরুষ মজদুর। আলামোহন দাশও একদিন মজদুর ছিলেন। কৃতী পুরুষ চিরকালই উপরে উঠিয়াছেন, এখন উঠিতেছেন, ভবিষ্যতে উঠিবেন। কেবলমাত্র বোলচাল একটু পৃথক। ইহাই প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব—struggle for existence.। সর্বহারাই নিছক Justice কামনা করে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন 'ধর্মের জয় ইহকালে নয়: অধার্মিকের জয় সর্বত্র।'

১৯৩৬ ইংরাজীতে একবার শিলচরে কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অরুণ চন্দ অভিযোগ করেন, তাঁহার সেক্রেটারী অচিন্ত্য, কংগ্রেস পতাকা উড়াইয়া সভা করিয়া কম্যুনিজম প্রচার করে। অচিন্ত্যকে ডাকাইয়া জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর দোতলার ঘরে অরুণ চন্দ, ধীরেন গুপ্ত প্রভৃতির সাক্ষাতে আলোচনা করি। সে উত্তর দেয় "প্রথমে ধর্মযাজক, পরে সামন্ত, এখন জমিদাররা—নিরক্ষর, বোকা জনসাধারণকে চরাইয়া খাইতেছে।"

আমি বলিলাম "কম্যুনিস্টরাও এখন গরু-রাখালীটা নিতে চায়?"

বহু তর্কের পর সে আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে। অর্থাৎ চিরকালই বেশী কৌশলী লোক, জনস্বার্থের বুলির অন্তরালে নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধার করে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কথা 'অধর্মের জয় ঢাকঢোল পিটাইয়া হয় না। ধর্মের তিলক, নামাবলী গায়ে দিয়া অধর্ম জয়ী হয়।'

অবশ্য মানুষমাত্রেই ভালমন্দ মেশানো। কিছু স্বার্থ, কিছু পরার্থ

বুদ্ধিতে চলে। বইয়ের পোকারা ভুলিয়া যান যে মানুষের মধ্যে ভালমন্দ পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির সমাবেশ থাকেই।

অচিন্ত্য ও বীরেশ মিশ্র এখন কাছাড়ে কম্যুনিষ্ট নেতা। বীরেশ মিশ্র বহু বৎসর আত্মগোপন করিয়া ছিল। কিন্তু শুনিয়াছি, সিলেটেও নাকি মাঝে মাঝে আসিত। সে আবার খোঁড়া। তাহাকে চিনিয়া ফেলা কঠিন নয়। বেঁটে, স্বাস্থ্য চমৎকার ; ভাবাবেগ আছে—শ্রীচৈতন্যের বংশজ। ১৯২৯-এর বন্যা হইতে ভাল কংগ্রেসকর্মী ছিল। ১৯৩৪-এ কংগ্রেস ছাড়িয়া যায়। দুইবার আইনসভা নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বেশ বেগ দিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের জ্ঞাতি বলিয়া ভক্ত মণিপুরী মহলে প্রচার করিয়াছিল। মণিপুরীরা পরম চৈতন্যবৈষ্ণব।

ইলেকশনে কত রকম যে মিথ্যা চলে, মনে হইলে এখন হাসি পায়। একবার আসামের মন্ত্রী রায়বাহাদুর প্রমোদ দত্তের ইলেক্‌শনের সময় হবিগঞ্জে আমাদের এক নির্বাচনী সভায় যোগেন্দ্র দেব বলেন 'প্রমোদবাবু পোষ্টকার্ডের দাম বাড়াইয়াছেন।'

আমি সত্যের খাতিরে বলিলাম "যোগেন্দ্রবাবু ভুল করিয়াছেন—পোষ্টকার্ড দিল্লী সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত, আসাম সরকারের নহে।"

নিয়মানুবর্তিতা ও উপরিওয়ালাকে মান্য

দলের ডিসিপ্লিনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি আসাম কাউন্সিল ও দিল্লী এসেম্বলীতে ইউরোপীয় দলে। ইচ্ছামত কোন সদস্য বক্তৃতা করিতেন না। দলের সেক্রেটারীর নির্দেশে ইঁহারা বক্তৃতায় এমন কি লবীসংলাপেও পরিচালিত হইতেন। অনেক সময় সেক্রেটারী বক্তৃতা লিখিয়া দিতেন এবং দলের নেতা তাহা দেখিয়া বক্তৃতা দিতেন। সহজে বুঝা যাইত না যে তিনি বক্তৃতা পাঠ করিতেছেন। দলের সভায় নিরর্থক বাদানুবাদ ছিল না। অল্পক্ষণেই সভার কার্য শেষ হইয়া যাইত। সভ্যদের পরিপোষক সমিতি বা সমিতিসমূহ একযোগে দলের নীতিনির্ধারণ করিতেন। বিস্তারিত আলোচনা, সেক্রেটারীর উপর ভার। বিষয়ী লোক—ইঁহারা জানেন Too many cooks spoil the broth (অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট)। সভ্যদের আত্মজাহির করার স্পৃহা ছিল না। কালে ভদ্রে সেক্রেটারীর নির্দেশমত বক্তৃতা দিতেন। আমার সময়ে কংগ্রেস দলেও ডিসিপ্লিন রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে। তাহা Inner Ring হইতে, খাপছাড়া ভাবে। সদস্যরা আমল পাইবার উদ্দেশ্যে দলনেতা কি হুইপের পিছনে ঘুরিতেন। বিহিটা রেল দুর্ঘটনার আলোচনায় ঘটনার বিবরণ সম্যক

অজ্ঞাত এক সদস্য, কংগ্রেস পক্ষে একমাত্র বক্তা ছিলেন- রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দেশে। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রদত্ত বিবরণের পুনরুক্তি করিয়া সরকারী সদস্য-হস্তে নাজেহাল হ'ন।

দেশবিভাগের পর পাকিস্তান হিন্দুস্তানে অধস্তন কর্মচারীরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। জহরলাল প্রথম দিনই সেক্রেটারিয়েট চাপরাসীদের বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য করেন। শিলং-এ কেরাণী চাপরাসীরা ইচ্ছামত দেরীতে আসিত ; অফিসার কিছু বলিতে সাহস পাইতেন না। স্বাধীন গণতন্ত্র যে! অর্থাৎ সকলের স্বাধীন ভাবে চলিবার অধিকার আছে। সাহেবদের দেখিতাম উপর-ওয়ালার সঙ্গে ধীরে, মৃদুস্বরে, প্রায় কুর্ণিশ করিয়া কথা বলিতেন, আর কমিটি রুম হইতে বাহির হইয়াই গলাগলি করিয়া বন্ধুবৎ রঙ্গতামাসা চলিত। সরকারী সম্বন্ধ আর ব্যক্তিগত সম্বন্ধের যে যোগাযোগ নাই, আমরা কবে বুঝিব?

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, রাজনীতি সমাজনীতি মিলিয়া সর্বাত্মক নীতি হওয়ায় আলোচ্য প্রত্যেক বিষয়ে দলগত নীতি থাকে। এর ফল, সভ্যদের ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মতের লোপ—Regimentation of thought। দোষটা কি কেবল স্ট্যালিনের? ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সমাজ চিন্তা ছিল ব্যক্তিগত। ধর্মীয় রীতিনীতি এমন কি জেল সংস্কার বিষয়েও মন্ত্রীরা বিরোধী পক্ষে বক্তৃতা দিতেন।

Indiscipline বা উচ্ছৃঙ্খলতা অর্থ--আইনকানুন না মানা। প্রধানমন্ত্রীও যদি আইন না মানেন তবে অধীনস্থ কর্মচারীদের উচিত তাঁহাকে সোপর্দ করা। কোনও মন্ত্রী হলফ করিয়া বলিতে পারিবেন না যে তাঁহার গাড়ী কোন-দিন দ্রুতগতি চলে নাই। কোথাও এখন পর্যন্ত শুনি নাই, কোনও মন্ত্রীর ড্রাইভার (বা স্বয়ং চালক হইলে তিনি নিজে) সোপর্দ হইয়াছেন। পুলিশ ভয় করে, পাছে কর্তব্য করিতে গেলে মন্ত্রী গোঁসা হন। এতে প্রমাণ হয়, কর্তারাই স্বয়ং Indisciplined। তাঁহাদের ডিসিপ্লিনের চীৎকার মাতালের মাদকদ্রব্য নিষেধের বক্তৃতা! ইহাও আমরা শুনিতে অভ্যস্ত! অন্যত্র বলিয়াছি, বিলাতে মন্ত্রী কার্জনসাহেব দ্রুতগতির জন্য পাঁচ পাউন্ড জরিমানা দিয়াছেন। এদেশেও ইংরাজ আমলে আসাম লাট কার সাহেবের পুত্র পথের আইন লঙ্ঘনের জন্য পিতার নির্দেশে সোপর্দ হইয়া দুইশত টাকা অর্থদণ্ড দিয়াছেন। যদিও এই ক্ষেত্রে অপরের কোনো অনিষ্ট হয় নাই ; পুত্র কেবল নিয়মভঙ্গ করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলে এক দিল্লীর বাদশা এবং বাংলার এক সুলতান—ইঁহারা আপন পুত্রকে কঠোর শাস্তি দিয়াছেন। স্বয়ং রাজা চোর হইলে সর্বসাধারণের চোর চরিত্র হইবেই। অবিচারে রাজ্যনাশ।

স্বদেশী কারবার

আমার ছাত্র অবস্থায় কলিকাতা থাকা কালে স্বদেশী আন্দোলনের সম্বন্ধে পূর্বে স্থানে স্থানে কিছু কিছু বলিয়াছি। বড়বাজারে বিলাতী কাপড় বয়কট ছিল এর একদিক। অপর দিক, স্বদেশী কাপড় উৎপাদন। বড়বাজারে পিকেটিং-এ পুলিশের সহিত সংঘর্ষ হইত। পিকেটিং-এ মারোয়াড়ী স্বদেশীকে সাহায্য করে নাই, পরে (জনমতের) ভয়ে সাবধান ও সংযত ছিল।

বোম্বাই মিল ইতঃপূর্বে চীন দেশে লুঙ্গী রপ্তানী করিত। স্বদেশীর যুগে অধিক মূল্যে মোটা কাপড় বাংলায় পাঠাইয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এর পূর্বে মিলগুলি কায়ক্লেশে বাঁচিয়াছিল। কারণ, ৩% countervailing excise, ৩% এক্সসাইজ ডিউটি (ম্যানচেস্টার কাপড়ের উপর ৩% Import only ডিউটির সহিত সমতা রক্ষার্থ)। এই ডিউটি উঠানোর জন্য মিলগুলি কংগ্রেস মারফৎ আন্দোলন করিত।

মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত চটের মোটা বোম্বাই ধুতি পরিয়া গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, স্মরণ আছে। আমরা তাঁতের ধুতি, ময়নামতী তাঁতের ছিটের উপর অনেকটা নির্ভর করিতাম; অভাবে, জাপানী গেঞ্জি ইত্যাদি। মোটা সুতার পাবনার তাঁতের ধুতি জোড়া ৩ টাকা, ময়নামতী ছিট ৩ আনা গজ, বোম্বাই টুইল ৪ আনা গজ ছিল। পক্ষান্তরে, রেলির লাটু-মার্কা ধুতি জোড়া ১ টাকা বারো আনা, বাবুয়ানী রেলি ৫৯ নং ধুতি জোড়া আড়াই টাকা মাত্র। ঐ সময় পাবনায় গেঞ্জির কল হয়।

বিলাতী বয়কটে জাপানী দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। এই সময় দেশী স্টীল ট্রাঙ্কের ব্যবসার আরম্ভ। বোম্বাই টুইল ও ময়নামতী কাটা কাপড়ের দোকান বহুবাজারে প্রথম স্থাপিত হয়। এর পূর্বে চাঁদনীচকই ছিল কাটা কাপড়ের প্রধান বাজার।

কুমিল্লার অশ্বিনী বর্মণের দোকানটি বড় ছিল। লালবাজারে হালিম গজনবীর ন্যাশন্যাল স্টোরস বৃহৎ ছিল। তথায় দামী বেনারসী, মুরশিদাবাদ রেশমের কাপড় ইত্যাদি শৌখীন দ্রব্য ছিল। বহুবাজার—কলেজ স্ট্রীট সঙ্গমে আর একটি দোকান ছিল সিলেটের যোগেন্দ্রকিশোর সিংহের এবং শ্রীসর্বাধিকারীর গ্র্যাজুয়েট ফ্রেন্ডস কোং।

বঙ্গভঙ্গের পূর্বেও স্বদেশী ছিল। শুনিয়াছি 'ন্যাশন্যাল' নবগোপাল স্বদেশী মেলা করেন। বোধহয় ১৯০২ ইংরাজীতে বেণেটোলায় হ্যারিসন রোডের উপর আই, বি, সেনের স্বদেশী দোকান ছিল। সেখানে খুঁটিনাটি স্বদেশী দ্রব্য, হাড়ের বোতাম, মাদ্রাজের এলুমিনিয়ম তৈজসপত্র ছিল। কাপড় বোধহয় ছিল না। রবি ঠাকুর নাকি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁতের কাপড় হাওড়ার হাট, চিৎপুর, বড়বাজারে মিলিত।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মী মিল দেশসেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। কারবারী বুদ্ধির সহিত দেশপ্রেম মিলিয়া ফল হইল—দেশপ্রেমিক অংশীদারকে কতকগুলি চতুর লোক ঠকাইয়া খাইল! জনৈক নেতার শ্যালক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যাঙ্কটি নাশ করিলেন। লোকে বলে, "মামা-ভাগ্নেতে লঙ্কাকাণ্ড করলে।" আর একজন নেতার জামাতা বঙ্গলক্ষ্মীর সর্বনাশ করিয়া জেলে গেলেন। শ্বশুর লজ্জায় দুঃখে পাগল হইলেন। বিশ বৎসর পূর্বে (১৯৩২-৩৪) কুমিল্লার জনৈক কারবারী কাপড়ের কলের শেয়ার উঠানোর জন্য শ্রীহট্টে গিয়া দেশসেবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলে ধমক দিয়াছিলাম, "এসব বকধার্মিকা কথা রাখুন। সোজা কথা, টাকা লগ্নী করিয়া আমি সুদ পাইব আর আপনারা টাকা নাড়াচাড়া করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিবেন।"

সুভাষবাবু প্রভৃতি প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা 'স্বদেশী' (?) কারবারের দ্বার উদ্ঘাটন করানো হইত। এখন লাট-মন্ত্রীদের উপর এই ভার। উৎপন্ন দ্রব্য-মাত্রই দেশের লোক ভোগ করে। কারবারীর মুখ্য (একমাত্র বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না) উদ্দেশ্য, লাভ। নূতন কারবার, যাহাতে ঝুঁকি আছে, ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, সেইগুলি ভিন্ন অন্য কারবারের সংস্পর্শে লাট, মন্ত্রীদের যাওয়া অকর্তব্য। কারণ, ইহা একপ্রকার ক্যানভাসিং।

শ্রীহট্টে একটি ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনে গমনের সময় সুভাষবাবুকে বলিয়াছিলাম, "আপনি রোজগার করেন না, টাকার দরকার হইলে দেখি, মেজদাকে টেলি করেন--আপনি ব্যাঙ্কের সঙ্গে কেন জড়িত হ'ন?" বড় কারবার বা ব্যাঙ্কের উদ্বোধন, যাহারা ঐ কারবারের অবস্থা সম্যক বুঝে ও জানে, তাহাদের দিয়া করিলে খাঁটি ক্যানভাসিং হয়। আমাদের কনফারেন্সগুলিতে বাহিরের নামজাদা নেতাদের বহুব্যয়ে আনাইবার একটা হুজুগ ছিল। আপত্তি করিলে বন্ধু ক্ষীরোদ দেব বলিতেন, 'সার্কাস যতই ভাল হউক, সিংহ না থাকিলে দর্শক জুটিবে না।'

পূর্বোক্ত ব্যাঙ্কের বড়কর্তারা এখন জেলে। বিগত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেন যে, ঐ সকল ব্যাঙ্ক আনাড়ী লোক-চালিত ; পোষ্যপালনার্থে বে-হিসাবী অনেক শাখা খোলা হইয়াছে, যাহা ক্ষতিজনক হইতেছে।

ব্যাঙ্কগুলি এতদিনে ফেল হইত, যদি না যুদ্ধের কন্ট্রাকটারদের টাকার চাহিদা বাড়িত। গ্যারিসন অফিসারকে মদ, ঘুষ ইত্যাদি দানে নূতন কন্ট্রাক্টর সম্প্রদায় (ক্ষুদে সাধারণ ফিরিওয়ালাও) বড় কন্ট্রাক্টর হইত। ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণও গোপনে কন্ট্রাক্টরদের সরিক হইয়া অপাত্রে টাকা দাদন করিলেন। ২।৩ বৎসর বেশ গেল। কিন্তু যেই বিলগুলির পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া কাটা যাইতে লাগিল তখনই সর্বনাশ হইল ব্যাঙ্কের অংশীদারদের, কর্মচারী বা

কন্ট্রাক্টরদের নহে। কন্ট্রাক্টরগণ, শরিকের লাভ-ক্ষতির হিসাব না করিয়া যার হাতে যখন টাকা আসিয়াছে সেই আত্মসাৎ করিয়া হীরার আংটী কি সোনা কিনিয়াছে। পরে শরিকদের মধ্যে এই নিয়া, এমনকি নিকট আত্মীয়-দের মধ্যেও, মোকদ্দমা হইয়াছে।

যুদ্ধের পর পূর্ববর্তী বৎসরগুলির ইনকাম-ট্যাক্সের জন্য যখন চাপ পড়িল তখন ঐ নূতন ধনীরা কেহ কেহ গা ঢাকা দিলেন। একবার হিন্দুস্থান, একবার পাকিস্তান করিয়া ইনকাম-ট্যাক্স কর্মচারী ও পুলিশকে এড়াইয়া চলিলেন। প্রায় সব কারবারীদের আজ এই অবস্থা।

কলিকাতায় রাতারাতি লক্ষপতি হওয়ার উপায় নাকি পর্দার ছবি প্রস্তুত করা। আবার ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণ স্বনামে বেনামে এই ব্যবসায় নামিলেন। আরও কতকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল কিন্তু কাহাকেও বড় জেল খাটিতে হইল না। মন্ত্রী, লাটকে আপ্যায়নে ইঁহারাই নাগরিক-প্রধান। এখন সরকার ইঁহাদের হাতে। ইলেকশনে বড় চাঁদা দেন ইঁহারা। গান্ধীর ভাষায় Gift without obligation। কংগ্রেসের দুর্দিনে ইঁহাদের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় নাই। অনেকে বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছেন।

ভারতে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী করা আর চলিবে না। লোকের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্রোড়পতিরা একক কি কয়জন মিলিয়া অংশীদারী ব্যবসা চালাইবেন। ধন কেন্দ্রীভূত হইবে, ধনবন্টন হইবে না। এখন জনমত ক্রমশঃ সরকারী উদ্যোগের দিকে ঝুঁকিতেছে। কিন্তু মুশকিল, রাজপুরুষ-গণও দেশেরই লোক; তাঁহারাও সমান অবিশ্বাসভাজন।

ইংরাজ, স্বদেশীকে নরম করিয়া ম্যানচেস্টারকে বাঁচাইবার জন্য বঙ্গভঙ্গ রদ করিল কিন্তু বাঙ্গালীর শক্তি আরও খর্ব করিল। আবার বাজারে বেলির কাপড় চলিল। স্বদেশীতে বাংলার অর্থনীতির বিশেষ উন্নতি হয় নাই। লালা শ্রীরাম প্রভৃতি "নূতন চীনেবাজারী"-রা আবার স্বদেশীর ধুয়া তুলিয়াছেন। সাধু সাবধান!

স্বদেশী হুজুগে বাংলায় পঞ্চাশ বৎসরে অল্প কয়েকটি কাপড়ের কল হইয়াছে। তাহাতে বাংলার চাহিদা সামান্যমাত্র পূরণ হইয়াছে। বোম্বাই মিলই বাংলাকে চুষিতেছে। বাংলার যাবতীয় কারবারে, বড়, ছোট, এমনকি ক্ষুদে দোকানেও অবাঙ্গালীদের পোয়াবারো। ১৯০০ ইংরাজীতে হাটখোলায়, চীনে-বাজারে বড় বাঙ্গালী কারবারী ছিল। এখন প্রায় নাই। স্বদেশী কারবারে বাঙ্গালীর দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। ইংরাজের স্থান সবক্ষেত্রে মারোয়ারী দখল করিতেছে। যুদ্ধের বাজারে ইহারা ক্রোড়পতি হইয়াছে। ক্রোড়পতি ভিন্ন ইংরাজদের বৃহৎ কারবার ক্রয় করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

স্বদেশীর জয় রাজনীতিক্ষেত্রে, আর্থিক ক্ষেত্রে নয়। সেখানেও বাঙ্গালী জয়ী হইয়াও উল্টা কিল খাইয়াছে। গোখলে প্রমুখ অবাঙ্গালী নেতারা বয়কট

সমর্থন করেন নাই। জনমতের ভয়ে, বেনারস কংগ্রেসে (১৯০৫) স্বদেশী মাত্র আংশিক সমর্থন করেন।

১৮৯০ ইংরাজীতে সিলেটে, ব্যবসা সাহাদের একচেটিয়া ছিল। এখন সবই মুসলমান ও মারোয়ারীদের। ভাবাবেগে ব্যবসা হয় না, চাই ঝুনা বুদ্ধি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টায় ও চীৎকারে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি কয়েকটি বাঙ্গালী কারবার হইয়াছে। এখন এগুলি কি পরিমাণ বাঙ্গালী তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।

বেঙ্গল রেজিমেন্ট

'স্বদেশী কারবার'-এর যমজ ভ্রাতা ১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্ট। ভদ্রলোকের ছেলেরাই বেশী যোগ দেয় দেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে।

যতদূর মনে পড়ে, ডাঃ শরৎ মল্লিকই অগ্রণী ছিলেন। এই দল মেসোপটেমিয়ার বসরায় প্রেরিত হয়। কতিপয় যুবক পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে বদনাম কিনিয়াছে। এমন কি ইহাদের মধ্যে খুনোখুনিও হইয়াছে। কুটেলআমারা অবরোধে ইহাদের একদল খুব সাহস সহকারে ও কষ্ট সহ্য করিয়া গোলাবর্ষনের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছে।

১৯৩৮ ইংরাজীতে, পুনরায় বাঙ্গালী রেজিমেন্ট কেন করা হয় নাই, এই প্রশ্ন এসেম্ব্লিতে উত্থাপন করিলে প্রতিরক্ষা সচিব লবীতে বলেন, "উত্তর আপনার উদ্দেশ্যের সহায়ক হইবে না ; প্রশ্নটি প্রত্যাহার করুন।" তিনি বোধহয় লক্ষ্য করেন নাই যে আমি প্রশ্ন রীতিসম্মতভাবে উত্থাপন করি নাই। প্রতিরক্ষা সচিব যে উত্তর দিলেন তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে লজ্জাজনক।

কারবারে ব্যাঙ্ক-ফেলকারক নেতার ভ্রাতুষ্পুত্রই এই রেজিমেন্টের একজন অফিসার ছিলেন। পরে তিনি মিশরে কমাণ্ডার সাহেবের সোফার হন। ঐ সময় হাইকোর্টে ব্যাঙ্কের মোকদ্দমায় তাঁহার নামে সমন যায়। উপস্থিত না হওয়ায় জজ ফ্লেচার সাহেব বলিয়াছিলেন, "He must attend this court. I don't care for whom he drives a car."। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে উপস্থিত করানো যায় নাই। অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, ইন্‌ডিসিপ্লিন বাঙ্গালীর মজ্জাগত দোষ—সমাজে রাজনীতিতে তাহা জাজ্বল্যমান। কিন্তু ৫০/১০০ বৎসর পূর্বে এরূপ ছিল না।

বিশ্বযুদ্ধে বাঙ্গালী Air-force নাম করিয়াছে সত্য, এবং সাঁজোয়া বাহিনীর একজন, ফোর্ট উইলিয়মে সেনাপতিও হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে সুবিধা হওয়ার কথা।

আমার একটি নমশূদ্র প্রজা, বেঙ্গল রেজিমেন্টে যায়। পরে ইহাকে সকলে

পালোয়ান বলিত। মাঝে মাঝে শারীরিক শক্তির পরীক্ষা দেখাইত। ইহার খাদ্য ছিল সাধারণের মত—ডালভাত। তবে নিত্য তেঁতুলগুড় খাইত। বাড়ী ভবানীপুর, নাম ভগীরথ। শ্রীহট্ট খাজাঞ্চি-বাড়ীর জামাতা রায় বাহাদুর নগেন্দ্র চৌধুরীর একই গ্রামের। তিনিই সৈন্যদলে ভর্তি করেন।

আফিসের সময়

শাস্ত্রের নির্দেশ—সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘুম হইতে উঠিবে। প্রাতঃস্নান করিয়া কাজে লাগিবে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। আহারের পর বিশ্রামান্তে বিকালে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে। জমিদারী সেরাস্তার এই নিয়ম—গরম দেশের উপযোগী ব্যবস্থা। শীতের দেশে ৭টার পূর্বে ঘরের বাহির হওয়া দায়। তজ্জন্য ইংরাজ উঠে ৮টায়—কাজে বাহির হয় ৯টায়, দ্বিপ্রহরে আফিসে খায় এবং কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পূর্বে। Rise with the lark অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে—ইহা তাহাদের গ্রীষ্মকালীন কবির বর্ণনা। আমাদের শাস্ত্র ব্যবস্থা ও ইংরাজ প্রচারিত এ দেশের ব্যবস্থায় এই জন্যই পার্থক্য। শীতের দরুণ উহাদের উঠা দেরীতে।

আমরা এখন গরমে সহরে ৭টায় উঠি—ঝি, চাকর, মজুর ছাড়া। হিন্দুরা বাড়ীতে আহার করিত। এখন অফিসার, কারবারী, অফিসে খায়। আমরা দুপুরে আহারের পর গড়াগড়ি করিতাম। শীতের দেশে দরকার হয় না। কিন্তু মেমসাহেবরা কলিকাতায় siesta নিতেন।

ইংরেজ আমলের বাধ্যতামূলক অনুকরণে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। আফিসে খাওয়ার ব্যয় বাড়িয়াছে, পরিবারে রান্নার দরকার নাই। অবসর সময়ও কমিতেছে!

৬টায় শয্যাত্যাগ করিয়া ৭টায় অফিস—১টা পর্যন্ত—তৎপর ছুটি—পারিবারিক কাজ ও বিশ্রাম; আমোদ-প্রমোদ গৃহে ব্যবস্থা করিলে ক্ষতি কি? ইংরাজ নাই, আমরা স্বেচ্ছাধীন ব্যবস্থা করিতে পারি। সেই যে গল্প আছে, বহুকাল দড়িতে বাঁধা গরুকে ছাড়িয়া দিলেও নড়ে না; সে বোঝেই না যে দড়ি খুলিয়াছে।

লীগ সরকারের আমলে বোধহয় কমিটি হইয়াছিল আফিসের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্য। ইহা চাপা পড়িয়াছে কেন? দূর হইতে আগত নিত্যযাত্রী ভোর ৫টায় উঠিবেন যেমন গ্রামে সাধারণ ক্ষেতমজুর উঠে।

পরিবর্তন হইলেই কুঁড়েরা আপত্তি করে। সিলেটে যখন মহিলা কলেজ ৬-৩০-এ করা হয় বহু অভিভাবক আপত্তি করিয়াছিলেন যে সকালের রান্নায় মেয়ে যোগ দিতে পায় না। কিন্তু ১১টা হইতে মেয়ের পুরা ছুটি, তাহাতে সুবিধা অনেক বেশী। প্রাতঃকাল নাকি বাড়ীতে পড়িবার সময়। কলেজে কি পড়া হয় না?

মাদক দ্রব্য নিষেধ

টেম্পারেন্স অর্থ মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া সঙ্কীর্ণ করার চেষ্টা। ধর্মপ্রচারে মাদক দ্রব্য যে দুর্নীতি ও দারিদ্র্যের কারণ তাহা বুঝাইয়া দিতে হয়। নিবারণ জবরদস্তি।

১৯০০ ইংরাজীতে পাদ্রী ও ব্রাহ্ম মহলে টেম্পারেন্স আন্দোলন ছিল। ইতঃপূর্বে কলিকাতার ধনীমহলে মদ ও বেশ্যার প্রসার ছিল। গ্রামে শাক্ত পরিবারগুলিতে পার্বণে মদের স্রোত বহিত। কেশব সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মদের প্রভাবে ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে মদ্যপান খুব হ্রাস পায়। দরিদ্র বাঙালী কখনও মদ্যপান করিত না। চা-বাগানে হিন্দুস্থানী মজুর মদ্যপ ছিল, এখনও আছে। সাপ্তাহিক বেতন প্রাপ্তির পরদিন অনেকে অনুপস্থিত থাকে। মিল মজদুরদেরও এই অবস্থা। সাম্যবাদী মজদুর নেতৃবৃন্দ ইহার প্রতিকার চেষ্টা করেন নাই বা পারিতেছেন না। অপর দিকে বিলাতফেরৎ মহলে, ডিনারে মদের প্রচলন ছিল—এখনও আছে। বিলেতফেরতাদল, শিক্ষিত ও ধনী ব্যবসায়ী মহলে মিশিয়া যাওয়ার ফলে বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় হইতে আমেরিকান সৈনিকদের সংস্পর্শে মদ্য ব্যবহার দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। এমন কি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রাজপুরুষ মহলেও। এই সমাজে মিশি নাই--প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দিতে পারিব না--তবে ক্লারেট ইত্যাদি সাদা মদ্য নাকি অবশ্য ব্যবহার্য। কংগ্রেসী আইনে সাদা মদ্য গর্হিত কিনা জানি না তবে গান্ধীর অন্তরঙ্গ কয়েকজন যে লাল মদ্যপ তাহা জানি।

কংগ্রেস "নিবারণে"র ভণ্ডামী পরিত্যাগ করুন। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। মদ্যপানের সহিত যৌননীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমরা কলেজে পাঠ করার সময়, বাঙলার এক ছোটলাট ডিনারে মাতাল হইয়া কোনও "বউরাণীকে" জাপটাইয়া ধরায় পরদিনই চাকুরী ছাড়িয়া দেশে পালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত হয়—সাহেবের পুত্র বিলাতে হঠাৎ পাগল হওয়ায় তিনি দেশে গিয়াছেন। সভ্য (?) দেশের অনুকরণে এবং অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা দানে মদ্যপান কমিবে না। আমেরিকা মদ্য নিবারণের চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। Pussyfoot জনসন ব্যর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনদের অস্পৃশ্যতা যদি কুসংস্কার হয় তবে অন্ধ গুরুভক্তিতেও নিবারণ আইন প্রচলনে দেশের অর্থ অপব্যয় করান অবশ্যই কুসংস্কার।

আসামে ১৯২০-তে ফণীধর চালিহা মাদক শুল্ককে tainted money (কলুষিত অর্থ) বলায় লাট চটিয়াছিলেন। ফণীধরের পুত্র কুলধর অহিফেনের ব্যবহার নিবারণে বহু প্রয়াস পাইয়াছেন এবং বৎসর বৎসর আসাম কাউন্সিলে অহিফেন নিয়া আলোচনা হইতেছে। ত্রিশবৎসর পরও খবরের

কাগজে দেখিতেছি, আফিংখোরের পারমিট আছে এবং বে-আইনী আফিংও চলিতেছে। পূর্বে বেশ্যা ভিন্ন কোনো বাঙালী নারী মদ্যপান করিত না। এখন বিশ্বস্তসূত্রে জানি কোনো কোনো ভদ্রনারী মদ্যপান করেন। পাপ সৃষ্টি হইবে, কখনও লোপ পাইবে না। সমাজ নেতারা পাপ সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করিবেন নতুবা তাহা অল্পবিস্তর সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িবে—এখন যেমন হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্র বেশ্যাকেও সমাজে একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়াছে। কলিকাতায় যদিচ এখন বেশ্যাপল্লী বড় দৃষ্ট হয় না (১৯০০-তে প্রত্যেক পাড়ায়ই কিছু কিছু দেখা যাইত) কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি কমে নাই গোপনে চলিতেছে এবং পরিতাপের বিষয়, ভদ্রমহলে![৪] নারীর অবাধ গতিবিধি এবং ভদ্রশ্রেণীর দারিদ্র্যই বেশ্যাবৃত্তি বাড়িবার অন্যতম কারণ। বাঙলা সাহিত্যে সতীত্বকে গোলামী বলা হইতেছে। পরিবারই সতীত্বের কেল্লা। কলকারখানায় পরিবার ভাঙিতেছে। মিল অঞ্চলে মজদুর-মজদুরনীর কথা নাই বলিলাম।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সব হোটেলে 'বার' আছে। যুদ্ধের পূর্বে সিলেটে ভদ্র বা সাধারণ মুসলমান সমাজে মদ্যপান অতি বিরল ছিল। সাধারণ হিন্দু, মুসলমান ও সাধুদের মধ্যে গাঁজার বেশ প্রসার। আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পচাই মদ বন্ধ করার প্রস্তাবে সরকারী সদস্য ওয়েবস্টার বলিয়াছিলেন "ইহা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে প্রস্তাবক ব্রজেন্দ্রবাবুকে পাঠাইতে পারি কিন্তু নরহত্যার দায় আমরা নিব না।"

একটি গল্পে বলিয়াছিলেন—মদ খাওয়ার জন্য একজনকে পুলিশে ধরিলে সে বলে "I have drunk but I am not drunk."

পানাসক্তির দরুণ সাহেব রাজপুরুষগণ লম্বা মাহিনা সত্ত্বেও টাকা পয়সা বড় একটা জমাইতে পারেন নাই। লী কমিশনের নিকট তাহারা—'বেতনে কুলায় না, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নাই'—বলিয়া কান্না ধরিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সিভিলিয়ান জে. এন. গুপ্ত মহাশয়ও। গুপ্ত মহাশয় বায়না ধরেন—কলিকাতা বা সন্নিকটে থাকিলে কলিকাতার ধনীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া না থাকিলে মান থাকে না! এখনও বোধহয় এই অবস্থা।

নূতন, কালা মিলিটারী অফিসারদেরও অবস্থা ভাল হওয়ার কথা নহে। কার্ডস্ (জুয়া) উইমেন ও ওয়াইন মিলিটারীতে প্রবাদবাক্য। জাঁদরেল কারিয়াপ্পা "মদ খাইবে না"—বলিতেছেন বটে—ফল কতদূর হইবে? রাজা যুধিষ্ঠিরেরও পানাসক্তি, পাশাসক্তি ছিল। রাজারা বহু নারী রাখিতেন। রাজা বা রাজপুরুষরা ক্ষত্রিয় ; ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী আশা করা যায় না।

ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা

হিন্দু সভ্যতার সমাজ, "একের ভিতরে বহু।" কিন্তু কলেজে পড়িয়াছিলাম, এক ভাষা, এক রক্তই জাতীয়তার মূল উপাদান। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ১৯২০ সাল হইতে শ্রীহট্ট-কাছাড়কে আসাম হইতে বিচ্যুতির চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্যতার দ্বারে পঁহুছিয়াও কিরূপ বিফল মনোরথ হইয়া হটিয়া আসিয়াছি, তাহা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। ভাষাগত ঐক্যের ধূয়া তুলে মণ্টেগু রিপোর্ট।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ভূগোল পরিবর্তন এখন আর শাসন সৌকর্যার্থে ভূমির অদল বদলের প্রাদেশিক ব্যাপার নহে। ভারতীয়রা যদি এক জাতি হয় তবে তার ভিতরে আবার বাঙ্গালী বিহারী জাতিভেদ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীকার্য হইলে তাহা হিন্দুর জাতিভেদ অপেক্ষাও অধিক বিরোধের জনক হইবে। প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্রীয় বিষয়ে, টাকা পয়সার বিষয়ে, হিন্দু মুসলমান ধর্মের পার্থক্য কিম্বা ব্রাহ্মণ শূদ্র সংস্কারের (কৃষ্টির) পার্থক্য স্বীকার করে নাই। ভাষার পার্থক্য রাষ্ট্র স্বীকার করিলে ধর্মের পার্থক্যে পাকিস্তান সৃষ্টিতেই বা কেন ভারত আপত্তি করিয়াছিল? গুর্খা লীগের দাবীর কথাই বা কেন জহরলাল কানেও তুলিতে চাহেন না?

পাকিস্তানীরা হিসাবী। একমাত্র ধর্মকেই জাতীয়তার ভিত্তি করিয়াছে। ভাষার বালাই নাই। মুসলমান, কে বাঙ্গালী কে বিহারী বলিয়া আত্মজাহির করে না। ইসলামই ভ্রাতৃত্বের একমাত্র বন্ধন।

প্রকৃতই যদি ভারত একটা জাতি বা নেশন হইত তবে রাষ্ট্রভাষা প্রচারের ঐকান্তিক চেষ্টার কি প্রয়োজন ছিল? কেন্দ্রীয় সরকারী কাগজপত্র যে ভাষায়, তাহাই লোকে নিজ গরজে শিখিত। কর্ণধারগণ বেশ অনুভব করিতেছেন, ভারত এক জাতি হয় নাই। সমগ্র দেশ হিন্দী ভাষাভাষী হইলে তবে ভাষার দিকে জাতির বন্ধন দৃঢ় হয়। প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতির পোষকতা এবং রাষ্ট্রভাষার পোষকতা যেন জামাইয়ের মা—কন্যার মা—বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী—ইহারা এক হইতে পারে না।

যে সকল মারওয়াড়ী স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করে, তাহাদের বাঙ্গালীর সঙ্গে বাংলাভাষায় কথা বলা উচিত। কিন্তু অনেকে হিন্দী বলে। অথচ নিজেদের মধ্যেও এদের বাংলায় কথা বলিতে শুনি। ইহা কি রাষ্ট্রভাষার আভিজাত্য? প্রত্যেক রাজ্যে সেই রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা সেই দেশের ভাষায় বলা উচিত। হিন্দী আমরা ব্যবহার করি ইংরাজদের অনুকরণে। ইংরাজেরা ভারতীয় সকল প্রদেশবাসীর সহিত হিন্দী কথা বলিত। আসামের সহরে, বাঙ্গালীরা অসমীয়া শিক্ষিতদের সঙ্গে কখনও বাংলা কখনও অসমীয়া বলে।

কারণ এক সময়ে অসমীয়ারা বাংলার অনুকরণ করিত, এখনও করে, যদিচ স্বীকার করে না। ইঁহারা অনেকে আমার অপেক্ষা বাংলা সাহিত্যের সহিত বেশী পরিচিত। নেতা নবীন বড়দলৈ আমাদের বৈঠকে বাংলা সাহিত্য, বিশেষ-ভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন আবৃত্তি করিতেন, তখন লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিতাম। ইঁহারা কেহ কেহ ঠাকুরবাড়ীতে বিবাহ করিয়াছেন। এখনও অসমীয়ারা বাঙ্গালী বিবাহের জন্য লালায়িত। ইহা বাঙ্গালীর সুখের ও গৌরবের বিষয়। অধুনা আন্তঃ প্রাদেশিক বিবাহ হইতেছে,—ইহা যুগধর্মের ফল। শিক্ষিত বাঙ্গালী যদি জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া চল্লিশ বৎসর পূর্ব হইতে অসমীয়াদের সহিত সম্বন্ধ করিত, তবে অসমীয়া কি বাঙ্গালী এই প্রশ্ন থাকিত না। আসাম হইত আসাম-বঙ্গ যুক্তপ্রদেশ। ডায়ার্কির আমলে আসামের অর্ধেক লোক ছিল বাঙ্গালী এবং স্কুল ইত্যাদিও ছিল অধিকাংশ বাঙ্গালীর। এই দাবী বাঙ্গালী চিরকাল করিয়াছে। ইহা ন্যায্য। কিন্তু কর্ণেল গার্ডিয়ান-এর প্ররোচনা—(অসমীয়া ভাষা পৃথক এবং আসাম পৃথক জাতি) উদ্ভূত নব অসমীয়া জাতীয়তাবাদ প্রবল, ইহা জানিয়াই শ্রীহট্ট-কাছাড় বঙ্গ-ভুক্তির প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আসাম যে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী প্রচারে অগ্রণী—তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে চাপা দেওয়া। কলিকাতার ব্যবসায়ী বাবু বৈজনাথ বাজোরিয়া দিল্লী এসেম্‌ব্লিতে বলিতেন, "আমি বাঙলার স্থায়ী বাসিন্দা, বাঙ্গালী, বাংলাতেই সাধারণতঃ কথা বলি।" সিলেটের মারওয়াড়ীরা অপরের সহিত বাংলাতেই কথা বলে। কলিকাতায় দেখি এর ব্যতিক্রম। বাঙ্গালীর আভিজাত্যের বাড়াবাড়ি আছে। মেসের ছাত্ররা 'উড়ে' চাকরকে অবজ্ঞা ও ঠাট্টা করিত। পথ দেখান স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র!

পরকে আপন করিতে হইলে কোলে টানিতে হয়। দূরে ঠেলিলে চলিবে না। পরকে সম্পূর্ণ আপন করা যায় রক্ত মিশ্রণে, সাদী-সম্বন্ধে। প্রাচীন শাস্ত্রকার অনার্যদের আপন করিয়াছিলেন সমাজে স্থান দিয়া। আমেরিকার সাদার মত রেড ইণ্ডিয়ানদের নির্মূল করেন নাই। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ আত্মরক্ষার্থে, অন্ত্যজ করিয়া নবাগত অনার্যদের দূরে ঠেলেন। তারই ঠেলা আমরা ভোগ করিয়াছি। আর্য-সাম্রাজ্য বিস্তারকালে প্রায় অসভ্য, দুর্নীতি-গ্রস্ত, দুর্দান্ত অন্ত্যজদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বোধহয় ব্রাহ্মণেরা ভীত হন। মনু-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন গ্রহণের ও শূদ্রপত্নী গ্রহণেরও ব্যবস্থা আছে। বিবাহে ভাষাগত কোনও নিষেধ নাই। বিজিতের সমর্থ পুরুষদের নির্মূল করিয়া তাহাদের স্ত্রী গ্রহণ জৈব ধর্ম। পশুপক্ষীর মত, মানুষও তাহাই করিয়াছে। সুবিধা পাইলেই এখনও করে। বিগত দাঙ্গায় কি আমরা এই জৈব প্রবৃত্তি লক্ষ্য করি নাই? সভ্যতার শত আবরণেও মানুষ জীব। **Civilisation is skin-deep and sits lightly on us.**

ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী

১৯০২ ইংরাজীতে সুরেন্দ্র বন্দ্যোর বড় জামাতা কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আই. এম. এস. "A Dying Race" নামে ছোট পুস্তক লিখেন। তিনি অনেক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেন যে মুরগী, ডিম, পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া এবং তৎসহ পারস্পরিক সাহায্যে বৈঠকখানা অঞ্চলের দফতরীরা এবং কারিগর শ্রেণীর মুসলমান দ্রুত বাড়িতেছে। কিন্তু নবশাখ সংখ্যায় কমিতেছে।

এই বহি এখন মিলে না। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিলাম। ১৯০০ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত আদমসুমারি (লোকগণনা) পর্যালোচনায় দেখিয়াছি, নাপিত, কর্মকার, ছুতার, মুচি এবং সিলেটে নমশূদ্র, নাথরা কমিতেছে। দক্ষিণ-বঙ্গে নাকি নাথ ও নমশূদ্র উন্নতির পথে। প্রফুল্ল সরকার, 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' পুস্তকে, জাতিভেদই এই ক্ষয়ের মূল কারণ ধরিয়া নিয়াছেন। কায়স্থ বৈদ্যের কিন্তু উন্নতি হইতেছে মুসলমানের সহিত পাল্লা দিয়া। ব্রাহ্মণও খুব বাড়িতেছেন অবশ্য দরিদ্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ বাদে।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ বাঙালী অর্থনীতিক বিগত অর্ধশতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের লোকবৃদ্ধির কারণ হিসাবে, পতিত ভূমিতে মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপনকেই নির্দেশ করেন। জমি বেশী এবং উর্বরা। ইহারা তেজী, পরিশ্রমী। নূতন পরিবেশে ভাল খাইয়া ইহারা বাড়ে। তদুপরি বোধহয় ইসলামের শিক্ষা, প্রত্যেকে বিবাহ করিয়া কর্তব্যবোধে ঘরসংসার করিবে—এই চিন্তাধারার প্রভাব আছে। বলিবে "আল্লার হুকুমে পারি"—কথায় বেজায় জোর। হিন্দু কিন্তু দোমনা। কোনও রকমে সংসারটা কাটাইয়া গেলেই হইল। প্রাচীন হিন্দু মনুর শিক্ষা কিন্তু ইসলামের অনুরূপ। বিষয়ী ৪৮ বৎসর পর্যন্ত বিপত্নীক হইলেও পুনরায় বিবাহ করিবে ; বৈশ্য লোভী হইবে, ক্ষত্রিয় তেজী হইবে। বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া গেরুয়াধারীরাই বিষয়ী হিন্দুর চিন্তাধারায় গোল পাকাইয়াছে! অতি দরিদ্র প্রসব করে বেশী, কিন্তু দুর্বল বলিয়া আবার মৃত্যু সংখ্যাও বেশী। ভারতের জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই বেশী। মধ্যবিত্তই বাড়ে বেশী। অতি ধনী, বিলাসিতার পাপে বাড়ে না। অনেকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। জাতিভেদের দরুণ নীচ জাতি মনমরা (depressed) হয় সত্য ; কিন্তু ইহা অনেকটা ধনবৈষম্যজনিত। অর্থ-শালী হইলে ইহারা উদ্ধত-স্বভাব হয়,—মনমরা থাকে না।

১৮৯২-তে সিলেটে দেখিয়াছি, মুটিয়া, জাহাজ গোদামে পশ্চিমা হিন্দু, বাজারে বাঙালী হিন্দু। ১৯৪৫-এ বাজার মুটিয়া প্রায় সবই মুসলমান। গ্রামেও ঐ অবস্থা। বাঙালী হিন্দু ছোটবড় সকলেই পরিশ্রমকাতর ; কষ্ট-সহিষ্ণু নয়। দুর্বলের বল ধূর্তামি দ্বারা কাজ সারিতে চায়।

নমশূদ্র, পাটনী এবং কতিপয় নবশাখ জাতিতে কন্যাপণ প্রথা আছে। মনে পড়ে, চা-বাগানের এক পশ্চিমাসর্দার সারদা আইন সম্বন্ধে আমাদের বলিয়াছিল "মেয়ের নয় বৎসর হইলেই বিবাহ দিয়া ৭০০ টাকা পাই। চৌদ্দ বৎসর অপেক্ষা করিলে এর মধ্যে মেয়ে যদি মরিয়া যায়?"

কন্যাপণ সময়ে জোগাড় করিতে না পারার দরুণ অনেক পুরুষ ৪৮।৪৯ বছর বয়েসে বিবাহ করে। অল্পদিন পরে পরমায়ু শেষ হইলে একটি বালবিধবা রাখিয়া যায়। ফলে দুর্নীতি বাড়ে এবং পাড়াপড়শী যুবকদের বিবাহ, তথা কন্যাপণ জমানোর তাগিদ, কমিয়া যায়।

কয়েকটি গ্রামে নমশূদ্রদের ভিতর অনুসন্ধান করিয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্রামে চব্বিশ ঘর নমশূদ্র—সধবা স্ত্রীলোক মাত্র সাত আট জন। বিধবা গোটা কুড়ি। ইহারা সংখ্যায় কমিতেছে। বিধবাবিবাহ প্রচলনে কন্যাপণ হ্রাস পাইবে। আমার বাল্যকালে আমাদেরই প্রজা, তিন-চারটি নমশূদ্রাণীর 'সাঙ্গা' বিবাহ দেখিয়াছি। আমাদের মত ভদ্র হইবার জন্য, সাঙ্গাবিবাহ প্রথা নমশূদ্ররা ছাড়িয়া দিয়াছে।

দেবল ব্রাহ্মণদেরও কন্যাপণ দিতে হয়। ইহা কৌলীন্যের দাবী। কায়স্থ সমাজেও বছর পঞ্চাশ পূর্বে (১৯০০-০২) কন্যাপণ ছিল—প্রমাণ আছে। কন্যাপণ কতকটা কৌলীন্যের মূল্য, কতকটা বোধহয় জাতিবিশেষের নারীর সংখ্যাল্পতাজনিত। ইহার অঙ্ক অনুধাবন করিবার সুযোগ পাই নাই। বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানযোগ্য। গ্রামাঞ্চলে ইদানীং কন্যাপণ ও অধিক বয়সে বিবাহ কমিয়াছে মনে হয়।

গ্রামে মুসলমান চাষীর খাদ্য কিন্তু ভাত, একটি পেঁয়াজ বা একটি কাঠাল কোয়া বা এক টুকরা শুঁটকী পোড়া মাত্র। ইহারা অল্প খায়, চারবার। হিন্দু চাষী ভাত, সব্জী বা ডাল খায়। মধ্যে মধ্যে মাছ। খানবাহাদুর মফিদুর রহমান বলেন, নিত্য কাঁচা পিঁয়াজ খাইয়া মুসলমানের তেজ। হিন্দু চাষী তিন বার খায়। ঢাকা অঞ্চলে মুড়িমুড়কীর প্রচলন আছে। সচ্ছল অবস্থার মুসলমান চাষী, বাড়ীতে কুটুম্ব, অতিথি আসিলে মুরগী খায়। পশ্চিমা, বিহারী প্রভৃতি মুসলমান ও ভদ্র বাঙালী মুসলমান নিত্য মুরগী খায়। মুসলমানদের মধ্যে মাছের ব্যবহার কম। দেশবিভাগের পর সিলেট সহরের বাজারে মাছের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। সিলেটের প্রচুর মৎস্য যুদ্ধের পূর্বে শুঁটকী হইয়া আসাম ও চট্টগ্রামের পাহাড়ে এবং বর্মায় রপ্তানী হইত। শিলং-সিলেট রাস্তা হওয়ার পর তাজা মাছ শিলং যায়। পূর্বে স্টীমারে বরফ দিয়া, কতক বাংলার অন্যান্য জিলায় যাইত। পাহাড়ীরা তাজা মাছ না পাইয়া শুঁটকী ব্যবহার করে। সিলেটের সাধারণ হিন্দু এমন কি ভদ্রলোকও তাজা মাছের অভাবে শুঁটকী ব্যবহার করে। এতে ব্যয়ও কম। আমার প্রতিবেশী পূর্বকথিত

রায় মহাশয় ওরফে আনন্দ গুপ্ত প্রাতরাশে এক বাটি পচানো শুঁটকীর ঝোল খাইতেন। শুঁটকী দুই প্রকার। রোদে শুকানো শুঁটকীর গন্ধ কম এবং অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য। আর জালার ভিতর তেলের মধ্যে রাখিয়া জালা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিয়া পচানো শুঁটকী—ইহা স্বাদু কিন্তু বেশী দুর্গন্ধ ও গুরুপাক। তবে বর্মা ও চীনের নাপ্পির মত অত দুর্গন্ধ নয়। কলিকাতার হোটেল ভিন্ন, সহরে গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে মাংসের ব্যবহার ছিল কালে ভদ্রে, পুজাপার্বণে।

সহরের মধ্যবিত্ত পুরুষের বিবাহের বয়স এখন ৩৫—৪৫ বৎসর, কনের (?) ২৫—৩৫। প্রজননের সময় সংকীর্ণ। মহাভারত-প্রশংসিত তেরোটি এমন কি নয়টি সন্তানের জননী হইবারও সময় নাই! তদুপরি জন্মনিরোধের হিড়িক আছে। দুর্দান্ত তেজ ও সুপ্রজননশক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাৎস্যায়ন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী উভয়েই একমত।

এদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিতেছেন "The world belongs to the rougher races" ; মুসোলিনী বলিতেছেন "Militarism is the height of virtue."। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৯২২-২৩ ইংরাজী) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলবাসী আফ্রিদীরা ইংরাজ মহিলা মিস এলিসকে অপহরণ করিলে ক্রুদ্ধ ব্রিটিশসিংহ নির্মমভাবে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিয়া অবশেষে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। প্রজারক্ষণ রাজার ধর্ম। এই ধর্ম পালনে, প্রয়োজনবোধে তিনি নির্মম হইবেন। মহাভারতে, পুরাণে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। বিদেশে এক রাজপুত্রের হত্যা হইতে ১৯১৪ ইংরাজীর জার্মান যুদ্ধের সূত্রপাত। আজ কেবল এদেশে নয়, পৃথিবীর কোথাও প্রজারক্ষণে বিশেষ চেষ্টা হয় না। অতিসভ্য Over-refined জাতি ধ্বংসের মুখে। অন্যরূপে, অতি সভ্যশ্রেণীও ধ্বংসের মুখে। ডেমোক্রেসীর গতিই ইহার প্রমাণ। ধনবিলাসিতা যেমন দুর্বলতা, ভাববিলাসিতাও তদ্রূপ।

ভারতীয় সভ্যতা রজোগুণকে উচ্চাসন দিয়াছে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণের উচ্চে। তিনশত বৎসর পূর্বে একজন দুর্দান্ত সরদার একা একশত জনকে বাগ মানাইত। বড় বড় ডাকাতরা এখনও করে—তবে এদের সংখ্যা নগণ্য। অভাবের তাড়নায় হয় তো ডাকাতরা সংখ্যায় বাড়িয়া পরে ইহারাই সর্দার বনিয়া যাইবে। ১৯৩০-এ আফগানিস্তানের আমানুল্লার রাজত্ব যে রূপ বাচ্চাই সাকোর৬ হাতে গিয়াছিল সেরূপ জহরলালের তক্তও ডাকাত-সর্দারের হাতে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলিকাতা এখন রাজ্যের রাজধানী মাত্র। অন্য রাজ্যের লোক কিছু কিছু থাকিবে—বিচিত্র নয়। মাদ্রাজ বোম্বাই-এও আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত রাজধানী ও বন্দরের তুলনায় এখানে কারবারে, অফিসে, কারখানায়, বিদেশী অতিমাত্রায়

বেশী। ইহা বাঙালীর চারিত্রিক অবনতির প্রমাণ। স্বধর্ম শক্তিউপাসনা ছাড়িয়া বাঙালী, অহিংসা বা প্রেমবৃন্দাবনের মর্কট অনুকরণ করিতে গিয়া ব্যর্থপ্রয়াসে ভগ্নমন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে গ্রামে অজ্ঞ জনসাধারণ বিক্রমাদিত্যের নাম জানিত কিন্তু অশোক সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল।

সেদিন ব্যারাকপুরে গিয়া অনেক খোঁজ করিয়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী বাহির করি। একজন তো এক আধুনিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী দেখাইয়া দিল! আমরা সংবাদপত্রে রাষ্ট্রগুরু নাম দিয়াই শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করি। জাতির জনক গান্ধীর স্মৃতি গান্ধীঘাট নিকটেই। একটা ভালো ঘাট—সদাসর্বদা লোক যায় গঙ্গাস্নান করিতে। সেদিন গণেশ চতুর্থী ; গণেশ ভাসান দেখিলাম। খোলা বাগানে হাওয়া খাইতেও যায়। রাজ্যপ্রধানকে দরবারী সহ বৎসরে একদিন লোকদেখানো শ্রদ্ধা দেখাইতে হয়।

বাংলার কংগ্রেসের দলাদলির সময় স্বার্থসিদ্ধির মতলবে দেশবন্ধুর নাম বছর দশেক লওয়া হইয়াছে। গান্ধীর নাম তিন বৎসরে লোপ পাইয়াছে প্রায়। সরকারী রেডিও রামধুনকে আধমরা অবস্থায় জিয়াইয়া রাখিয়াছে। সর্বহারা বাস্তুত্যাগীদের জন্য নির্মিত হইতেছে 'গান্ধীগ্রাম'। রাষ্ট্রগুরুকে আমরা ভুলিয়াছি—নামটিও প্রায় ভুলিয়াছি। তাঁর বাড়ীটিতে নিচের তলায় পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-এর অফিস। দ্বিতলে কয়েকটি পরিবার বাস করে, বোধহয় রিফিউজি। গঙ্গার উপর বৃহৎ বাগানবাড়ীটি পঞ্চাশ বৎসরের পুরানো হইলেও বেশ সুদৃঢ়। বাঙালী ইচ্ছা করিলেই এই বাড়ীটিকে একটি সুন্দর পাবলিক ইনস্টিটিউশনে পরিণত করিতে পারে। সে দিকে চেষ্টা নাই। পতিত জাতির ছোট মন। ময়দান হইতে ইংরাজ রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন সরাইতে ব্যস্ত। সুভাষবাবু যে অন্ধকূপ (ব্ল্যাকহোল) স্মৃতিস্তম্ভ সরাইবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন সে ছিল নবাবের উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের বিরুদ্ধে।

ইংরাজ কিন্তু দিল্লীতে পৃথ্বীরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর সাত সাম্রাজ্যের চিহ্ন রাখিয়াছে। রাজা বাদশাদের নামে রাস্তার নামকরণ করিয়াছে।

ভারত যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন ময়দানে ইংরাজ মূর্তিগুলি ছিল আমাদের লজ্জার বিষয়। স্বাধীন হওয়ার ফলে সেই লজ্জাই এখন আমাদের গৌরবের বিষয় যে ইংরাজকে আমরা বিতাড়িত করিয়াছি। মূর্তিগুলির প্রতিপক্ষে গান্ধী চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির মূর্তি বানাইয়া দিলে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য আছেন তবে একটু দূরে। ব্যূঢ়োরস্ক (বিশাল বক্ষবিশিষ্ট) বৃষস্কন্ধ (ষাঁড়ের মত সবল কাঁধ) সুরেন্দ্রনাথের তুলনায় গান্ধী যেন তপোক্লিষ্ট বামন।

শাক্তযুগে, বৈষ্ণবযুগে ভাবের বন্যায় বাঙালী-হিন্দু, মুসলমান রাজত্বে উন্নতি করিয়াছিল। ব্রাহ্মযুগে কেশব সেন কিছু ভাবের বন্যা বহাইয়াছিলেন।

স্বদেশী যুগে ভাবের বন্যায় বাঙলী চরিত্র আবার উন্নত হয়। পরবর্তী ত্রিশ বৎসর গান্ধী-রবীন্দ্রযুগ ; অহিংসার বুলি আওড়াইয়া বাঙালী-চরিত্রের অবনতি হইয়াছে। ফলেন পরিচিয়তে। প্রমাণ আত্মকলহের অন্ধকার, চতুর্দিকে 'হা হতোস্মি'। বলবান, চরিত্রবান লোক আক্রান্ত হইলে 'হা হতোস্মি' করে না, প্রবল প্রতিঘাত করে। অসমীয়া চরিত্র বরং এখন বাঙালী অপেক্ষা উন্নত। বাঙালী এখন এক নম্বর চাটুকার। আগে কিন্তু উন্নতমস্তক ছিল : তজ্জন্য সাহেবেরা পছন্দ করিতেন না। লর্ড কার্জন এই উন্নত মস্তক নত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন ইংরাজের সহকারী ছিলেন, পাদুকা লেহন করেন নাই। সময় সময় গান্ধীকেও তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে—যেমন স্বরাজ্য দল গঠনের সময়। পরে আবার গান্ধী হাওয়া বুঝিয়া চিত্তরঞ্জনের দলেই যোগ দেন। বেনে বুদ্ধি!

সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবন আরম্ভ হয় ১৮৯০-এর পূর্বে। কেশব সেনের প্রভাবে তখন নব্যশিক্ষিতরা মদ ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই Temperance প্রচার করিতেন। সাধারণ সভায়ও সুরেন্দ্রনাথ চায়ের প্রশংসায় বলিতেন "The cup that cheers but doesnot inebriate".—কথাটা তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। গান্ধী-রবীন্দ্রযুগের শেষে, বাঙালী নব্য শিক্ষিতের ঝোঁক মদের দিকে। প্রাতঃস্মরণীয় নেতাদের শিক্ষার কি এই শেষ ফল? Temperance বক্তারা মদের পরিবর্তে চা খাইতে বলিতেন এবং বিলাতের অনুকরণে বোধহয় মিল অঞ্চলে চায়ের ক্যান্টীনও খুলেন। এখন কোনও Temperance Society-র সাড়াশব্দ পাই না। ক্ষুদ্র বিষয় নিয়া এখন নেতারা মাথা ঘামান না—তাঁহারা 'বিরাট প্রহিবিশন' ভিন্ন কিছু শুনিতে চাহেন না। জানি না মাতালদের বংশবৃদ্ধি না বংশলোপ, কোনটা হয়। যদি লোপই হয় তবে মদ এক প্রকার বার্থ কন্ট্রোল বলা যাইতে পারে। জন্মনিরোধের যুক্তি --গরীবের বহু সন্তান হইলে খাইবে কি? প্রায় নিরন্ন গরীবের বহু সন্তান সকলে এখন কৃতকর্মা অপর পক্ষে বহু ধনীর একমাত্র সন্তান প্রায় নিরন্ন— এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মজার কথা, বিলাসী ধনীই বার্থ কন্ট্রোল করিতেছে। বহু ব্যয়ে ছেলেকে বিলাত না পাঠাইলে না কি মানুষ হয় না—আসামের এস. দাশগুপ্ত ইন্‌সপেকটর অব স্কুল এই যুক্তি দিয়াছিলেন। ১৯০২-এ উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উল্লিখিত A Dying Race পুস্তকে, বাঙালীর শারীরিক অবনতি এবং সংখ্যার ক্রমাবনতির আলোচনা করিয়াছেন। আয়ু বস্তুত আত্মার ভাইটালিটি (জীবনীশক্তি)—ডাক্তারী শাস্ত্রের বাহিরে। আত্মা যতদিন সুস্থ থাকে শরীর মরে না। সুশ্রুত বলিয়াছেন রোগীর আত্মা, ধাতু, বায়ু-পিত্ত-কফাশ্রিত ; ধাতু না জানিলে শরীরের চিকিৎসা হয় না।" আমাদের আত্মা মরিতেছে আগে হইতেই। ভাবমানসই আত্মা। কেশব

সেনের যুগে, স্বদেশী যুগে ভাব উন্নত হইয়া কর্মশক্তি বাড়িয়াছিল। কর্মই শক্তিপূজা। শক্তিপূজা আসিতেছে—আমোদ-প্রমোদ, সাজসজ্জা, জামাকাপড় জুতা কেনার কথাই শুনিতেছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূজা ছিল বিভবীর আনন্দময়ীর পূজা আর আমাদের পূজা দুর্গতের রক্ষাকালী পূজা। কর্ম-শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। দুর্গতি আমাদের অবলা বা ক্লীব করিয়াছে, ক্ষোভও জন্মে নাই। বাড়ীতে ঘট বা পটের সামনে বা বারোয়ারীতে মণ্ডপের এক প্রান্তে জনকোলাহল ভুলিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে পার—চক্ষে ধারা বহে, শরীরে কম্পন হয়। ইহাতে কি হইবে? মাতার দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ছেলে রাম-প্রসাদের মত যদি মাকে গালি দিতে পার "পাষাণী, পাষাণের মেয়ে"—তবে জানিব তোমার ক্রোধ হইয়াছে। উহা মার উপর বা শত্রুর উপর নহে—নিজের দুর্বলতার উপর। অপরের উপর ক্রোধ নিষ্ফল। গান্ধীর খুব ক্রোধ ছিল। বলিতেন 'নিজের দুর্বলতায় গা কামড়াইতে ইচ্ছা হয়।' ক্রোধ ভিন্ন তেজ হয় না। ক্রোধ ও কর্মশক্তি এক কথা। অক্রোধ কর্মপরিত্যাগী সন্ন্যাসীর। গৃহস্থের অতিক্রোধ নিন্দনীয়, ক্রোধ নহে। ধর্মযুদ্ধে হিংসা বৈধ। ধর্মযুদ্ধ কি? আততায়ীর অন্যায়ের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা। বাঙালী হিন্দু সেই প্রয়োজনীয়, বৈধ হিংসা দেখাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে। গান্ধী পর্যন্ত বলিয়াছিলেন "তিন দিন ধরিয়া আক্রান্ত চাঁদপুর সহরে কি দুই হাজার যুবক ছিল না যাহারা লাঠির সাহায্যে ইহাদের উদ্ধার করিতে পারিত? দুর্বল হইবে না। আত্মার অপমান সহ্য করিবে না—হিংস অহিংস যে ভাবে হউক—প্রতিকার কর্তব্য।"

নোয়াখালীর হাঙ্গামার পর সিলেটের নানাস্থানে কালীপূজার উদ্যোগ করিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছি। পূজা হইয়াছে—কিন্তু কোনো শক্তির উন্মেষ হয় নাই। এমন কি হবিগঞ্জের পৈল গ্রামে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য মোক্তার, পূজা নিয়া দলাদলির সৃষ্টিও করিয়াছেন।

কলিকাতায় সহস্র কালচারাল ক্লাব সত্ত্বেও বাঙালীর আত্মা মৃত। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'—আমরাও আওড়াই! প্রতি মাসে একখানা করিয়া গীতার ভাষ্য প্রকাশিত হইত!! আমরা গীতাধর্মী নহি, গীতাবিলাসী! শেষ জীবনে গান্ধী বুঝিয়াছিলেন অহিংসা প্রচারে ক্লীবত্ব বাড়িয়াছে মাত্র। তাঁহার জীবনে শেষ বৎসরের কথাগুলি করুণ বিষাদগীতি (Doleful dirge)।

'বন্দেমাতরম্' বলি। এই মন্ত্র উচ্চারণে আমাদের চক্ষে কি দশপ্রহরণ-ধারিণী আবির্ভূতা হন? আমরা যে দেবী বর্ণনার কলিগুলি বাদ দিয়াছি! আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ কর; সমালোচনার চক্ষে নহে—ভক্তিভাবে, দীক্ষা নিবার জন্য। মহেন্দ্রের সেই শক্তি দর্শন—মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি

হইবেন—বুক্ষারূঢ়া শ্রী ও চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার—মূর্তি ডুবিল, আর কি উঠিবে?—ইহারা তোমাকে নাড়াইবে, জাগাইবে, তুমি মানুষ হইবে।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো, পরধর্মো ভয়াবহঃ। বাঙালী আর্যসভ্যতা গ্রহণ করিলেও পশ্চিমা হিন্দুস্থানী দেশোয়ালী হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। পশ্চিমই প্রকৃত ভারত। বাংলা ঠিক ভারত নহে। বাঙ্গালীর রক্তে ব্রাহ্মণের ও আর্যের রক্ত কম—খানিকটা দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় রক্ত। চরিত্রে ভাব প্রবল- অমিতাচারী। ভাব, পরিমাণের ধার ধারে না। কখনও অতি ক্রোধী, কখনও ভীতু ক্লীব, কখনও অতি দাতা। বর্তমানে সে নিদ্রিত। বিপদ বুঝে নাই।

আর্যসভ্যতা গ্রহণ করিয়াও বাঙালী বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছে—যেমন দায়ভাগে এবং মছলীখোর হইয়া। পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মাছ ছুঁইবে না। গান্ধীযুগে বাঙালী আলোর সন্ধানে পশ্চিম ভারতের দিকে চাহিয়াছিল—ইহাই পতনের কারণ। আত্মাদর চাই আমরাই সেরা জাতি—"God's chosen people"। অশোকের মিশন ব্যর্থ—চীন ব্রহ্মে কাটাকাটি। বুদ্ধও ব্যর্থ। 'আমার একটি বিশেষ মিশন আছে, এই জ্ঞান চাই। রোম, ইংল্যান্ড, হিটলারের মিশন ছিল। উপকার কি অপকার করিয়াছে তাহা আলোচ্য নহে। দেবাসুরের সংগ্রামই জগতসংসার। আমি বড় হইব, পৃথিবী জয় করিব—এই উচ্চাশা, বিদ্বেষ চাই। তবেই শক্তি আসিবে। মাগ-ছেলেপুলে খাওয়ানোই যার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, সে বড় হয় না।

বিপিন পাল বলিতেন "The preaching of absolute non-violence is itself violence"—কেহ আমরণ উপবাস করিয়া—কেহ বা খোলাখুলি গায়ের জোরে করেন। মুখে বলেন "উদ্দেশ্য প্রেম—অজ্ঞ নিজ স্বার্থ বুঝে না তাই জোর করিতে হয়"।

শাস্ত্রে সাম, দান, ভেদ সব নীতিরই সমর্থন আছে। আজ জহরলাল মুখে গান্ধীবাদী হইয়াও ত্রিনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যুবক সুভাষই বাঙালীর আত্মা। বৈজ্ঞানিক যুগের যুবকেরা আত্মাকে হারাইয়াছেন। গঙ্গা-তীরে দাঁড়াইয়া মা গঙ্গার সৌন্দর্য দেখে না, দেখে কলকারখানা, উড়ন্ত আকাশ-যান। ফলিত বিজ্ঞান 'দগ্ধউদরৈস্যার্থং' দরকার স্বীকার করি। কিন্তু আত্মা হারাইলে যে শেষে শরীরও টিকিবে না! কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিলাপ করিয়াছেন "A scientist botanising over his mothers' grave."

টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথের যন্ত্র-দৈত্যের বিরুদ্ধে অভিযান নিষ্ফল হইয়াছে।

বিমান যুগের প্রারম্ভ

১৯০০ ইংরাজীতে আমার গ্রামের লোকের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালী, মহাভারতে বর্ণিত প্রাচীন প্রণালী হইতে খুব পৃথক ছিল না। ১৯০০ হইতে ১৯৫২ পর্যন্ত যে ফারাক, তাহা কিন্তু—সভ্যজগত অনুমিত—

আদিযুগ-তাম্রযুগ হইতে ১৯০০ ইংরাজী পর্যন্ত জীবনযাত্রা প্রণালীর যে ফারাক, তার চেয়ে বেশী বলা চলে। বিমান (যাহার গতি ঘন্টায় ৫00 মাইল) ও পরমাণু বোমার ক্রমোন্নতির ফলে পৃথিবীর আর্থিক ও মানসিক সভ্যতার কি গতি হইবে কেহ বলিতে পারেন না। আর্থিক অপেক্ষা মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তনই ভয়াবহ, কারণ যে কোনও রকমেই হউক যে কোনও খাদ্যেই হউক মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। বন্য যুগের কাঁচা মাংস অপেক্ষা প্যারীর হোটেলের চর্ব্যচুষ্যলেহ্য যে বেশী সুস্বাদু, স্বীকার করি না। বোধহয় বন্যরা সুস্থ ও সবল থাকায় স্বাদগ্রহণ ক্ষমতা অধিক ছিল। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের ছাত্রাবস্থায় ব্লেরিয়ট ও রাইট ভাইদের বিমানে কলকব্জার সাহায্যে উড়িবার প্রয়াস। ১৯০০ ইংরাজীতে বাষ্পীয় শক্তিচালিত রেল কারখানার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়াও আমরা পরিবার কেন্দ্রিত ও ভগবৎ বিশ্বাসী সমাজ ছিলাম। ১৯৫১-তে পরিবার ও ভগবৎ বিশ্বাস দুইয়েরই অতি জীর্ণদশা—অতি দ্রুত লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখিতেছি। দ্রুত যাতায়াতের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সাজপোষাক, খাওয়াপরা, পারস্পরিক ব্যবহার, অর্থসর্বস্ব চিন্তাধারা একাকার ধারণ করিতেছে অতি দ্রুত। ১৯০০ ইংরাজীতে মেসে অসুখের পর ডাক্তারের ব্যবস্থামত লাল পাঁউরুটী হিন্দু দোকান হইতে আনাইয়া খাইয়াছি। গ্রেট ইষ্টার্ণের রুটী দুই একটি ছেলে খাইত। ইহাদের আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছি। মুরগীর ডিম খাওয়াও ম্লেচ্ছাচার গণ্য হইত। আজ কলিকাতার প্রত্যেক বাড়ীতে প্রাতরাশ, সকলের মুরগীর ডিম না হউক অন্ততঃ গ্রেট ইষ্টার্ণের চেয়ে সরস পাউরুটী। বিহারী ছাড়া বাঙালী কেহ বড় চিড়ামুড়ি খায় না। আত্মীয়-পরিবার অপেক্ষা ব্যবসায়ী বন্ধুদের সহিত অধিক অন্তরঙ্গতা। ১৯০২-তে বোধহয় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম। এখন ট্রামবাসের ভিড়ে পথে বাহির হওয়া দায়। দুই মাইলও কেহ হাঁটিয়া চলে না। এমন কি মুটেও চলে না। তৎপরিবর্তে রিকশা। সুবিধা হয়, যদি 'কন্ট্রাক্ট কেরিয়ার ট্রাক' বাড়ী হইতে মাল নিয়া যথাস্থানে পহুঁছাইয়া দেয়। এদিকে নূতন ব্যবসায়ের সুযোগ আছে। ১৯০০ ইংরাজীতে দক্ষিণের সাহেবপাড়া খুব পরিচ্ছন্ন ছিল, বাকী সব নোংরা। এখন উত্তর দক্ষিণ সবই প্রায় সমান—মধ্যম। "They are like levellers of Rome, not by increasing their own but by diminishing that of others."

ইহাই বোধহয় সর্বত্র বর্তমান সভ্যতার গতি। ছোটদের বাড়াইতে বড়দের ছোট করিয়া লাভ কি? সর্বমোট বাড়িল না। বড় বড় সহরগুলি—রাজধানী বা কারখানার সহরগুলি স্ফীত হইতেছে অসম্ভব দ্রুত। ১৯০০ ইংরাজীতে কলিকাতার লোকসংখ্যা বোধহয় ছিল মাত্র দশলক্ষ। সহরতলী গ্রামের মতনই ছিল, যদিচ মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। এখন খাস কলিকাতায়ই ২৪ লক্ষ লোক।

এই হার বাড়িতে থাকিবে। তবে হয় তো দ্রুতগতির কল্যাণে কলিকাতা হইতে একশ' মাইল অন্তর নূতন উপসহর গজাইবে যেখান হইতে বিমানে সহরের কেন্দ্রে আসিতে মাত্র অর্ধঘন্টা সময় লাগিবে। গঙ্গার দুই ধারে কলিকাতার পনেরো মাইল দূর পর্যন্ত সহরগুলিকে একটি সহরই বলা চলে। মধ্যে কোনও গ্রাম, মাঠ নাই। এগুলি বল্লালী কৌলীন্য সভ্যতার স্থাপিত দেবালয়পূর্ণ শাক্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের গ্রাম্য সমাজ ছিল। এখনও কিছু আছে, আর থাকিবে না এখনকার অজ পাড়াগাঁয়েও আর গ্রাম্যসমাজ থাকিবে না। নূতন সমাজ-কারখানা, আফিস, ক্লাব। গৃহগুলি রাত্রে শোবার স্থান মাত্র। আমাদের সময় ছাত্রেরা হাঁটিয়া তিন মাইল দূর হইতে স্কুলে আসিত। পনেরো মাইল দূর হইতে হাঁটিয়া গিয়া সদরে মামলা করিয়া লোক সেই দিনই বাড়ী ফিরিত। সিলেট হইতে ১৯০০ ইংরাজীতে কলিকাতা আসিতাম স্টীমারে, রেলে, দুই দিন দুই রাত্রে। সেদিন সিলেট গেলাম সাড়ে তিন ঘন্টায়। আগের 'দিন', এখন 'ঘন্টা'। এই হিসাবে মানুষের পরমায়ু বাড়িয়াছে দুই সহস্র বৎসর। নাতি বলিতেছে 'তোমাদের যুগে লোক কুঁড়ে ছিল'। এখন লোকের বিশ্রাম নাই। সকাল হইতে না হইতে বাহির হইবার আয়োজন। অফিস কারখানায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। তৎপর বাহিরে আমোদ-প্রমোদ। রাত্রে এগারোটায় বাড়ী ফিরিয়া শয়ন। প্রগতিশীল মেয়েদেরও তাই। পরিবার কোথায়? মৌলিক চিন্তা ও জীবনানন্দ উপভোগের স্থান কোথায়? রাত্রের আমোদ-প্রমোদ সময় কাটানর জন্য—উহা উপভোগ বিহীন। ১৯০০ হইতে পরিবারের ভিতর by the fireside ছিল নির্মল শান্তি, বাবুর বৈঠকখানার ফরাসে ছিল আমোদ-প্রমোদ। এখন ফরাসের স্থান অধিকার করিয়াছে হোটেলের সোফা ও সিনেমার চেয়ার।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতায় এক বীমা কোম্পানীর সভায় সম্প্রতি বক্তৃতা দিয়াছেন "প্রাচীন যুগের মন ও সভ্যতা চাই, প্রগতিশীল পরিবেশে।"

কিন্তু হ্যাট্‌কোট্‌ধারী, ডিনারভোজী তোতাপাখী কৃষ্ণনাম বলে না। ১৮৯০ হইতে ১৯০০-র দশকে সংস্কারপন্থীরা কতিপয় নামাবলীধারী পন্ডিতের রামপক্ষী ভোজন নিয়া ব্যঙ্গ করিতেন। ডক্টর সাহেব আর্থিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অনুকরণ করিতে বলিতেছেন। শরীর বিকাইলে মনও সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হইয়া যায় যে! তলোয়ার হাতে নিলেই যুদ্ধের প্রস্তুতি। জাব্বা-জোব্বা পাগড়ী পরিয়া রাজ দরবারে যাইতে হয় তাহা রাজদূত মহাশয় জানেন। সেক্সপীয়ার বলেন "The apparel oft proclaims the man."

আমি যখন খুব ছোট তখন আমাদের গ্রামে প্রথম পোস্ট-অফিস হয়। পোস্টমাস্টারের বেতন তিন টাকা। চিঠি সব বেয়ারিং; ডাকটিকিট ছিল না, মনিঅর্ডার ছিল না। ডাকে লুণ্ঠিত টাকা ফেরত দেওয়া হইত। বিগত যুদ্ধের

পূর্বে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা ছিল, যথা দুই হাজার টাকার নোট ইনসিওর চিঠিতে পাঠানো হইত। এখন এই সব সুবিধা নাই।

বাড়ীর বাস্তুভিটা সম্বন্ধে আগ্রহ, ধনীরও তেমন নাই। বর্তমানে নূতন বাড়ী নির্মাণের ব্যয়ের তুলনায় রেন্ট কন্ট্রোলে বাড়ীভাড়া কম, এও এই আগ্রহ-হীনতার একটা কারণ। মধ্যবিত্ত অনেকে কেবল জায়গা কিনিয়া রাখিতেছে।

Office jaunt (এক ঘোড়ার দুই চাকার গাড়ী) ও ধনীদের বৈকালিক ভ্রমণে জুড়ী ল্যাণ্ডো দেখা যাইত। ল্যাণ্ডোর জানালায় নীল রং-এর রেশমের পর্দা থাকিত। তখন বিলাতফেরতা ও ব্রাহ্ম ভিন্ন হিন্দু মহিলা সবই পর্দানশীন। এবার কিন্তু কলিকাতায় একটি মাত্র Office jaunt ও দুইটি মাত্র ছ্যাকরা গাড়ী চোখে পড়িয়াছে (১৯৫২-৫৩)। ছ্যাকরা গাড়ীর তিন শ্রেণী ছিল প্রথম শ্রেণী ফিটন, (Phaeton) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী পালকী গাড়ী, কিন্তু ঘোড়ার তারতম্য আছে গাড়ীও একটু ছোট বড়। ভাড়া বোধহয় মাইল প্রতি তৃতীয় শ্রেণী চারি আনা (২৫ নয়া পয়সা)। শিয়ালদহ হইতে তিন টাকায় কালীঘাট যাতায়াত করিত। ফিরিঙ্গীরা ফিটন ব্যবহার করিত। যুদ্ধের পূর্বে ট্যাক্সির ভাড়া প্রথম শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীর সমতুল্য ছিল। সময়, আরাম, পশু-ক্লেশনিবারণ সব দিক দিয়াই ট্যাক্সিকে উন্নত বলা চলে। চৌরঙ্গী হইতে খিদিরপুর ট্রাম ছিল বাষ্পীয়। ইঞ্জিন গাড়ী এত ছোট ছিল যে ড্রাইভার চোখেই পড়ে না। প্রথমে মনে হইত যেন ভৌতিক কাণ্ড, গাড়ী আপনিই চলিতেছে—ট্রামের ওভারহেড তারের কথা বিস্মরণ হইলে যেমন মনে হয়। মফঃস্বল হইতে নিত্য-যাত্রীদের সহরে আসার রেল ছিল, কিন্তু বাস ছিল না। কয়েক বৎসর পোর্ট কমিশনার বজবজ হইতে কুটিঘাট পর্যন্ত স্টীম ফেরী সার্ভিস খোলেন। হাওয়া খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে ফেরীতে বেড়াইতাম। লাভ না হওয়ায় উঠিয়া যায়। এরপর প্রাইভেট মোটর লঞ্চ সার্ভিস কিছুকাল চলে—তাহাও উঠিয়া গিয়াছে বোধহয় হাওড়ায় ট্রাম লাইন বিস্তারের ফলে। পাড়ায় মেয়েদের যাতা-য়াতের জন্য ছিল উড়ে বেহারার পাল্‌কী।

কাশ্মীরী শাল, বেনারসী শাড়ীর দোকান ছিল বড় বাজার মনোহর দাস কাটরার কাছে স্বর্ণময়ী কুঠীতে। এখনও আছে। মনোহর দাসের বংশধর শ্রীশ্রীপ্রকাশ মাদ্রাজে রাজ্যপাল। ইনি কাটরার একটা বড় অংশের মালিক।

ময়দানে মনোহর দাসের পুকুর আছে।

শ্রীহট্টিয়া বহু দোকান ছিল টিরিটি বাজারে। বেলেঘাটায় ছাতকের চূণের গুদাম, ধর্মতলায় চাঁদনীচকে সিলেটি মুসলমানদের স্টেশনারী দোকান এবং খিদিরপুরে সিলেটি মুসলমান খালাসীদের বসতি। কলিকাতা বন্দরে অর্ধেকের বেশী খালাসী সিলেটের। শ্রাদ্ধের গরু কিনিতে ইহাদের নিকট আমরা গিয়াছি। তিন চার বৎসরে ইহারা বেশ সঞ্চয় করিয়া দেশে গিয়া জমিজমা কিনিয়া জাঁক-

জমক করে। তিন চার বৎসর পর সর্বস্বান্ত হইয়া আবার জাহাজে যায়। দুই এক জন বিলাত হইতে মেম নিয়াও আসে। এই সব মেম কৃষকদের গৃহস্থালীর সব কাজ করে সুনিপুণভাবে, মায় গোবর ফেলা পর্যন্ত। ইহাদের টাকা ধার দেওয়া লাভজনক। গ্রামবাসী হিন্দু মহাজনরা টাকা ধার দেয়—যদিচ কোনো security নাই। Character is true credit. Adventurous spirit. Easy come easy go. পূর্ববঙ্গের নিঃস্ব মুসলমান চাষী সাহসী। ইহাদের অনেকে জাহাজে আসামে, বর্মায়, সিঙ্গাপুরে রোজগার করে; অনেকে বসতি স্থাপন করে। এরা আসামে না গেলে আসামের পূর্ত বিভাগ অচল হইবে। আসামের এক জিলাকর্তা বলিয়াছিলেন মৈমনসিংহিয়া না থাকিলে আসাম খাইতে পাইবে না। বাঙালী হিন্দু ও অসমীয়া এদের মত হয় না কেন? সমাজপতিরা এ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখেন না। কেবল বড়াই 'আমরা সভ্য'। পেনাং হইতে মুসলমানগণ কর্তৃক বন্যায় সাহায্য প্রেরণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

আজকাল মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী বিলাতে কারখানায় কাজ শিক্ষায় যাইতেছে। ভাল কথা। যৌনধর্মের বশে ইহারা যে মেম আনিবে তাহারা শাশুড়ীর মত সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিবে তো? মুসলমানের মেম কিন্তু সম্পূর্ণ মুসলমানী হইয়া যায়। ইদানীং সমাজে অবাধে গৃহীত হওয়ায় মেমের আমদানী বাড়িবে। নবীনা কুমারীদের বিয়ের বাজারে মন্দা আসিবে না কি?

১৯১৪ ইংরাজী ও ১৯৩৯ ইংরাজীর যুদ্ধ

১৯১৪ ইংরাজীর জার্মান-যুদ্ধ ভারতে না পৌঁছিলেও ভারতের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। যুদ্ধের সময় ইংরেজ, সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য সমস্ত ভারতীয় চা যুদ্ধের চার বৎসরে কিনিয়া নেয় পরবর্তী তিন বৎসরের দরে। সিলেটের চা ৮ আনা (৫০ পয়সা) পাউন্ড দরে বিক্রয় হয়। ইহাতে চা শিল্পের অতিরিক্ত লাভ বা ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু পাটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করায় কলগুলি তিন টাকা দরে চাষী হইতে পাট কিনিয়া উচ্চতর মূল্যে, যুদ্ধরত সরকারগুলিকে ট্রেঞ্চ যুদ্ধে ব্যবহার্য—ছালা (চট) বিক্রি করিয়া এত লাভ করে যে, কামারহাটির চটকলের শেয়ারের বাজার দর দশগুণ বাড়িয়া যায়। কামারহাটি ছিল শেয়ার মার্কেটের ব্যারোমিটার।

এদিকে চাষী মরিল, যদিও ধানের মূল্য আড়াই-তিন টাকা হইতে সাড়ে তিন-চার-পাঁচ টাকা উঠিয়াছিল। কাপড়ের দামও বাড়িল। মিলের ধুতি যাহা পূর্বে ২ টাকা ছিল তাহা ৭ টাকায় উঠিল। তখন সিলেটে অনেকগুলি হাটে কাপড় লুট হয়। বিশেষ আদালতে খুল্লতাত সুখময় চৌধুরী, আবদুল মজিদ সাহেব ও বি. এন. রাও বিচার করেন। ১৯৩৯ ইংরাজীর যুদ্ধে, ১৯৪২ ইংরাজীতে ঐ কাপড় ১৪ টাকা জোড়া পর্যন্ত উঠিয়াছে। তবুও হাট লুট হয়

নাই কেন? কারণ, গ্রামের দুর্দান্ত সর্দাররা যুদ্ধে কন্ট্রাকটার হইয়া এখন রাজনৈতিক দলের চাঁই। ১৯১৪ ইংরাজীতে এই শ্রেণীর লোকই হাট লুটের দলপতি ছিল। আজকের লেবার লীডারদেরও শেষে ঐ গতি হইবে।

যুদ্ধের পর বহির্বাণিজ্যের পুনঃস্থাপন হইলে কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বাড়ে বিশেষভাবে ধান্য-মূল্য। অনেক নূতন ব্যবসা, কোম্পানী হয়। কিন্তু ১৯২৮ ইংরাজীতে বিশ্বব্যাপী চাহিদা কমিয়া মূল্য-হ্রাস হয়। ধানের মণ হয় ১ টাকা দেড় টাকা। ঐ যুদ্ধ (১৯১৪) ও যুদ্ধোত্তর চাপে পূর্ববঙ্গ মরিল। যুদ্ধের পর উকীল মোক্তারগণ সার্বডিভিসন ব্যাঙ্ক করিয়াছিলেন যাহা পাটচাষীকে দাদন দিত। সিরাজগঞ্জ, সেরপুর, কুমিল্লায় ঐ সকল ব্যাঙ্ক ফেল হয়।

ইহা হইতে সারিয়া উঠিতে না উঠিতেই আবার ১৯৩৯ ইংরাজীর সর্ব-গ্রাসী যুদ্ধ—যাহা সরকারের স্বার্থে দেশকে, বিশেষভাবে বঙ্গদেশকে বলি দিয়াছে—নানাবিধ কন্ট্রোল দ্বারা। ইস্পাহানী কোম্পানীর এম. ইস্পাহানী সিলেটে আমার সহিত দেখা করেন; চাল কিনিবেন। বাজার দর ১০/১১ টাকা; কিন্তু ইহারা দর দিতেছিলেন ১৮ টাকা। আমার খামারের ধান্য ক্রয় করা ছিল ইঁহার উদ্দেশ্য। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাজার দর ১১ টাকা, আপনারা ১৮ টাকা দিয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছেন কেন?" আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "তাড়া-তাড়ি চাই। এ চাল বিদেশ যাবে—বোধহয় সিলোনে।" প্রকৃতপক্ষে এ চাল যায় পারস্যে, ৪০ টাকা মণ দরের কন্ট্রাক্ট ছিল। আমার কড়া কথা শুনিয়া ইস্পাহানী বোধহয় আশ্চর্য হইয়াছিলেন। ধান্যবিক্রেতা ধানের মূল্য অধিক বলিয়া কথা শুনায়!! সুবিধা হইবে না বুঝিয়া আধঘন্টা পর চলিয়া যান।

দেশ তখন স্বাধীন থাকিলে ভারতবর্ষ বিশ্বযুদ্ধে ধনী হইতে পারিত যুদ্ধের চাহিদা সরবরাহ করিয়া, যেমন হইয়াছিল আমেরিকা ও জাপান ১৯১৪ ইংরাজীর যুদ্ধে।

যুদ্ধে ভারতবর্ষ রপ্তানীর উচ্চমূল্য নগদ পায় নাই, নোট পাইয়াছে, ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্য বাড়িয়া প্রাণ যায় যায়। ইংরাজ দেশটিকে চুষিয়া অন্তঃসারশূন্য করিয়া তবে গিয়াছে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। আবেদন নিবেদন করিলেও এক মুহূর্তও থাকিত না। ইহাতে কংগ্রেস বা কাহারও কোন কৃতিত্ব নাই। দেউলিয়া জমিদারী দান করিয়া কেহ কেহ দাতা নামে যশস্বী হইয়াছেন !!

পাকিস্তান (পূর্ব) শীঘ্র আত্মস্থ হইবে। কৃষি প্রধান, আর্থিক ব্যবস্থা সরল, লোক কষ্টসহিষ্ণু। পাকিস্তান স্থায়ী হইবে আমার প্রথমাবধি এই মত। পাকিস্তান হিন্দুস্থান মিলিবে না। বঙ্কিমের ভাষায় "মুক্তবেণীর পর যুক্ত-বেণী কোথায় দেখিয়াছ" কংগ্রেস গোড়ায় পাকিস্তান মানিয়া নিলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এত বাড়িত না। সংখ্যালঘুর উপর এত সন্দেহের বোঝা চাপিত না।

এই দেশ একটি বৃহৎ কারাগার

কংগ্রেসী আমলে আমরা বলিতাম, বিদেশী কর্তৃক শৃঙ্খলিত এই দেশ একটী বৃহৎ কারাগার। ইংরেজের কারাগারে বাস করিয়াছি ; কিন্তু দেখিতেছি, আজ স্বাধীন দেশ দুইটি তাহা অপেক্ষাও ভীষণ কারাগার। ভ্রমণের পারমিট, নাগরিক জীবনের প্রত্যেক পদে কন্ট্রোল, এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল, রেন্ট কন্ট্রোল, ঔষধ কন্ট্রোল, খাদ্য কন্ট্রোল, পথে চলাচল কন্ট্রোল, কাপড় কন্ট্রোল, ইত্যাদি সবই কন্ট্রোল—অবাধ শুধু যুবক-যুবতীর প্রেম করা। সাবেক সমাজ অবৈধ প্রেম কড়াকড়িভাবে কন্ট্রোল করিত। এ ছাড়া আর বড় কিছু কন্ট্রোল ছিল না। বাকী সব পূর্বাপর রীতি অনুযায়ী চলিত। সমাজ ছিল ব্যবহারগত, Custom পরিচালিত। আইন বড় কেউ জানিত না। ধারও ধারিত না। এখন প্রতিপদে উকীলের বাড়ী দৌড়াইতে হয়। উকীলরাও আবার আইনের অগাধ জঙ্গল ঘাঁটিয়াও অকাট্য উত্তর দিতে পারেন না। হায় রে সভ্যতা!

দ্রব্যমূল্য

মোটামুটি ভাবে নজরআন্দাজ আমার সময়ের দ্রব্যমূল্যের আলোচনা করিতেছি। ১৯০০ সালে ধান্যমূল্য ছিল সিলেটে দেড়/দুই টাকা মণ। অল্প অল্প বাড়িয়া ১৯১৩-তে হইল দুই টাকা আড়াই টাকা। ১৯১৪—১৯১৯ সালে যুদ্ধের সময় ছিল সাড়ে তিন টাকা। স্বল্পকালের জন্য পাঁচ টাকা মণ হয়। ১৯২৩-৪০ সাল পর্যন্ত সিলেট সহরে চালের মণ নয় টাকা, সাড়ে নয় টাকা। তৎপর যুদ্ধের দরুণ এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় হঠাৎ দর উঠানামা করিতেছে। ১৬ টাকা হইতে ৩০ টাকা এমন কি স্বল্পকালের জন্য চল্লিশ টাকা। বিগত তিন বৎসর যাবত সাধারণ দর বাইশ টাকা ধরা যাইতে পারে। দ্রব্যমূল্য, মজুরী মূল্য প্রায় সমানুপাতে বাড়ে। স্থায়ী মূল্য সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে। অ-দৃষ্ট ও অস্থায়ী কারণে হঠাৎ কোনও একটা দ্রব্য অসমভাবে বাড়িতে কমিতে পারে।

১৮৮০ হইতে ১৯১০ পর্যন্ত মুদ্রার মান অর্ধেক হইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। ১৯১০ এবং ১৯৪০-এর মূল্য মিলাইলে দেখা যাইবে, আবার দ্বিগুণ হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধোত্তর মূল্য মিলাইলে দেখা যাইবে যে মোটামুটি তিনগুণ হইয়াছে। মজুরী যে স্থলে ১৯১০-এ ছিল দৈনিক তিন আনা যুদ্ধের পরে দাঁড়াইল ছয় আনা। এখন দেড় টাকার কম নয়, দুই টাকা আড়াই টাকা পর্যন্ত হইয়াছে। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য অনুপাতে মজুরীর হার বেশী বাড়িয়াছে। মধ্যবিত্তের মজুরীও বাড়িয়াছে। ১৯১০-এ পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বেতনের, কোম্পানী বা সরকারের নিম্নতম ভদ্রলোক কর্মচারী এখন পায়

৮০ হইতে ১২৫ টাকা। অবশ্য অফিসারদের বেতন এই হারে বাড়ে নাই। কারণ গণতন্ত্রে 'গণে'র মত অবশ্যই ধনের বৃদ্ধির বিপক্ষে থাকিবে। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে পেন্‌সনার এবং খাজনার মালিক। তবে চিরস্থায়ী রেটের খাজনার মালিকের অভিযোগ করিবার কারণ নাই, কারণ ভবিষ্যৎ লাভের দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়াই চিরস্থায়ী খাজনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণ জোতস্বত্ব বিশিষ্ট চাষীর খাজনা কিন্তু আইন মত ধান্যের মূল্যের সমতালে বাড়িবে। কোনও রাজ্যে ইহা রোধ করিবার জন্য বিশেষ আইন হইয়াছে। সহরের মালিকদের জন্যেও রেন্ট কন্ট্রোল করা হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত কারণে, একদল লোকের দুর্দশার সুযোগে অপর দল লাভ করিতে পারেন না। মুস্কিল দাঁড়াইয়াছে, গৃহনির্মাণে অত্যধিক ব্যয় বলিয়া বাড়ী করাইয়া কেহ বর্তমান হারে ভাড়া দিতে পারে না। এতে যাহারা এখনও বাড়ী পায় নাই (অর্ধেক লোকও পায় নাই) তাহাদের দুর্দশার আর শেষ হইবে না। সরকার নিজে ভাড়া বাড়ী করার কল্পনা করিতেছেন। তাতেও ভাড়া বেশী লইতে হইবে। বিল্ডিং কর্পোরেশন প্ল্যানিং করিয়া বাড়ী নির্মাণ পূর্বক সেই বাড়ী উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া বাসিন্দা ক্রেতা হইতে মাস মাস আসল টাকা ও সুদ আদায় করিতে পারেন। তবে এইরূপ কর্পোরেশন নীট সুদ যৎসামান্যই পাইতে পারেন। হয়ত দুই টাকা হার। ১৯০০ সালে প্রোঃ মার্শাল এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। স্কুল-বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুক্তি নাই। বর্ধিত বেতন দিতে আপত্তির অর্থ সরকারকে অর্থাৎ সর্বসাধারণকে (দরিদ্রকেও) অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার ছাত্রের বেতন দিতে বলা।

আমরা দেখিতেছি, আনাচে কানাচে সামান্য কয়েকজন ছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে কাহারও ক্ষতি হয় নাই, বরঞ্চ লাভ হইয়াছে অতি দরিদ্র উৎপাদক ও শ্রমিকের। সামান্য ক্ষতি হইয়াছে চারশ' বা তদূর্ধ বেতনের কর্মচারীদের। কাজেই দ্রব্যমূল্য কমিবে না, কারণ ন্যায্য অভিযোগ কাহারও নাই। যদি কমে তবে একই হারে বেতনও কমিবে। এই বাড়া কমার ট্রান্‌জিশন অবস্থা, অস্থির অনিশ্চিত ও এলোমেলো। এই অনিশ্চয়তার সুযোগে কৌশলী বেশী লাভ করে, আবার বোকারামের বেশ ক্ষতিও হয়। কারবারী লাভ, দোকানদারের তেজী -মন্দার লাভ। ইহা রোধ করা শক্ত।

বর্তমানে দোকানী ভিন্ন কোন শ্রেণীরই ব্যয় কুলাইতেছে না, সত্য। তার কারণ, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় ট্রাম ভাড়া মাসে আট আনাও দেই নাই। এখন পাঁচ/সাত টাকা অনিবার্য। সামান্য আরাম বা নামের জন্য মধ্যবিত্ত মটরগাড়ী রাখেন, তাহা নিবার্য। কিন্তু অসুখে ১৯৩৬ সালে বড় ডাক্তারের ফি ১৬ টাকা এবং ঔষধ ১০ টাকা, মোট ছাব্বিশ টাকা। সে স্থলে এখন খুদে ডাক্তার ডাকিলেও রোগ নির্ণয় করিবার

পূর্বে একশ টাকা রক্ত, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষায় ব্যয় করিতে হয়। ইহা নিবার্য কিনা মতভেদ হইবে। জীবন অমূল্য ধরিলে নিবার্য নয়। কিন্তু সরকার বা কেহই সামান্য ভিখারীর জন্য এত ব্যয় করিবে না। তবে অবস্থা দাঁড়াইল, জীবনের মূল্য আর্থিক অবস্থার অনুপাতে স্থির হয়।

খেসারত নির্ধারণে আদালত জীবনের মূল্যের তারতম্য করেন। সিনেমার ব্যয়, ট্রাম অপেক্ষা কম নয়। নিবার্য না অনিবার্য হয়ত তর্ক উঠিবে। এক পরিবারের ব্যয় সম্বন্ধে অপরের আলোচনা চলিতে পারে না। আপন বুঝে চল, ফলাফল তোমারই, আমাকে পাইবে না। প্রসাধন প্রভৃতি স্টেশনারী দোকান এখন অলিতে গলিতে ¼ মাইলের মধ্যে কুড়িটি। ১৯০০ সালে মুর্গীহাটা ছিল বাজার। দুই একখানা দোকান অন্যত্র ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিৎকারেও বিলাসিতা কমে নাই। কলিকাতার লক্ষপতিদের অনুকরণে মধ্যবিত্ত সামাজিকতার তত্ত্বে সন্দেশ ও কাপড়ের ব্যয় বাহুল্য করেন। ইহা নিছক নিজ আর্থিক অবস্থা গোপন করা অর্থাৎ প্রতারণা। অমৃত বসু বলতেন, "বুড়োরা এত ছানা খায় যে শিশুরা দুধ পায় না।" তিনি দুধ ও ছানার আমদানীর হিসাব করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই পাপ এবং বিশেষভাবে বরপণের আধিক্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে এমন কি পূর্ববঙ্গেও প্রবেশ করিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সিলেটে ছানার সন্দেশ ছিল না, ছিল জিলাপী ও লাড্ডু। তাহাতে লজ্জিত নই, বরঞ্চ গৌরব করি। কুড়ি বৎসর পূর্বে বরপণ প্রায় অজ্ঞাত ছিল। এখন খুব ভাল ছেলেরাও লয়। বিলাসিতা বীর, শক্তসমর্থের চরিত্র নয়, ইহা ননীর পুতুলের চরিত্র।

যখন তিন টাকা চালের মণ, তখন মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগারী লোক দোল দুর্গোৎসব করিতে পারিত, তাহা হইলে এখন পাঁচশ টাকা রোজগারীর পারা উচিত। অধুনা 'drone' আখ্যায় নিন্দিত বে-রোজগারী আত্মীয়-স্বজনের বোঝাও বহিতে হয় না।

নারায়ণগঞ্জ গোয়ালন্দ হোটেলে দশ পয়সা কি তিন আনায় যে টাটকা ইলিশের ঝোলভাত, ডাল খাইয়াছি, কলিকাতার হোটেলের পাঁচ টাকায় ডিনারে সে স্বাদ ও পোষ্টাই মিলিবে না। নারায়গঞ্জ হোটেলের খাদ্যমান বেশী উন্নত, তাহা আধুনিক বাবু বুঝিবেন না। চল্লিশ বৎসর যাবৎ সিলেটের নদীতে বর্ষাকালে মাঠেও ইলিশ মিলে। কিন্তু তেল, স্বাদ কম। কলিকাতায় বরফের ইলিশে পদ্মার ইলিশের প্রকৃত স্বাদ গন্ধ মিলে না। ঢাকানিবাসী এক মেসবাসী ছাত্র অবিনাশবাবু বলিত—Extract Hilsa তৈয়ারী করিয়া লক্ষপতি হইবে এবং পদ্মায় নৌকায় পাল উড়াইবে।

ঢাকার লোকের নিকট 'পদ্মা' কবিতা।

অর্ধশতাব্দীতে সভ্যতার উন্নতি

১৮৯০ ইংরাজীতে গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা ১৯৫২-তে সম্পূর্ণ কলিকাতা কেন্দ্রিক। কলিকাতা আবার লণ্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কোর উপনিবেশ। ১৯৩০-এ মধ্যবিত্ত (যাহাদের পারিবারিক বার্ষিক আয় অন্যূন এক হাজার টাকা) ভদ্র শূদ্র, স্কুলে পড়িয়া চাকুরী ওকালতী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করিত। দরিদ্র কৃষকও দুইবেলা খাইতে পাইত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অজন্মা হইলে কখনও বা একবেলা খাইত। গ্রাম ও শহরের ভিখারীকে, দুস্থকে দেশবাসী অনাহারে মরিতে দিত না। খাদ্যে ভেজাল ছিল না।

১৯৫২ ইংরাজীতে বৎসরে পাঁচ হাজারের কম আয়ের পরিবার খাইতে পায় না। ধনী, দরিদ্র সকলের খাদ্যেই ভেজাল। মুদ্রামূল্য পাঁচগুণ কমায় পূর্বের হাজার এখন পাঁচ হাজারের সমান বটে। এই হিসাবে মধ্যবিত্ত গণ্য পরিবারের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় $\frac{1}{8}$ অংশ মাত্র। অপর দিকে উপরে স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি বিত্তশালী হইতেছে। ১৯০০ ইংরাজীর লক্ষপতি এখন ক্রোড়-পতি অর্থাৎ শত গুণ ধনী। দুর্ভিক্ষ, অনশন ব্যাপকভাবে নিত্য লাগিয়াই আছে। এই তো খাওয়াপরার অবস্থা।

মনের দিক দিয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতা নাই একেবারেই। সরকার পদে পদে বেড়াজাল দিয়া নাগরিককে বেড়িয়াছেন। বাজার করিবে,--দ্রব্য, মূল্য, সময় কন্ট্রোল। রাস্তায় বাহির হইবে—পথ কন্ট্রোল; ব্যবসা-বাণিজ্য করিবে—লাইসেন্স কন্ট্রোল। বিদেশে যাইবে—কাস্টম কন্ট্রোল; মানুষ, দ্রব্য, মুদ্রা সবই কন্ট্রোল; কাস্টম অর্থে, পূর্বরীতি—আগেও ছিল এখন চরম। মুদ্রাবিনিময় বাজারে হইত, এখন রাজদরবারে। লজ্জার বিষয়—সরকার বিনিময়মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন অথচ দিবার বেলায় বলিতেছেন "যখন পারিব তখন দিব।" কোনও নাগরিককে এইরূপ ব্যবহারে জুয়াচোর বলা হইত।

কন্ট্রোল কিশোরী চতুর্দিকে। 'উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী করেছি সার।'

কৈফিয়ৎ—এ না করিলে অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষে পৃথিবী বিনাশ হইবে। দুই দেশের (ভারত, পূর্ব পাকিস্তান) কাস্টম অফিস এক মাইল দূরবর্তী। এই এক মাইল যানবাহন চলিতে দেওয়া হয় না। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্নের যাতায়াত খুবই কষ্টকর। বলি—এই একমাইল যান চলিলে কি পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হইবে? ১৯০৩ ইংরাজীতে তুর্কী হইতে রেলে লোক ইংলণ্ডে যাইত। গাড়ী হইতে নামিতে হইত না। পথে মধ্যে মধ্যে পাঁচ দশ মিনিট কাস্টম পরীক্ষা হইত। এখনও ইউরোপের ব্যবস্থা ভারত পাকিস্তান হইতে ভাল। তখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বে লোক ধনী হইত, নাগরিক কাহাকেও ফাঁকি দিয়া নহে। কেহ কেহ

সাম্রাজ্যের অধীন দেশের লোককে চুষিত সত্য। আমার সময়েই কাপড় ইত্যাদি কলের তৈরী দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ কমিয়াছে। ধান ১৮৮০ ইংরাজীতে ১ টাকা মণ হইতে ১৯১৩-তে ৩ টাকা মণ। কৃষক ও কৃষিপ্রধান ভারতের লোক সকলেই সুখী ছিল। দশ টাকা মন পাটের দাম পাইয়া বাংলাদেশ ভারতের শস্যাগার, বাঙলার চাষী পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন—এই সব কথা কলেজের আড্ডায় বলিয়াছি। চাষীর ছেলেকে গ্রামোফোন বাজাইতে, মাঠে জুতা মোজা পরিয়া সাইকেল দৌড়াইতে দেখিয়াছি। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে পাটের দর দুই টাকা মণ হইল। লর্ড লিটন চাষীকে বলিলেন "কেন ধান ফলাও নাই?"

আবার পরে যখন সুভাষবাবু পাটচাষ বন্ধ করার জন্য প্রচারকার্য করেন তখন সরকার আপত্তি করেন। অসন্তুষ্ট ছিল কেবল মুষ্টিমেয় কালা রাজকর্ম-চারী—তাহারা সাদা কর্মচারীর মাহিনা ও ক্ষমতা চায়। এ বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেসের ১৯০৬ ইংরাজী পর্যন্ত প্রস্তাবসমূহ দ্রষ্টব্য। দেশীয় বণিক বড়-বাজার তখন রেলীর তাঁবেদার। কলের দ্রব্য আমদানীতে শিল্প নষ্ট হইলেও শিল্পীদের সকলেরই কিছু ক্ষেত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ও স্বদেশী আমলে, আমাদের আশা জাগিল—ইংরেজের কলকারখানা ও বিদেশী বাণিজ্য হস্তগত করিব। কারবারীরা চাকুরিয়ার পক্ষে আন্দোলনে যোগ দিলেন। তখনও কিন্তু সর্বসাধারণ সুখী ছিল। এখন অপেক্ষা রাজপুরুষদের অত্যা-চার কম ছিল। "বল রে, আমরা স্বাধীন দেশ হইয়াছি।" আহারে! The cry of an independent country hides a multitude of sins.। স্বাধীন নাগরিক কাহারা? শেষ পর্যন্ত যাহারা ফুসলাইয়া, ভীতিপ্রদর্শন করিয়া ভোট আদায়পূর্বক রাজত্ব করে, অর্থাৎ শাসকদলমাত্র। অপর নাগরিক পরাধীন—কারণ বিদেশী মালিকের শোষণ অপেক্ষা প্রতিবেশীর শোষণ ভয়ঙ্কর হইতে বাধ্য। নিত্য সে লাথি মারিবে। জেলজীবনের অভিজ্ঞতা আছে। এখন জেলের বাহিরের পরাধীনতা, ইংরেজের জেলের পরাধীনতা অপেক্ষা দুর্বহ।

আধ্যাত্মিকতা এখন Hedonism (চার্বাকদর্শন)—ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কলিযুগ! প্রতিবেশী, জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন, এমন কি ভ্রাতাভগ্নী পিতা-মাতার প্রতি আগেকার দৃষ্টি নাই। দেশপ্রেমের বুলি খুব আওড়াই। দেশ অর্থ পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশী নহে, বিশ্বের দরবারে সুনাম অর্থাৎ ডাকাতের দলে কে বড় ডাকাত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রথম গান শুনিয়াছিলাম —"ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" এই কি সেই শ্রেষ্ঠ আসন? চারিদিকে কেবল শুনি 'উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও অর্থনীতি চলিবে না।' যাহারা বলে তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিশ বৎসরের যুবকও নয়। ঐ সময় সম্বন্ধে তাহাদের কি অভিজ্ঞতা? নিজের দেখা নহে, শুধু পরের মুখে

স্নাল খাওয়া। যদি দেখিতাম ১৯৫২-তে তোমরা সুখেসমৃদ্ধিতে আছ তবে না হয় তোমাদের কথায় শ্রদ্ধা হইত। আঙুল দেখাইবে রুশ ও চীনের দিকে। সেও যে তোমাদের অন্ধের হাতী দেখা। কেহ বলে—কুলার মতন, কেহ বলে মূলার মতন!

রাজপুরুষদের সততা ও কর্মদক্ষতা ১৯৩৬ হইতে ক্রমে লোপ পায়। মন্ত্রীদের দলীয় স্বার্থে স্থানীয় ছোট ছোট কাজে, জিলার কর্তার কাজে হস্তক্ষেপ করার ফলে সাহেব ও ভারতীয় আই. সি. এস. কয়েকজন কর্মচারী বলিয়াছিলেন "আমরা পোষ্ট অফিস মাত্র।" ইংরেজ রাজত্ব যাইতেছে জানিয়া আই. সি. এসের কর্তব্যজ্ঞানও কমে। যুদ্ধের সময় তাড়াহুড়ায় Supervision অসম্ভব হওয়া এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কর্মচারীদের স্বসম্প্রদায়-প্রীতি, অরাজকতায় পূর্ণাহুতি দিয়াছে। দৈনন্দিন শাসনের দায়িত্ব শাসক কর্মচারীর, মন্ত্রীর নহে। ১৯২৫ ইংরাজীতে রীড সাহেব আমাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিলাতে "The treasury is supreme in everyday administration,"- এই নিয়ম আছে।

রঙ্গতামাসা

১৯১৯ ইংরাজীতে ইউনিভার্সিটি কমিশনের চেয়ারম্যান স্যাডলার বাঙালীকে বিষাদমগ্ন জাতি (Melancholy race) আখ্যা দেন।

সত্তর বৎসর পূর্বেও কিন্তু বাঙালীর কবি ঈশ্বর গুপ্ত, হাফ-আখড়াই কবির দল, এন্টনী ফিরিঙ্গী, রামু মালী প্রভৃতি ছিল—দেখি নাই, শুনিয়াছি। দেশে বাল্যকালে, যৌবনেও সিলেটে কবি গান দেখিয়াছি। মৈমনসিংহের মোক্তার কবি বিজয় আচার্য শাস্ত্রজ্ঞানী হাস্যরসিক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'পাঁঠা' কবিতা 'রসে ভরা রসময় রসের ছাগল'--ইত্যাদি সিলেটে গাওয়া হইত। গোবিন্দ দাসের৭ "বাবুদের হাজার টাকার বাগান খাইল পাঁচ সিকার ছাগলে রে"—ইত্যাদি গান হাসির ফোয়ারা বহাইত। ব্রাহ্ম পিউরিটানগণ অশ্লীল বলিয়া এই সব বর্জন করার ফলে ইংরাজীশিক্ষিত সমাজে হাসি লুকাইল। এর প্রতিশোধ বর্তমানে সিনেমার অশ্লীলতা। এক শ্রেণীর বিদ্বানরা অশ্লীলতার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মরা Sex—যৌন সম্বন্ধের ইঙ্গিতমাত্রই অশ্লীলতা মনে করিতেন। আদিরস যে সৃষ্টিতত্ত্ব, ইহার সংশোধিত এডিশন (সংস্করণ)-ই আধ্যাত্মিকতা। আর্থিক দৈন্য কম ছিল না। আমার জ্ঞাতি লালচন্দ্র চৌধুরী সদা প্রফুল্ল ছিলেন। তাঁহার পাশা খেলার নেশা এমন যে তিনি পাশার আড্ডায় দিন কাটাইতেছেন আর এদিকে তাঁহার স্ত্রী হাঁড়ি চড়াইবার অন্নের অভাবে ভাবিয়া আকুল!

আসল কথা বাঙালীর তেজ, উৎসাহ নাই। কেন নাই অন্যত্র স্থানে স্থানে

উল্লেখ করিয়াছি। স্বদেশী যুগে যখন সাময়িক তেজ আসিল তখনই পাইলাম দ্বিজু রায়ের হাসির গান 'পার তো জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়', 'হতে পারতাম ইচ্ছা করলে মস্ত একটা বীর', 'আমরা ইরাণ দেশের কাজী'— শেষেরটি হাসির অন্তরালে ক্ষোভ। অমৃতলাল বসু ছিলেন হাস্যরসিক। হাসির অন্তরালে ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া সংশোধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

রসিক না হইলে হাসাইতে পারে না। বাঙালী এখন বুদ্ধিমান--ইন্‌টেলেক্‌-চুয়াল-জাতি বলিয়া বড়াই করে। রস বুদ্ধিমিশ্রিত ভাব, কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়। ভাবাবেশ ছাড়া তেজ হয় না। কেবল রামকৃষ্ণের ভাবাবেশই একমাত্র ভাবাবেশ নহে। কালীতত্ত্ব শিখ, দেখিবে শান্ত, হাস্য, বীভৎস বহু রস আছে। সবগুলিই আবেশ হইতে পারে। বাংলার বিপ্লবীদের ভাবাবেশ হইত। ক্ষুদিরামের কি হয় নাই? আবেশ অর্থ তন্ময়তা মাত্র। মনে পড়ে সুরেন্দ্রনাথ· বিধান রায়ের নিকট বাঙলার বিধানসভা নির্বাচনে হারার পর সুনামগঞ্জের চারু রায়কে দিয়া গান রচনা করাইয়াছিলাম। "মরিল মরিল সখি সুরেন মরিল/কুলে বাতি দিতে শুধু প্রভাস রহিল/......সঞ্জীবনীর কালি দিয়া মৈত্রী প্রেসের হরফ দিয়া/ মডারেট নামটি আমার অঙ্গে লিখ।"

ইহা বিশুদ্ধ না হইলেও জয়ের উল্লাসের হাসি। ১৯২৩-এর নির্বাচনে মডারেট দলের একমাত্র প্রভাস মিত্র জিতেন।

Practical Joke বহু করিয়াছি। এখন তাহা বয়স্ক ভদ্রজনোচিত গণ্য হয় না। প্রাণবন্ত লোক প্রৌঢ় বয়সেও রঙ্গতামাসা ভালবাসে। বৃদ্ধ বয়সে আরও বেশী, কারণ তখন ছুটি, জীবনের কাজ শেষ। নাতি নাতনীদের সহিত রঙ্গ-তামাসা তখন কাজ।

সংস্কৃত নাটকে বয়স্য ছিল, যাত্রাগানে বয়স্য ছিল। থিয়েটার, সিনেমায় বয়স্য নাই। ব্যবসায়ী সং ও পার্বণে সং, ইংরেজী শিক্ষিত কর্তৃক 'ছোট লোকের দেখবার' বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। প্রাণবন্ত পাশ্চাত্যে, জাপানে ও অসভ্য (?) দেশগুলিতে কার্নিভ্যাল—বেশ জমজমাট। আমাদের বিলাতফেরতা ছাত্ররা কলেজ-র‍্যাগিং-এর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেয় কিন্তু নিজেদের বেলায় ঠন ঠন।

পরিশিষ্ট

অধীত পুস্তক

২৫ পৃঃ

বাংলা ও ইংরেজী যে সকল বহি আমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছি। এতদ্বারা একটি মনের বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস মিলিবে এবং আমাদের সময়ের জনপ্রিয় পুস্তকগুলি কিরূপে জাতি গঠনে সহায়ক হইয়াছে তাহার হদিস মিলিবে।

বাড়ীতে বাল্যে ও কৈশোরে (১৮৯১—১৯০০)—মেঘনাদ বধ, বৃত্র সংহার। শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর দেবীযুদ্ধ (সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ)। সখাসাথী, মুকুল পত্রিকা। নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, প্রভাস, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, অমিতাভ। টড সাহেবের রাজস্থান (যোগেন্দ্র বসুর বাংলা অনুবাদ)। ম্যাৎসিনী ও গ্যারীবল্ডীর জীবনী। রজনী গুপ্তের আর্যকীর্তি। রমেশ দত্তের Rambles in India, রাজপুত জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, বৃন্দাবন ধরের (ঢাকা পোগোজ স্কুল) History of India, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর-জীবনী। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পত্রিকা। অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ।

শেষোক্ত পুস্তক দুইটি নৈতিক ও পারিবারিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হইয়াছে।

মেঘনাদবধে প্রমীলার "রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?" বিদ্রোহের ভাব জাগাইত।

নবীন সেনের ঐ সব পুস্তক পড়িয়া মীরজাফর ও ইংরেজের উপর বিদ্বেষভাব জাগিত। ভাষার তেজ ও দ্রুত-তরঙ্গ ছিল। এই বইগুলি শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব ও ভগবানত্বের ভাষ্য।

আর্যকীর্তিতে ধাত্রী পান্না ও সামন্তদের রাজভক্তি মুগ্ধ করিত।

স্কুলে পাঠকালীন পঠিত ইংরাজী বই—

Grimms' Fairy Tales, Les Miserable, Robinson Crusoe, Gulliver's Travels, Peep of Day.

স্কুলে Royal Reader Series পাঠ্য ছিল। ভাষা ও ভাব খুব ভাল লাগিত। গদ্য ও প্রবন্ধ মুখস্থ ছিল। ইংরেজ চরিত্রের সব গুণ ঐ সকল পুস্তকে আছে। বাঙ্গালীর লিখা ইংরাজীর তর্জমা করা পুস্তক পড়িয়া কি লাভ হয়। ৮।১০টি কবিতা এখনও মুখস্থ বলিতে পারি।

Selections—Boedicea, Casablanca, Graves of the Household, Loss of the Birkenhead, We are Seven, Longfellow লিখিত, Tell me not in mournful numbers.

গদ্য—Audre Moor, A father's love, ইত্যাদি চরিত্রগঠনের সময় কৈশোরে ১০—১৪ বছর বয়সে পড়িয়াছি। এ ছাপ যাইবার নয়।

এ ছাড়া, Lisbon's Earthquake ও Ramson's History of England পড়িয়াছি।

এন্ট্রান্স ক্লাশে English Selection-এ Livy-র Punic War-এর ইতিহাসের অংশ, Hasdrubal's March to Rome মহৎ ঘটনা। Livy-র ভাষাও তেমনি! ভ্রাতা হেসড্রুবলের ছিন্নমুণ্ড দর্শনে হানিবলের আর্তনাদ মর্মস্পর্শী। কার্থেজ ধ্বংসের মর্মান্তিক ঘটনা ভাল লাগে নাই। ৫০ বৎসর পূর্বে ভাবি নাই সেই লোমহর্ষক ঘটনাবলী আমাদের দেশেও ঘটিতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর History of India ইতিহাস নয়, Chronicle। ইংরাজীতে ইতিহাস লিখিতে হইলে ভাল ইংরাজী ভাষাজ্ঞান চাই। কুলিখিত ইতিহাস পুস্তক, ছাত্রদের মনে ইতিহাস-বিদ্বেষ জন্মায়।

কলেজে--১৯০০--১৯০৭ বি. এ. পাঠকালে—

Macaulay-এর History of England, Gardiner-এর History of England (Growth of Constitution), Mill-এর Representative Government, Liberty, Subjugation of Women, Plutarch's Lives, Bagehot-এর Constitution, Lobby-র Civil War ("the king signs his death warrant"). Spencer-এর Education ও Sociology, Mill-এর Principles of Political Economy, Marshall-এর Charity in Economics, Tyndal ও Huxley পড়িয়াছি।

Mill ছিলেন High priest of Rationalism.

Poetry—

Milton's Paradise Lost Book I, Palgrave's Golden Treasurey, Tennyson-এর Enoch Arden, গোল্ডস্মিথের Traveller, Deserted Village, Vicar of Wakefield, Black's Life of Goldsmith.

সেক্সপীয়ার--Richard III, The Merchant of Venice, Julius Caesar, পরে সমগ্র সেক্সপীয়ার।

Carpenter's Physiology, Elementary Science.

বঙ্কিম গ্রন্থাবলী। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রচনাবলী। রবীন্দ্রনাথ—নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, গীতাঞ্জলি, প্রবন্ধ, বক্তৃতা। নিবেদিতার Web of Indian life, ওকাকুরার Ideals of the East, ডি. এল. রায়ের শাজা-

হান, ইত্যাদি নাটক ও হাসির গান। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তামাকুতত্ত্ব (হাস্যরস)। রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী (বঙ্গবাসী প্রেস)—উৎকট তামাসা। পঞ্চানন্দের রচনা। দেবগণের মর্ত্যে আগমন। বঙ্গভাষার ইতিবৃত্ত। বিপিন পালের Soul of India, Who is Sri Krishna.

এম. এ পাঠকালীন—

Thiers-এর French Revolution—3 vol.—Causation, Hume ও May-র Constitution, Austin-এর Jurisprudence, সনেট--গুপ্ত মহাশয়। পরে দেবীযুদ্ধ (২ বার পাঠ)।

অন্য বই--

সাধারণ জ্ঞানের জন্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সামান্য দর্শন পড়িয়াছি। চরিত্রে বিশেষ ছাপ পড়ে নাই—গান্ধীর আত্মজীবনী পড়িয়াও নয়।

প্রৌঢ় বয়সে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মনুসংহিতা ইত্যাদি পড়িয়াছি। নাতিদের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত আনন্দে পাঠ করিয়াছি।

স্কুলে ও গৃহে পঠিত পুস্তক

২৬ পৃঃ

Pro Patria Mori :—

রোমান কবি হোরেস লিখিত "Dulce et decorum est Pro Patria Mori"—(অর্থাৎ স্বদেশের তরে মরণবরণ, সে কী সুখ সে কী গৌরবের) এই চরণের ভাব আশ্রয় করে কবি টমাস মুর ফাঁসির মঞ্চ আরোহী এক আইরিশ বিপ্লবীর মুখে "Pro Patria Mori" নামে একটি কবিতা দিয়েছিলেন।

কলেজে কলিকাতায়

৩৪ পৃঃ

রাণী ভিক্টোরিয়াকে যতটা মহীয়সী বলা হয়েছে ততটা ছিলেন না। ডিজরেলী রমেশ মিত্রকে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ করতে চাইলে রাণী প্রবল আপত্তি করেন—"এই পদে কালা আদমী নেয়া চলবে না।" ডিজরেলী জোর করে তাঁকে মত করান। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের বেলায়ও সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁকে বিহারের লাটপদ দিতে আপত্তি করেন। লেখক তাঁর একটি অপ্রকাশিত ইংরাজী রচনায় এই বিষয় বিবৃত করেছেন। (c.f. "Reminiscences of Political life)

মনাইর চর ঃ—হবিগঞ্জ মহকুমায় কাছাড়-সুন্দরবন ডেসপ্যাচ স্টিমারের পথে পড়ে।

৪৩ পৃঃ

গঙ্গাপিশাচ ঃ—মৃত্যুকালে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হিন্দুর আকাঙ্খা ; কিন্তু সে জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি অর্থাৎ সৎকর্ম না থাকলে ফল উল্টা হয়—গঙ্গা-পিশাচ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর প্রেত হয়ে থাকতে হয়। লেখক বলতে চাইছেন যে যা ক্ষমতার বাইরে তা করতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

গ্রাম্যজমিদার

৪৮ পৃঃ

সামাজিক "একঘরে" করা সম্বন্ধে লেখক বিপিনচন্দ্র পালের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর তাঁর প্রতি তাঁর পিতার ব্যবহারের যে কথা উল্লেখ করেছেন তা বিপিনচন্দ্র পালের "সত্তর বৎসর" গ্রন্থের ২৫২—৫৪ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

"আমি যখন শ্রীহট্টে পেঁৗছিলাম...শ্রীহট্টের বাসায় বাবা একেলাই ছিলেন।...আমি বাসায় উপস্থিত হইলে মুখহাত ধুইবার পরই বাবা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন,—তোমার সম্বন্ধে কি করিব এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। সে জন্য আজ তোমাকে আমি কষ্ট দিব; তোমাকে রাতটা জলযোগ করিয়াই থাকিতে হইবে। এই বলিয়া আমার জন্য বাজার হইতে যে কচুরি ও সন্দেশ আনাইয়াছিলেন তাহা আনিয়া দিতে পরিচারককে আদেশ করিলেন। আমি বাহিরের ঘরে বসিয়াই এই জলযোগ করিয়া শুইতে গেলাম।

(৭)

আমাদের শ্রীহট্টের বাসা একটি পাকাবাড়ীতে ছিল। তারই এক অংশে স্কুলডেপুটি ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত নবকিশোর সেন মহাশয় বাস করিতেন। এই পাকাবাড়ীর সংলগ্ন আরও দুই তিনটা বাসা ছিল। সকলেই আমাদের আত্মীয়। পরদিন প্রাতঃকালে বাবা সকল বাড়ীর গৃহিনীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমাকে যেন তাঁহারা রান্নাঘরে না তুলেন, তুলিলে তিনি আর তাঁহাদের অন্নগ্রহণ করিতে পারিবেন না। নবকিশোরবাবুর গৃহিণী আমার মাকে মা বলিতেন এবং আমাকে কনিষ্ঠ সহোদরের মতো স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে প্রত্যুষেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমার জন্য লুচি আলুভাজা রাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি ঘরে যাইতে রাজী হইলাম না। বলিলাম 'বাবা,

তোমাদের বারণ করিয়াছেন, তোমরা কোন সাহসে আমাকে ঘরে তুলিতেছ?' তিনি বলিলেন 'আজ যদি মা বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনি কি কাল তোমাকে উপোষ রাখিতে পারিতেন বা বাহিরে খাইতে দিতেন? বাবার কথা আমি মানিব না। তিনি আমার ঘরে না হয় না খাবেন—' এই বলিয়া বাহিরে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া রান্নাঘরে বসাইয়া আমায় খাওয়াইলেন। তখনও আমার বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া হয় নাই। কিছুক্ষণ পর বাবা আমাকে ডাকিলেন। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক পিসতুতো ভাই আমাদের সেই হাতাতে সপরিবার বাস করিতেন। তাঁহার অন্তঃপুরে একটা ঘরে লইয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে কহিলেন "কাল পর্যন্ত আমি তোমাকে লইয়া কি করিব ঠিক করিতে পারি নাই, এখনও কি করিব জানি না—তবে তাহা তোমার উপর নির্ভর করিবে। তুমি বিদেশে কি কর বা না কর তাহার খোঁজ লইতে চাহি না; তবে যে কদিন আমার কাছে থাক, সে ক'দিন জাতবিচার করিয়া চলিবে কি না ইহাই জানিতে চাই। আমি কহিলাম 'গায়ে পড়িয়া আমি, আপনারা যাহার হাতে খান না, তাহার হাতে খাইতে যাইব না কিন্তু যখন আমি কিছু খাই বা পান করি তখন যদি সেস্থানে কোন অস্পৃশ্যজাতের লোক আসেন তাহা হইলে সে জন্য আমি আমার খাদ্য বা পানীয় পরিত্যাগ করিব না এবং তাঁহাকেও ঘরে ঢুকিতে বারণ করিতে পারিব না। জাতিভেদটা মিথ্যা, আমি এইরূপই বিশ্বাস করি, কথায় বা কার্যে জাতিভেদ মানিয়া চলিলে মিথ্যাচরণ করিতে হয়; সুতরাং আমি তাহা করিতে পারিব না।' আমার এই কথা শুনিয়া বাবা দ্বিরুক্তি করিলেন না। আমার পিসতুতো ভাইকে বলিলেন 'এ যে কদিন এখানে আছে, তোমার ভিতরবাড়ীর একটা ঘরেই খাইবে। আমার বাসায় ত মেয়েরা নাই, বাহির বাড়ীতেই আমার রান্না ও খাওয়া হয়। আমি তাহাকে ঘরেও লইতে পারিব না উঠানেও ভাত দিতে চাহি না।' এই ব্যবস্থা করিয়া সেইদিনই অপরাহ্নে বাবা শহর ছাড়িয়া গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।"

ভ্রমণ

৯৫ পৃঃ

ভ্রমণের একটি শিক্ষাপ্রদ এবং দুঃসাহসিক দিক আছে। এই দুঃসাহসে ভর করে যারা পদব্রজে বা সাইকেলে পর্যটনে বেরিয়ে পড়ে তাদের সম্বন্ধে লেখক বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি এদের সাদরে গৃহে স্থান দিতেন এবং কোনো একদিন সহরস্থ আত্মীয়পরিজনসহ এঁদের ভ্রমণকাহিনী শুনতেন। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস শিলং থেকে সিলেট আসার পথে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে সিলেট হাসপাতালে ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গী শৈলেন

দাস লেখকের গৃহে অবস্থান করে তাঁদের ভ্রমণকাহিনী সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে শুনিয়েছিলেন। ঐভাবে বেশ ক'জন বাঙালী (তন্মধ্যে অমূল্য চক্রবর্তী একজন), অসমীয়া, উড়িষ্যাবাসী ও পার্শী পর্যটক লেখকের গৃহে অবস্থান করে নিজেদের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণকাহিনী (কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্লাইড সহ) শ্রীহট্টবাসীকে শুনিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এক বাঙালী পর্যটক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের (পশ্চিম পাকিস্তান) সম্ভ্রান্ত কয়েকজন মুসলমানের কাছে গরু খাওয়ার প্রসঙ্গ তুললে তাঁরা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা গরু খাওয়া ঘৃণা করেন ; তাঁরা উট কোরবাণী করে সেই মাংস খেয়ে থাকেন।

শ্রীহট্টে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান

বিথঙ্গল আখড়া

১০৯ পৃঃ

উক্ত আখড়া হবিগঞ্জ মহকুমার বিথঙ্গলে রামকৃষ্ণ গোসাঁঞে দ্বারা স্থাপিত হয়। রিচি পরগণার দাসবংশে ১৮৩ বাংলায় এঁর জন্ম। ইনি কৈবর্ত অথবা মাহিষ্য সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইনি জগন্মোহন মতাবলম্বী ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আছে। এঁরা প্রতিমাপূজায় বিশ্বাসী নন। গুরুই প্রত্যক্ষ দেবতা। এঁরা তুলসী ও গোময়ের ব্যবহার করেন না। ব্রহ্মচর্য ও বৈরাগ্য অবশ্য পালনীয়। বৃন্দাবনে অবশ্য এঁরা স্বীকৃত নন। রামকৃষ্ণ গোসাঁঞের সময় এই মতের বহুল প্রচার হয়। হান্টার সাহেবের বিবরণে এই শ্রীহট্টীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। (নরেন্দ্রকুমার গুপ্তচৌধুরী প্রণীত "শ্রীহট্ট প্রতিভা" ১৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সিলেটে কায়কারবার

১১২ পৃঃ

সিলেটের বিশিষ্ট চা-করদের মধ্যে লেখক অন্যতম। তাঁর পিতামহ ব্রজনাথ, সুরমা উপত্যকায় প্রথম এ দেশীয় চা-কর। ব্রজনাথ তাঁর জঙ্গলমহালের পত্তনীদার ডানকান ব্রাদার্সের মেকমিকিনের সাহায্যে চায়ের চাষ আরম্ভ করেন। রতনমণি খাজাঞ্চির বাড়ীর গৃহজামাতা লোকনাথ শর্মা পরে যোগ দেন। এইটিই পরে এই দুই পরিবারের গৃহদেবতাদের নামানুসরণে গোবিন্দপুর মদনপুর চা-বাগানে পরিণত হয়।

পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখক ত্রিপুরা জেলার কমলপুর থানায় ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের কাছ থেকে ১০৬৫ একর জমি লীজ নিয়ে হাতী দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে চায়ের চাষ আরম্ভ করেন। বাগানের নাম হয় "মহাবীর টি এস্টেট।" গোবিন্দপুর-মদনপুর চা-বাগানের ম্যানেজার রাকেশ সেনগুপ্ত ও কাঠের ব্যবসায়ী বিচিত্র সিংহ এই বাগান পত্তনে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ ইংরাজীতে ১২৪ একর জমিতে চা-রোপণ আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ ইংরাজীতে চা তৈরীর কারখানা চালু হয়।

এই চা-বাগানটি লেখকের সুদক্ষ পরিচালনায় একটি লাভজনক সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

বন্যা-দেশপ্রেম-সমাজসেবা

১৩৫ পৃঃ

১৯২৯ ইংরাজীর বন্যার সময় লেখক যে অদ্ভুত কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করে ঐ জেলার তদানীন্তন জেলা অধিকর্তা নির্মলকান্তি রায়চৌধুরী (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারী) পরে বলেছিলেন "ব্রজেন্দ্রবাবুর কর্মতৎপরতায় আমি মুগ্ধ। গোটা সরকারী যন্ত্র আমার সহায়। কিন্তু ব্রজেন্দ্রবাবু সীমিত সহায় নিয়ে যা করেছেন তা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।"

বন্যার সময় এক জায়গায় গিয়ে দেখা গেল বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে বিপন্ন গ্রামগুলো দেখা যাচ্ছে। সেখানে নৌকা যাবার উপায় নেই। তখন কোনো সাহায্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া যাবে না বলে দলের সবাই হতাশ হন। কিন্তু লেখক বলেন "কোনো সাহায্যসামগ্রী নিয়ে যেতে না পারলেও ওদের পাশে গিয়ে যদি দাঁড়াই তবে ওরা ভরসা পাবে, মনে জোর পাবে। চল, সাঁতরে যাই।"

এই বলে তিনি ধুতিটা খুলে মাথায় জড়িয়ে জলে ঝাঁপ দেন এবং সাঁতরে বিপন্নদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

এই ঘটনা শ্রীহট্টের সুপরিচিত সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী অনাথবন্ধু দাস ঐ দিনই মাইজগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে লেখকের দ্বিতীয় পুত্রের নিকট বিবৃত করেন।

কারাজীবন

১৩৯ পৃঃ

১৯৩২ সালে লেখক জিলা কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। ২৬ জানুয়ারী ১৪৪ ধারা অমান্য করে পুলিশের দ্বারা আহত ও গ্রেপ্তার হন। জেলে গিয়ে

লেখক আদেশ দিলেন দলের সবাই মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলবেন না।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জেল সুপার এলে লেখকই আলাপে অগ্রণী হলেন। সাহেব বললেন "গুড মর্নিং।" বাংলায় উত্তর হল "নমস্কার।" সাহেব ইংরাজীতে বললেন "কেমন আছ?" বাংলায় উত্তর—"বেশ আছি।"

সাহেব বললেন "তুমি কি ইংরাজী জান না?"

লেখক বললেন—"আপনার বাংলা শেখা উচিত।"

তারপর বসন্তকুমার দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন—"তুমিও কি ইংরাজী জান না?"

পরে দেখা যায় টিকিট বইয়ে যেখানে বন্দীদের বিবরণ লেখা থাকে সেখানে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সম্বন্ধে লেখা আছে "Illitcrate" অর্থাৎ অশিক্ষিত!

(১৮।৪।৪৫ ইং (২।৪।৫২ বাং)-এর জনশক্তিতে
জনৈক রাজবন্দীর লিখিত)

কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসী বন্ধুগণ

১৫১ পৃঃ

লেখক তাঁর সদস্যপদ-ত্যাগপত্র লিখে সেন্ট্রাল এসেম্বলীর সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দেবার কয়েকদিন পর দেখা যায় ফিনান্স বিলে সরকারকে পরাস্ত করবার একটা সুযোগ উপস্থিত—কারণ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কংগ্রেস দলনেতা ভুলাভাই দেশাই লেখককে দিল্লীতে উপস্থিত হবার জন্য টেলিগ্রাম করলে লেখক অসম্মতি জানিয়ে উত্তর দেন। তখন ভুলাভাই দেশাই টেলি-ফোনে তাঁকে অনেক পীড়াপীড়ি করেও দিল্লী যেতে রাজী করাতে না পেরে অন্যপথ ধরলেন। তিনি বললেন "ব্রজেন্দ্রবাবু, আপনার পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয় নি। আমি এখনও আপনার দলনেতা। আমার নির্দেশ—আপনাকে অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হতে হবে।"

লেখক তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন "নেতার নির্দেশ আমি মানতে বাধ্য।"

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তিনি শেষ ট্রেনে রওনা হয়ে যান এবং ভোটগ্রহণের দিন দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে ফিনান্স বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ফিনান্স বিলে সরকার পক্ষ এক ভোটে হেরে যান। ফিনান্স বিলে সরকারের এই প্রথম পরাজয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে

১৫২ পৃঃ

Byron-এর "Youth and Age" কবিতায়
"Then the mortal coldness of the soul
Like death itself comes down
It cannot feel for others' woes
It daresnot dream its own."

—এই চরণগুলির সঙ্গে লেখকের ঐ উদ্ধৃতিটির সাদৃশ্য দর্শনে মনে হয় লেখক এই কবিতার অংশটিই উদ্ধৃত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু হুবহু মনে না থাকায় ভাষা অন্য রকম হয়ে গেছে।

এখানে লেখক যে কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন তার মর্ম উপলব্ধি করতে হলে তখনকার পরিস্থিতি বুঝতে হবে।

(পাকিস্তান হওয়ার প্রাক্কালে সকলের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি পাকিস্তানের অনুগত অকপট নাগরিক হয়ে সেখানে থাকবার দৃঢ়সংকল্প করেছিলেন। কোলকাতায় তিনি বাড়ী করেন নি কারণ তাহলে সব দেশ ছেড়ে এখানে এসে পড়বে—absentee landlord। এ রকম হবে তা তো আগে বোঝা যায় নি। পাকিস্তান হওয়ার সময় এবং পরে সম্পত্তি বিনিময়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন—রাজী হন নি। দেশ ছাড়বেন না—এই ছিল তাঁর দৃঢ় সংকল্প। তাঁর বক্তব্য ছিল সম্পন্ন ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা দেশ ছেড়ে গেলে সাধারণ লোকেরা অসহায় হয়ে পড়বে। তারা তো দেশ ছেড়ে যেতে পারবে না। ভয়ে দেশ ছাড়বে কেন? যে সব নেতা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে এসে তারপর পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি উপদেশ বর্ষণ করতেন তাঁদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ঐ সব উপদেশের কোনো প্রয়োজন নাই।

পূর্ব-পাকিস্তানের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে এমন দাঁড়াল যে তাঁর মত বিশিষ্ট লোকও সেখানে আত্মমর্যাদা ও নিজের অধিকার রক্ষা করে থাকতে পারে না, অন্যদের সাহায্য তো দূরের কথা। এ স্বাধীনতার জন্যই কি এত লোক বুকের রক্ত দিয়েছিল, এত মা সন্তান উৎসর্গ করেছিল?

হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের প্রতিকারে তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। গ্রামে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের খবর পেলে মাইনরিটি কমিশনের সদস্য-রূপে সেখানে ছুটে গেছেন, তাদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, সরকারী কর্তাদের সঙ্গে নির্ভীকভাবে তর্কাতর্কি করেছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিকারে অক্ষম হয়ে কমিশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

একান্ত নিরুপায় অথবা দৃঢ়প্রত্যয়জাত উৎসর্গীকৃত প্রাণ ব্যক্তি ছাড়া কোনও ভদ্র হিন্দুর পক্ষে পূর্ব-পাকিস্তানে থাকা সম্ভব নয় বুঝে তিনি অসুস্থা পত্নীসহ পরিজনবর্গকে কোলকাতায় পাঠিয়ে সিলেটে একা বাস করতে লাগলেন। পরে কোলকাতায় পত্নীর অন্তিম সময় আসন্ন বুঝেও সিলেট ছাড়েন নি।)

তিনি বরাবর চাপা স্বভাবের ছিলেন। দুঃখের কথা বলে বেড়াতে ভালবাসতেন না। কিন্তু পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়ানোতে তাঁর মনে যে কি দুঃখ হয়েছিল তা এই কবিতাংশের উদ্ধৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

দেশবিভাগের পরবর্তী পরিস্থিতি সম্বন্ধে লেখকের ঐ সময়ের সঙ্গী ও গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণ থেকে আমরা কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

(নিকুঞ্জবাবুর বয়স সত্তর। ছাত্রজীবন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশসেবায় নিয়োজিত। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছয়বার কারাবাস হয়। "জনশক্তি পত্রিকা" সরকারী রোষে বন্ধ হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন। এখন, সিলেট সহরে একটি ছাত্রাবাস, মহিলা সেবাসদন ও গীতামন্দির পরিচালনা করছেন।) ঃ—

...গণভোটে সিলেট জিলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, কংগ্রেস ও জমিয়েত উলেমা হিন্দ-এর কর্মীদের ওপর নির্যাতন হতে থাকলে হিন্দুরা অনেকে বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে দেশত্যাগের চিন্তা করতে থাকেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর বাসভবনে প্রতিনিধিস্থানীয় হিন্দু নেতা ও কংগ্রেসকর্মীদের এক সভা আহ্বান করে বলিষ্ঠভাবে নির্যাতনের প্রতিরোধকল্পে সংঘবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন। দেশ ও বাস্তু ত্যাগ দ্বারা ভবিষ্যৎ কল্যাণ সাধিত হবে না—তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। তাঁর এই মত যে কতটা আন্তরিক তার প্রমাণ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর ক্রীত লক্ষাধিক টাকার দেশরক্ষা সার্টিফিকেটগুলি তিনি দেশবিভাগের পর অকপট নাগরিকরূপে 'পাকিস্তান সঞ্চয়পত্রে' রূপান্তরিত করেন। লক্ষণীয়, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিগতভাবে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক মূল্যের জাতীয় সঞ্চয়পত্রের একক ক্রেতা।

প্রথম সিলেট সহরের পরিস্থিতি খারাপ ছিল না। কিন্তু নোমানী নামে এক অবাঙালী সিলেটে ডেপুটি কমিশনার হয়ে এসে বলতে লাগলেন "সিলেট কোনসা পাকিস্তান? এখানে যে দেখছি বাড়ী গাড়ী প্রভাব প্রতিপত্তি সবই হিন্দুদের হাতে।"

জিলা শাসকের উস্কানিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উদ্বুদ্ধ হল। অবস্থা খারাপ হতে লাগল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিশিষ্ট হিন্দুদের বাড়ী দখল হতে

লাগল। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীও হুকুম দখলের খপ্পরে পড়ে—তবে হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় বাড়ীটি রেহাই পায়।

১৯৫০-এর ভয়াবহ দাঙ্গার পর লিয়াকৎ আলী এসে সব শুনে নোমানীকে বদলি করেন। তারপর নেহরু লিয়াকৎ চুক্তির ফলে অবস্থার একটু উন্নতি হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী সরকারের সামনে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে লাগলেন। তাঁর নির্ভীক স্পষ্ট ভাষণে সরকারী কর্মচারীরা বিব্রত ও বিরক্ত হতেন। এতে অন্যান্য হিন্দু নেতারা ব্রজেন্দ্রবাবুর নিরাপত্তা বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে তাঁকে সাবধান করতেন--কিন্তু তেজস্বী ব্রজেন্দ্রবাবু সেই সাবধানবাণী মানতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণের বাসভবনের পাশে সুখময় চৌধুরীর অংশে এক মিলিটারী অফিসার থাকতেন। একদিন তিনি ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে বাড়ীর সদর দরজার মাথায় সিমেন্ট গাঁথা ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা কেন রাখা হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু বললেন—"এ বাড়ী আমার নিজের বাড়ী। আমি কংগ্রেস সেবক তাই কংগ্রেস পতাকা রেখেছি।"

অফিসারটি তখন চলে গেলেন কিন্তু কিছুদিন পরই এক মারমুখী জনতা হাতুড়ি, ছেনি ও মই-এর সাহায্যে ঐ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ভেঙে দিল। এরপরও তাঁর বাড়ীতে ঢিল ছোঁড়া, কর্মচারীদের ওপর হামলা এ সব চলতে থাকে। ব্রজেন্দ্রবাবুর অসুস্থা স্ত্রী ও একটি কুমারী কন্যাসহ পরিজনবর্গ সকলেই তখন ঐ বাড়ীতে।

এ সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে বাস করার তাঁর দৃঢ় ইচ্ছা শিথিল হতে থাকে এবং তিনি ক্রমশঃ সামাজিক কার্য ও অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে থাকেন। সরকারী সভা ও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেও যেতেন না। অন্তরঙ্গদের বলতেন "আমি নিজে যখন আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার রক্ষা করে চলতে পারছি না তখন অন্যকে উপদেশ দিবার আমার অধিকার নেই। তবে পূর্বপুরুষের সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে আমি দেশ ছেড়ে যাব না।"

'১৯৫০ ইংরাজীতে অসুস্থতানিবন্ধন ব্রজেন্দ্রবাবু কোলকাতায় গেলে তাঁর বাসভবন মহিলা কলেজের জন্য হুকুম দখল করা হয়। তখন ব্রজেন্দ্রবাবু চিঠি দিয়ে জানান যে তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থগুলি (যার মধ্যে বহু অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল) যেন ঐ কলেজে দিয়ে দেওয়া হয়।

......১৯৩১-এর সূচনায় ব্রজেন্দ্রবাবু, বসন্তবাবু প্রমুখ সব রাজবন্দীরা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সিলেট আসার পথে আমি প্রথম ব্রজেন্দ্রবাবুকে দেখি কুলাউড়ায়। কিছুদিন পর তিনি জিলা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কুলাউড়া

এলেন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে তিনি নামলেন। আমরা তাঁর আহারের ব্যবস্থা কংগ্রেস সভাপতি সুরেশ নাগ মহাশয়ের বাসায় করেছিলাম কিন্তু তিনি বলে বসলেন "আমি তো পাইলগাঁয়ের জমিদার হয়ে আসি নাই। তোমাদের শিবিরের টিফিনই আমি খাব।" আমরা বলি—"আমরা চিড়াগুড় খাই। আপনি তা কি করে খাবেন?"

তিনি একটা থালায় চিড়া, মরিচ, পেঁয়াজ ও সরষের তেল দিতে বললেন —এবং তা মেখে সানন্দে খেতে খেতে গল্প করতে লাগলেন। খেয়ে একটি চুরুট ধরালেন। সত্যাগ্রহ শিবিরে ধূমপান নিষেধ। আমি (সম্ভবতঃ সর্বকনিষ্ঠ সত্যাগ্রহী) তাঁকে এই নিষেধের কথা জানিয়ে তাঁর চেয়ারটি বারান্দায় নিয়ে যেতে চাইলাম। তিনি মুখ লাল করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বাইরে গিয়ে চুরুটটি ফেলে দিয়ে বললেন "তোমাদের এখানে আর চুরুটই খাব না।"

সেদিন ৭।৮ মাইল হেঁটে চারটি জনসভা করেন ও বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

এর দশ বছর পর আমি যখন কাছাড় কংগ্রেস ও শিলচর বিদ্যাশ্রমের একজন পরিচিত কর্মী, তখন ব্রজেন্দ্রবাবু শিলচর আসেন। তাঁর সম্বর্ধনা সভায় ভাষণে তিনি আকস্মিকভাবে দশ বৎসর পূর্বের ঐ ঘটনার কথা তুলে বললেন "কুলাউড়ার সত্যাগ্রহ শিবিরে চুরুট ধরিয়েছিলাম বলে এই ছেলেটি আমাকে নিষেধ করার সৎসাহস দেখিয়েছিল। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও সৎসাহসই আজ জাতির সবচেয়ে প্রয়োজন।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর কষ্টসহিষ্ণুতার কোন তুলনা নেই। জেলখানায় বা কর্মক্ষেত্রে কোন শারীরিক কষ্ট ও অসুবিধাকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না।

ব্রজেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে অপূর্ব চন্দ মহাশয় আমাদের বলেছিলেন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদীয় দলের নেতা সত্যমূর্তি তাঁকে বলেছেন "তোমাদের সুরমাভ্যালীর ঐ সদস্যটি একটি জীবন্ত বিশ্বকোষ।"

আমাকে তিনি খুব স্নেহের চক্ষে দেখতেন। দেশের সমাজের সব খবর নিতেন। জনশক্তি পত্রিকার পরিচালন ব্যাপারে বলতেন "পত্রিকার নীতি হবে Provoke not, Placate not".

আমি রাজনীতির অঙ্গন ছেড়ে সমাজধর্মীয় সংগঠনে ভিড়বার চেষ্টা করায় বললেন "তাঁতিকুল হারিয়ে বুঝি বৈষ্ণবকুল ধরছ? সৎ রাজনীতিই শ্রেষ্ঠ নীতি।"

লেখকের পিতামহের নামে স্থাপিত স্কুল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্য ঃ—

১৬০ পৃঃ

ব্রজনাথ হাইস্কুল—১৯২৫ ইংরাজীতে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের মনে স্বগ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা উদিত হয়। তখন সমগ্র আসামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা সীমিত ছিল। সুনামগঞ্জ মহকুমায় মাত্র একটি স্কুল ছিল।

ঐ পরগণায় আরও দুই তিনটি মাইনর স্কুল থাকায় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ স্থির করেন প্রস্তাবিত স্কুলে সপ্তম থেকে দশম ক্লাশ পর্যন্ত রাখবেন। বর্ধিষ্ণু গ্রাম কুবাজপুর, রমাপতিপুর, কাতিয়া, বাগময়না প্রভৃতি গ্রামের এক থেকে তিন মাইলের মধ্যে স্কুলটি স্থাপিত হবে স্থির হয়।

"শ্বঃ কার্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্" মহাভারতের এই নীতি স্যার রাজেন মুখার্জির কর্মনীতির মতই ব্রজেন্দ্রনারায়ণের স্বভাব ছিল। কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তিনি কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত মধ্যমানুজ রাজেন্দ্রনারায়ণ, স্কুলবাড়ি প্রস্তুত, পুষ্করিণী এসবের সম্পূর্ণ ভার নিলেন। পারিবারিক ভাণ্ডার থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে তহবিল গঠিত হয়। তিনকক্ষ বিশিষ্ট দুইটি গৃহ, ছাত্রাবাস, রন্ধনশালা এবং পুষ্করিণী খনন ১৯২৫ সালেই করা হয়।

১৯২৬ সালের ২রা জানুয়ারি সম্পাদক হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (ব্রজেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠানুজ) চারজন শিক্ষক, এবং কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্কুলের উদ্বোধন হয়। প্রধান শিক্ষক ছিলেন যামিনীকান্ত দে বি এ. (শ্রীহট্ট রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলে সহপ্রধান শিক্ষক ছিলেন)। সব বিষয় পড়াতেন—সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী।

সহকারী প্রধান শিক্ষক—কুবাজপুরনিবাসী শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী মুরারিচাঁদ কলেজের প্রথম অনার্স বৎসরের ইংরেজি অনার্স গ্রাজুয়েট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য শিলং গেলে বাজেট অধিবেশনের দরুণ শিলং-এ অবস্থিত ব্রজেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিতে পড়েন এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিগত আহ্বানে স্কুলে যোগ দেন। মনোরঞ্জনবাবু ১৯২৮-এর শেষভাগে আসাম সেক্রেটারিয়েটে কর্মগ্রহণের কাল পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের গৃহশিক্ষকরূপে পাইলগাঁও বাড়ীতেই থাকতেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবারের পুরুষানুক্রমিক অন্যতম ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মনোরঞ্জনবাবু এই পরিবারের পরম শুভানুধ্যায়ী। অশীতি

-বর্ষেও এই পরিবারের সকলেরই বৈষয়িক-পারিবারিক প্রয়োজনে সৎ পরামর্শ-দাতা। এই বিবরণীর অধিকাংশই তাঁর স্মৃতি থেকে আহৃত।

কাতিয়া গ্রামনিবাসী মরহুম মৌলভী আবদুস শুভ্‌হান বি.এ., ব্রজেন্দ্র-বাবুর পিসতুতো ভ্রাতা *প্রমোদচন্দ্র গুপ্ত (আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট) হরিহরদাস গ্রামের *ব্রজেন্দ্রকুমার দে—এ'রা ছিলেন শিক্ষক। পর বৎসর ইন্দ্রকুমার চৌধুরী বি.এ., মহেন্দ্র দত্ত বি.এ. (ইনি খুলনার এক গ্রামের প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করে আসেন) প্রভৃতি নিযুক্ত হন। পূর্ণ স্কুলে ছাত্রসংখ্যা প্রথম বৎসর ১২৫-এ দাঁড়ায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিলাভে দেরী হয়ে যাওয়ার ফলে ১৯২৭-এর দুইজন ছাত্র শ্রীরসরঞ্জন গোস্বামী ও *কৃপেন্দ্রচন্দ্র দে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী ক্রমে এম. এ. বেদান্তশাস্ত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে নবদ্বীপ, বৃন্দাবনে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। "অমৃতবাজার" গোষ্ঠি আয়োজিত বিভিন্ন বৈষ্ণব উৎসবে ও বৃন্দাবনে বিভিন্ন উৎসবে প্রায়ই আমন্ত্রিত হয়েছেন।

এই স্কুলের ছাত্র গোরাপদ দাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় আসামের ছাত্রছাত্রী-দের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার পূর্বক উত্তর জীবনে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ-পদে অধিষ্ঠিত হন।

* * * * *

১৯।২।৬০ তারিখের যুগশক্তি পত্রিকায় শ্রীদুর্গাপদ দাস লিখছেন—"পাইলগাঁও হাইস্কুল কানিংহাম সার্কুলার-তাড়ানো দুরদুরান্তের ছাত্রদের আশ্রয়স্থল হইয়া পড়ে। আর শুধু তাহাই নহে জেলফেরৎ, পুলিশ বিতাড়িত অনেক শিক্ষিত কংগ্রেস কর্মীকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্যে নিয়োগ করা হয়।"

* * * * *

* * * * *

* * * * *

১৬৭ পৃঃ

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে লেখকের "The Glorious Vedic Civilisation (Indian Socio-Economics) নামে একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে।

ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী

২০২ পৃঃ

কাপুরুষতা অপেক্ষা হিংসা শ্রেয়—এ কথা গান্ধীজী বারবারই বলেছেন। নোয়াখালি অভিযানে দত্তপাড়া ক্যাম্পে থাকাকালীন গোপাইবাগ গ্রামে গিয়ে গান্ধীজী যখন শোনেন যে সেখানে দাঙ্গাকারীরা এক স্থানে পরপর ১৯ জনকে কেটেছে তখন তিনি খুব দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন—"পর পর ১৯ জনকে কাটলে আর কেউ একটা লাঠি পর্যন্ত তুললে না? ঘরে বঁটি, দা কিছুই কি ছিল না?"

আমাদের বিশেষ পরিচিতা একজন মহিলা (বর্তমানে সন্ন্যাসিনী) ঐ সময় সুচেতা কৃপালনীসহ গান্ধীজীর পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ঐ প্রত্যক্ষ দর্শিনী মহিলার কাছে আমরা এই বিবরণ শুনেছি।

সহকর্মী-সহযোগীদের অভিমত

১৪৪ পৃঃ

জনশক্তি (সিলেট-শিলচর) সম্পাদক শ্রীনিস্তারণ গুপ্ত বলেন ঃ—

পরমশ্রদ্ধাস্পদ জননেতা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের দীর্ঘদিনের সহকর্মীরূপে (অনুগামী বলিলেই উপযুক্ত হয়) অভিজ্ঞতার বর্ণনার অনুরোধ পাইয়া যেমন বিশেষ ধন্য হইয়াছি তেমনই বিব্রতও বোধ করিতেছি কারণ তাঁহার কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

আমরা, কলেজের ছাত্র অবস্থায় ১৯২৯ ইংরাজীর বিধ্বংসী বন্যার সময় 'সুরমা উপত্যকা বন্যাত্রাণ সমিতি'র সাধারণ সম্পাদকরূপে তাঁহার কর্মকাণ্ড দেখিয়া, অভিভূত হইয়াছি এবং তখন হইতেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসিয়াছে। চতুর্দিকে হাহাকার 'ত্রাহি ত্রাহি' রব, হাজার হাজার লোক গৃহহারা, ত্রাণের জন্য চতুর্দিক হইতে আকুল আবেদন—এর মধ্যে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ধীর স্থির ভাবে দিবারাত্র কাজ করিয়া চলিয়াছেন—কর্মীদের উপদেশ ও নির্দেশ দিতেছেন—অর্থসংগ্রহের পন্থা নির্ধারণ করিতেছেন—দলে দলে কর্মীদের ত্রাণসামগ্রীসহ, নৌকাযোগে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সর্বত্র প্রেরণ করিতেছেন। সে দৃশ্য এখনও যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে।

কংগ্রেস আন্দোলনে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের সহকর্মীদের মধ্যে আর কেহই ইহজগতে নাই। শেষ প্রদীপের মত শ্রীপ্রবোধানন্দ কর মহাশয়ও ধিকিধিকি জ্বলিতেছেন, যে কোন মুহূর্তেই নির্বাপিত হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা যে

কয়জন এখনও জীবিত আছি তারাও জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত তাই সব ঘটনাও স্মরণ করা সম্ভব নয়।

বয়সের দীর্ঘ ব্যবধানহেতু শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনারায়ণের সহিত অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার সুযোগ আমাদের ছিল না—দূর হইতে সম্ভ্রমের সহিতই তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার কর্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখনও আপোষরফা করিতেন না।

অর্থাভাব ও সরকারী অত্যাচারে শ্রীহট্টে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপত্র "জনশক্তি" বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আগাইয়া আসেন ও বহু ক্ষতি স্বীকারে "জনশক্তি" ক্রয় করেন। তাঁহার পরিচালনায় স্বাধীনতা আন্দোলনে "জনশক্তি" পত্রিকার অবদান চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯৩০ ইংরাজীতে দাদা নীরোদকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমিও ওতপ্রোতভাবে কংগ্রেস-আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়ায় কলেজের পড়া বন্ধ হইয়া যায়। শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় আমাকে "জনশক্তি" পরি-চালনা ও জিলা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ "গুপ্ত ইস্তাহার" ছাপানো ও প্রকাশসহ জিলা কংগ্রেসের অফিস পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে জনশক্তির সমকক্ষ আর কোন পত্রিকা কোন জেলায়ই ছিল না। সর্বদাই এই "জনশক্তি" পত্রিকা কংগ্রেসের মুখপত্ররূপে ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ নির্যাতন সত্ত্বেও সুকঠোর কর্তব্যে অবিচলিত থাকিয়া জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছে।

"জনশক্তি" প্রকাশনাসূত্রেই শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইত এবং নানাভাবে উদ্বুদ্ধ হইতাম।

ইংরেজী জনশক্তির সম্পাদকরূপে ব্রজেন্দ্রনায়ণের ক্ষুরধার লেখনী সরকারকে সশঙ্কিত রাখিত—তাঁহার সমালোচনা ও গঠনমূলক লেখার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন। বাংলা "জনশক্তি" সাপ্তাহিকেও তাঁহার নিয়মিত লেখা সকলকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিত। সরকারী দমনমূলক কোন কাজই তাঁহাকে কর্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

১৯৪২ ইংরেজীর "ভারত ছাড়" আন্দোলনে কংগ্রেসসেবীদের সাথে জন-শক্তি সম্পাদকগণও কারারুদ্ধ হওয়ায় জনশক্তির প্রকাশও স্থগিত রাখা হয়। কারামুক্ত হইয়া কংগ্রেসকর্মীগণ আন্দোলনের স্বার্থে জনশক্তি প্রকাশ অনিবার্য মনে করিলে ব্রজেন্দ্রবাবু এই সর্তে স্বীকৃত হন যে Press (Emergency Powers) Act অনুযায়ী জামানত দাবী করিলে তিনি দোষ স্বীকার করিয়া জামানত দিয়া পত্রিকা বাহির করিবেন না।

আইনানুযায়ী, জনশক্তি প্রকাশের অনুমতি চাহিয়া আমি দরখাস্ত করি।

ভারতের নিরাপত্তার বিঘ্নকারী সংবাদ জনশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে—এই অভিযোগে ভবিষ্যৎ সচ্চরিত্রতার জামিন স্বরূপ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ৫০০ টাকা দাবী করেন।

জনসাধারণ যাতে দেশের ও আন্দোলনের সঠিক খবরাদি জানিতে পারেন এবং চতুর্দিকে নানা রকম গুজব প্রচার বন্ধ হয় তজ্জন্য জামিন দিয়াও জনশক্তি প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সহকর্মীগণ বিশেষ চাপ দিলে ব্রজেন্দ্রবাবু নির্দ্বিধায় জনশক্তির মালিকানা স্বত্ব পরিত্যাগ করেন তবুও তাঁহার পূর্ব-সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নাই।

রসিকতাও তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বাড়ীতে জিলা কংগ্রেস কমিটির এক সভা চলাকালীন বর্ষীয়ান ব্যবহারজীবী ধরণীরঞ্জন পাল মহাশয় ধূমপান করার জন্য হুঁকা হাতে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে ব্রজেন্দ্র-বাবু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন—"ধূমপান অন্যায় মনে করিলে আজই ত্যাগ কর : উচিত ও প্রয়োজন মনে করিলে বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনেও খাওয়ার সাহস থাকা উচিত।" তখন সকলের হাস্যরোলের মধ্যে ধরণীবাবু কাঁচুমাচু মুখ করিয়া নিজের জায়গায় বসিয়াই সঙ্কোচের সহিত ধূমপান করিতে থাকেন।

দেশবিভাগের পর হিন্দুদের দেশত্যাগ তিনি সমর্থন করিতেন না। নিজ নিজ জায়গায় থাকিয়া সাহসের সহিত অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার উপরই জোর দিতেন। ১৯৪৮ ইংরেজীতে শ্রীহট্ট সহরে "জনশক্তি" কার্যালয়, জনশক্তি প্রেস, জনশক্তি সম্পাদক ও বার্তাসম্পাদকের বাড়ী প্রকাশ্য দিবালোকে সমাজ-বিরোধীদের দ্বারা অবাধে আক্রান্ত হইলে আমরা বাধ্য হইয়া শ্রীহট্ট ত্যাগ করি। এরপরে শ্রীহট্ট গেলে তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ আলোচনা হইয়াছে তখন হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধা দেওয়ার দৃঢ়তা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে বলিয়া মনে হইত। পরে অবশ্য তাঁহাকেও শ্রীহট্ট ত্যাগ করিতে হয় এবং এতবড় দেশনেতা শেষ জীবনে বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীদের অজ্ঞাতসারে ধরাধাম ত্যাগ করেন। দেশবাসীসহ আমরা গুণগ্রাহীবৃন্দ অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে পত্রিকা মারফৎ তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ জানিয়া অন্তরে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলাম।

* * * * *

জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্ট জেলায় শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁহার নেতৃত্ব শ্রীহট্ট জেলায় কংগ্রেসী গণ-আন্দোলনকে অসাধারণ প্রেরণা দিয়াছে। রাজনীতি ছাড়াও বিস্তৃতক্ষেত্রে তাঁহার সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—১৯২৯ ইংরেজীর বন্যাত্রাণে, স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে, সুচিন্তিত লেখনী পবিচালনায়, সংবাদ প্রচার পরিকল্পনায় এবং আরো নানা গঠনমূলক কাজে।

আসাম বিধান সভার ১৯৩৬ ইংরাজীর নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের পক্ষে শ্রীহট্ট জেলার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় পূর্ব করিমগঞ্জ কেন্দ্রে আমার ও তপশীলী সম্প্রদায়ের বলরাম সরকারের পক্ষে তিনি নিজব্যয়ে সমগ্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া প্রচারকার্য চালান। নানা প্রতিকূল অবস্থার দরুণ আমি সামান্য ভোটে পরাজিত হইলেও বলরাম সরকার জয়লাভ করেন। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় কংগ্রেস অনেকগুলি আসনলাভ করে। অল্পদিন পরেই একটি উপনির্বাচনে তাঁহার চেষ্টাতেই আমি কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে সাফল্যলাভ করি। তৎপর আসাম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের পূর্বেই তিনি শিলং ছুটিয়া আসেন এবং সেখানে আমিসহ শ্রীহট্ট-কাছাড়ের নূতন কংগ্রেসী সদস্যগণকে বিধানসভার রীতিনীতি, প্রশ্ন করার পদ্ধতি, বাজেটের সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশ দিতে থাকেন। আমার প্রথম বাজেট-অধিবেশনের ভাষণ তাঁহারই নির্দেশে ও সহায়তায় প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

মিথ্যার সঙ্গে তিনি কখনও আপোষ করেন নাই এবং যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার জন্য চরম মূল্য দিতে দ্বিধা করিতেন না, সে জন্য তাঁহার কোন কোন কাজে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁহার অবিচল নিষ্ঠার জন্য সকলেই তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াছিল।

তিনি যে কাজ করিতেন তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। কোনো কার্যে তাঁহার আন্তরিকতার অভাব কখনো দেখি নাই। তিনি কলিকাতা বা ঐ রূপ বড় জায়গায় কর্মকেন্দ্র করিলে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। এই শ্রেণীর নেতার সংখ্যা বিরল।

তাঁহার জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁহার স্মৃতিকথা পুস্তকাকারে প্রকাশ উপলক্ষে তাঁহার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতে পারিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ আদিত্য।
২০/৩/৮২ ইং

* * * * *
* * * * *

১৮১ পৃঃ

শ্রীহট্ট তরুণ সংঘের সেক্রেটারী বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত কালীরমণ ভট্টাচার্য, যুব ও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রবাবুর সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেন ঃ—

১৯২৭ ইংরাজীতে যখন তরুণ সংঘ স্থাপিত হয় তখন প্রথমে এই সংঘের কোনো সভাপতি ছিলেন না। পরে স্থির হয় কোনো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে

সভাপতি করা হবে। ব্রজেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিত্বে সকলেই আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁকেই সভাপতি করার প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া হয় এবং তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করতে রাজী হ'ন।

প্রথমে সচ্চিদানন্দ দাসের বৈঠকখানায় তরুণ সংঘের কার্যালয় ও একটি ছোটখাটো লাইব্রেরী ছিল। পরে তরুণ সংঘের কাজ বেড়ে যাওয়ায় ও লাই-ব্রেরীর স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় উপযুক্ত স্থানের জন্য ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছে যাওয়া হয়। তখন তিনি তাঁর জিন্দাবাজারের গৃহটির দ্বিতলে তরুণ সংঘের কার্যালয় স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেন। এর জন্য তিনি ভাড়া নেন নি।

তরুণ সংঘের কাজকর্মে তাঁর আগ্রহ ছিল। এইডেড হাইস্কুলের মাঠে তরুণ সংঘের বিভিন্ন শাখার সভ্যরা যখন সমবেত হয়ে কুচকাওয়াজ, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ব্যায়াম ইত্যাদি প্রদর্শন করতেন তখন ব্রজেন্দ্রবাবু সেখানে উপস্থিত থাকতেন। "বিদ্যাশ্রম"-এর প্রদর্শনী বা কংগ্রেস কনক জয়ন্তীর প্রদর্শনীতে তরুণ সংঘের সভ্যদের ব্যায়াম ইত্যাদি প্রদর্শনেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

সিলেটে বিভিন্ন সম্মেলনে যেসব বাহিরের নেতারা উপস্থিত থাকতেন বা সভাপতিত্ব করতেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করা, শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া—সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন, বিভিন্ন আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রসেশনে যোগ দেওয়া—এসব ব্যাপারে জিলা কংগ্রেসের কর্ণধাররূপে ব্রজেন্দ্রবাবু তরুণ সংঘের উপরই কাজের ভার দিতেন।

১৯২৬ ইংরাজীর জুন মাসে ব্রজেন্দ্রবাবুর উদ্যোগ ও উৎসাহে সুরমা উপত্যকা যুব সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে ডাঃ ভূপেন দত্ত উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে রাজনৈতিক সম্মেলন হয় ; তাতে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, বাবা গুরুদিৎ সিং যোগ দেন। এঁরাও যুব-সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন। ঐ সম্মেলনে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ইত্যাদির সাহায্যে আত্মরক্ষা ও প্রতি-আক্রমণের কলা-কৌশল তরুণ সংঘের সদস্যরাই দেখান—যদিও তখন পর্যন্ত "তরুণ সংঘ" আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি।

১৯৩১ ইং-তে সিলেটে "মহিলা সম্মেলন' তরুণ সংঘের সাহায্যে ব্রজেন্দ্র-বাবুর উদ্যোগে ও দেখাশোনায় হয়। তিনি এই সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কংগ্রেসের নির্বাচনের কাজও তরুণ সংঘের সহায়তায় হত।

১৯২৯ ইং-তে সিলেট-কাছাড়ের বন্যায় ব্রজেন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে বন্যাত্রাণ সমিতি গঠিত হলে তরুণ সংঘের কর্মীরা দুই তিন মাস স্কুল কলেজ ছেড়ে ব্রজেন্দ্রবাবুর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে সেবার কাজ চালিয়ে যান। ব্রজেন্দ্রবাবুকে

নিয়মিত কাজের রিপোর্ট দিতে হত। সহরে কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের প্রকোপ হলেও ঐভাবে সেবাকার্য চলত।

১৯৪৬ ইং-র নোয়াখালি দাঙ্গার পর হৃতসর্বস্ব আশ্রয়প্রার্থীদের দুইটি ক্যাম্পে পুনর্বাসন করে ব্রজেন্দ্রবাবু ত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি রিলিফ কমিটির সভাপতি ছিলেন। ইতঃপূর্বে ১৯৩৩—৩৪ ইং-তে তরুণ সংঘকে বে-আইনী ঘোষণা ও কিছু সভ্যকে সরকার গ্রেপ্তার করা সত্বেও অন্যরা ঐ ত্রাণের কাজে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যোগ দেন।

তরুণদের চরিত্র গঠন কাজে ও বৃহত্তর সমাজ সেবার প্রস্তুতিতে তাঁর অসাধারণ উদ্দীপনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ছেলেরা দেশের ও দশের কাজে লাগুক, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান হোক, সাহসী হোক,—এই ছিল তাঁর আকাঙ্খা। তাঁর পুত্রকন্যাদের কেউ কেউ তরুণ সংঘের খেলাধূলায় এবং কাজেও যোগ দিতেন। তরুণদের সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম আশা ছিল বলেই তিনি কখনই আমাদের ফিরিয়ে দেন নি।

ব্রজেন্দ্রবাবু তরুণদের মতোই অকুতোভয় ছিলেন। বয়স্কজনসুলভ ভীতি তাঁর ছিল না। তরুণদের মতোই তিনি সর্বদা নির্ভয়ে এগিয়ে যেতেন।

১৯৩০ ইং-র ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাক্য গ্রহণের দিন সিলেট সহরে সকলেই পুলিশের দমন-নীতির ভয়ে ভীত ছিলেন। তরুণ সংঘের সভ্যরা কিন্তু সাবধানীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে শোভাযাত্রা সহ সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, ব্রজেন্দ্রবাবু সকলের আগেই সেখানে উপস্থিত!

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

(উপরোক্ত তথ্যাদির জন্য বিবৃতিদাতা সকলেই সঙ্কলকদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।)

লেখকের প্রকাশিত প্রবন্ধ তালিকা

শ্রীহট্টের "জনশক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত

নাম	তারিখ
১। শ্রীহট্টবাসী বাঙ্গালী	২২।৬।৩০ বাং ৯।১০।২৩ ইং
২। মন্ত্রীসংবাদ	ঐ
৩। সেকালের কথা	১৪।২।২৬ ইং
৪। জীবনের প্রধান আকর্ষণ	২৯।১০।৩২ বাং
৫। বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা	১৮।৬।৩৩ বাং ৫।১০।২৬ ইং
৬। ২৫ বৎসর পূর্বে কলিকাতা ও ছাত্রজীবন	১০।৬।৩৪ বাং ২৭।৯।২৭ ইং
৭। হুন্দ করলি সুন্দরীমাসী	২৩।৬।৩৫ বাং ৯।১০।২৮ ইং
৮। স্বাধীনতার পূজাই প্রকৃত শক্তিপূজা	২৭।৬।৩৮ বাং ১৪।১০।৩১ ইং
৯। সমর্থদের সাহায্য দান পাপ নহে?	৫।৮।৪১ বাং ২১।১১।৩৪ ইং
১০। প্রাচীন ভারতে জাতীয়তা	২।৯।৪২ বাং ১৮।১২।৩৫ ইং
১১। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ	১৫।১।৩৬ ইং ১।১০।৪২ বাং
১২। ব্রিটিশরাজ	২৯।১।৩৬ ইং ১৫।১০।৪২ বাং
১৩। শ্রীহট্টে ভূম্যধিকারীদের অবস্থা	৬।৫।৩৬ ইং ২৩।১।৪৩ বাং
১৪। মনু মহারাজ	২২।১০।৩৬ ইং ৪।৭।৪৩ বাং
১৫। বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়	১।২।৩৯ ইং ১৮।১০।৪৫ বাং
১৬। ক্ষীরোদচন্দ্র দেব	১৪।৬।৩৯ ইং ৩১।২।৪৬ বাং

১৭।	হিতোপদেশ	২৩।৮।৩৯ ইং ৬।৫।৪৬ বাং
১৮।	ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৩০।৮।৩৯ ইং ১৩।৫।৪৬ বাং
১৯।	রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিম	১৫।৩।৪৪ ইং ২।১২।৫০ বাং
২০।	ছাত্রদের নকলনবিশী	২৯।৩।৪৪ ইং ১৬।১২।৫০ বাং
২১।	উষার আলোক	৯।১।৪৬ ইং ২৫।৯।৫২ বাং

(তালিকা অসম্পূর্ণ)

অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

নাম	পত্রিকার নাম	তারিখ
১। গৃহীর আধ্যাত্মিকতা	বলাকা (শ্রীহট্ট)	ফাল্গুন ১৩৪২ বাং
২। রাষ্ট্রভাষা	বলাকা (শ্রীহট্ট)	পৌষ ১৩৪৪ বাং
৩। ক্ষীরোদচন্দ্র	বলাকা (শ্রীহট্ট)	মাঘ ১৩৪৪ বাং
৪। Rural Credit	বলাকা (ইং সংস্করণ)	১৯৩৮ ইং
৫। শুভেচ্ছা	গৃহলক্ষ্মী (শ্রীহট্ট)	ভাদ্র ১৩৪৫ বাং
৬। আসামে ধনীদের অবস্থা	সম্পদ	ফাল্গুন ১৩৪৭ বাং
৭। গ্রাম্য সমাজের আর্থিক অবস্থা	সম্পদ	বৈশাখ ১৩৪৮ বাং ১৯৪০ ইং
৮। পুরুষ ও নারী	বিজয়িনী (শিলচর)	কার্তিক ১৯৪৭ ইং
৯। শ্রীহট্টে স্ত্রীশিক্ষার প্রারম্ভ	শ্রীহট্ট সম্মিলনী পত্রিকা হীরক-জয়ন্তী সংখ্যা	১৯৩৬ ইং
১০। আত্মচরিত (ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত)	সাপ্তাহিক যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)	১৯৬০

এবং আরও অনেক বর্তমানে অপ্রাপ্তব্য প্রবন্ধাদি.........